পদচিহ্ন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

জুলাই
১৯৬১

ছেপেছেন—
বি. সি মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

উ
প
হা
র
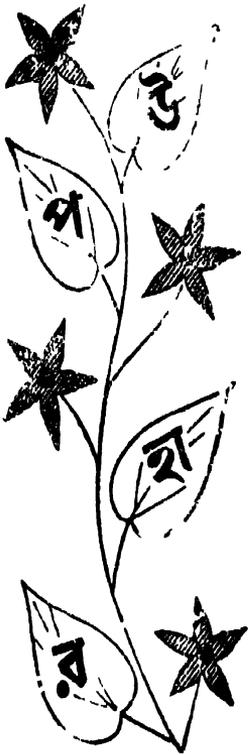
রাঢ়ের একখানি গ্রাম। নাম নবগ্রাম। নবগ্রাম পুরাতন হয়েছে।

কতকালের গ্রাম?

ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের ইতিহাস নাই; 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী'—সে ততদিনের। তবু এ গ্রামের কাহিনী আছে। সভ্যতার নিদর্শনও আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ রয়েছে—জঙ্গলে ভরা দেবীস্থান; প্রবেশপথের পাশে আছেন সদাজাগ্রত মহাভৈরব। মহাপীঠ হ'লে সত্যযুগ থেকে এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে। এখানকার সকলেই সে গল্প শুনেছে—

সে যুগে এখানে নাকি রাজা ছিল। রাজার প্রিয়তমা রাণীও ছিল। যৌবনচপলা সুন্দরী সেই রাণীর পরামর্শে রাজা তাঁর গুরুর যোগশক্তি পরীক্ষার জন্য যজ্ঞ করেছিলেন। মহাতেজস্বী নিষ্ঠাবান গুরু ভেবেছিলেন, এ যজ্ঞের মূলে আছে রাণীর সন্তানকামনা। প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যজ্ঞ করলেন। কিন্তু 'রাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হোক' বলে আহুতি প্রদান মাত্রে ভেঙে পড়ল যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখস্থ নারিকেল গাছের মাথা। প্রকাশ পেল, নারিকেল গাছের মেথি খাবার কামনা অন্তরে পোষণ ক'রে রাণী ওই যজ্ঞে গুরুকে আহ্বান করেছিলেন। অপমানে ক্ষোভে অগ্নিতপ্ত গুরু জ্ব'লে উঠলেন। যজ্ঞে তিনি পুনরায় আহুতি দিলেন অবশিষ্ট হবি নিয়ে—ধ্বংস হোক এ পাপ রাজবংশ, ধ্বংস হোক এ পাপ রাজ্য।

মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অগ্নিদাহ, ঝড়, জলপ্লাবন এল রুদ্রমূর্তি ধ'রে। ধ্বংস হয়ে গেল রাজ্য। নিবিড় জঙ্গলে আবৃত হয়ে গেল সমস্ত স্থান।

তারপর কত যুগের পর এল এক সন্ন্যাসী। সে এসে আবিষ্কার করলে মহিমময়ী মহাদেবীর স্থান। দেবী তাকে নির্দেশ দিলেন, ব্রহ্মশাপ-উষর অংশটুকু বাদ দিয়ে বসতি স্থাপন কর। দূরান্তর থেকে সন্ন্যাসী নিয়ে এল মানুষ। কালো কালো মানুষ, জাতে তারা বাউরী। বাউরী-রাজার নাম এ অঞ্চলে আজও অনেকে জানে। মহাশক্তিশালী বাউরীবংশ, তারা এল সব হাজারে হাজারে, বন কেটে বসালে বসতি, নগর, গ্রাম; বাঘভালুক ধ্বংস করলে, মানুষ নির্ভয় হ'ল; ক্ষেত খামার গ'ড়ে ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করলে এই স্থানকে। নদীর ঘাটে গ'ড়ে উঠল বন্দর। এখনও বন্দর-টিপি ব'লে একটা বাবলাগাছ আর সেয়াকুলের জঙ্গল ভরা উঁচু জায়গা নিদর্শন-

স্বরূপ প্রাচীন গ্রামগরবীরা আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে বলে, ওই সেই জায়গা। প্রমাণস্বরূপ বলে, নদীর ঘাটের নাম আজও 'লা' ঘাট ; 'লা' মানে নৌকো, দেশদেশান্তরের নৌকো এসে লাগত বর্ষার সময় ওই ঘাটে। ঘাটের উপরেই ওই টিপি, কোন বন্যায় ডোবে না। সাঁওতাল মাঝিরা কতজনে ওখানে লোহা-পাথর খুঁড়তে গিয়ে পুরানো আমলের টাকাপয়সা পেয়েছে। বন্দর সেদিনও ছিল।

বাউরী-রাজার কীর্তি—পুরানো মজা দীঘি উদাসী এখনও লোকে দেখায়। চারিদিকের পাড় এখনও রয়েছে, মধ্যে দিয়ে চ'লে গেছে পাকা সড়ক এবং একটা ছোট নালা, তার দু পাশে ধানের ক্ষেতে এখন সোনার ফসল ফলে ; মাঠখানার নামই হয়েছে উদাসীর মাঠ।

উদাসী ছিল নাকি বাউরী-রাজার রাণী।

বাউরী-রাজার দেশবিখ্যাত সম্পদ। পাশের গ্রাম মহিষতলী বা মণ্ডলাতে ছিল মহিষশালা ; এ পাশের গ্রাম গোগ্রাম—গোগাঁয়ে ছিল গোশালা। ধনডাঙায় ছিল ধনাগার। মহাগ্রাম ছিল কেল্লা। নাম থেকেই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে, অথবা প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না, কেউ জানে না, জানতেও চায় না। কোন চিহ্নও নাই। শুধু ওই ব্রহ্মশাপ-ঊষর ভূখণ্ড আজও ধু-ধু করছে। ঘাস পর্যন্ত হয় না, শুধু কাঁকর, নুড়ি, নিষ্কাশিত-লৌহ—লোহা-পাথর, আর বড় বড় পাথরের চাঁই সমাকীর্ণ প্রান্তর। পাথরের চাঁইগুলোকে বলে—অসুরের কাঁড়ি। গাছের ডালের এবং গুঁড়ির মত গড়ন,—কোনমতে ভাঙলে দেখা যায়, ভেতরটাও ঠিক কাটা গাছের ডালের মত। তেমনই আঁশের চিহ্ন ও সারের চিহ্ন পাওয়া যায়। ব্রহ্মশাপে সব পাষাণ হয়ে গেছে।

ওই ঊষর ভূখণ্ডের নীচে সমতল প্রান্তর। তারই পাশে নদী।

ওই প্রান্তরটার নাম তুরুকডাঙা।

তুর্কীরা একদা এ দেশে এসে নাকি এইখানে তাঁবু ফেলেছিল। স্থানীয় মুসলমানেরা বলে—তারা এসেছিল আরব দেশ থেকে। তারাই নাকি বাউরী-রাজাকে পরাজিত করে। তুর্কীদের যারা এসে এখানকার বাউরী-রাজাকে উচ্ছেদ ক'রে এখানকার মালিক হয়ে বসেছিল, তাদের বংশের নাম ঠাকুর-বংশ। প্রথম মালিক ছিল একজন ফকির সিদ্ধপুরুষ। তাদের বংশে ভোগীর চেয়ে যোগীর সংখ্যাই বেশি। গুলমহম্মদ ঠাকুর নাকি মস্ত একজন যোগী ছিলেন। তিনি নাকি তাঁর অন্ত্রাদি পেট থেকে যোগবলে বাইরে এনে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে আবার

ভিতরে যথাস্থানে স্থাপন করতেন। তাঁদেরই অনুগৃহীত ছিল এখানকার গন্ধবণিকেরা। তাদেরই উপর এখানকার মণ্ডলের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। হিন্দুসমাজের যাবতীয় দেবদেবীর পূজার ভার, দেবত্র সম্পত্তির ব্যবস্থার অধিকার ছিল তাদেরই। এখনও আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাদের সমৃদ্ধিও ছিল প্রচুর। নদীর ধারে বর্ষার সময়, ওই বন্দর-টিপিতে তাদের কয়েক মাসের ব্যবসার আড়ত বসত। দেশান্তর থেকে ভরানদী বেয়ে নৌকো আসত। এখান থেকে নিয়ে যেত ধান চাল রেশমের কাপড় ও রেশম; বিক্রি ক'রে যেত ছোলা মসুরি কলাই গুড় লঙ্কা পেঁয়াজ। আরও অনেক কিছুর বিনিময় হ'ত। আগন্তুক ব্যবসায়ীদের মধ্যে আসত এক গরিব ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ী। গুড় নিয়ে আসত। মিষ্টভাষী বিনয়ী ব্রাহ্মণ। কয়েক বৎসর পর গন্ধবণিকেরা তাকে এখানে বাস করালে। তার আগে এখানে সৎ-ব্রাহ্মণ ছিল না। ছিল চক্রবর্তী উপাধিধারী শূদ্রযাজক বর্ণব্রাহ্মণ, তাও এক ঘর। নবাগতেরা শ্রোত্রীয়, উপাধি—সরকার। তারপর কিছুকালের মধ্যেই চাকা একটা পাক খেলে।

ঠাকুর-বংশের অবনতি হ'ল। তাঁদের সম্পত্তি নবাবের রাজস্বের দায়ে চ'লে গেল রায়চৌধুরী-উপাধিধারী এক হিন্দু জমিদারের ঘরে। লোকে বলে—রাজস্ব না দেওয়ার দায়টা ছিল গন্ধবণিকদের। গন্ধবণিকদের তখন পাকা বাড়ি, অনেক নামডাক, সাত-আটখানা ডিঙি নৌকা, এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ সোনা-ফলানো জমির চক, আরও অনেক কিছু। অনেক কিছুর মধ্যে এক বাড়ির দত্তগিন্নীর চন্দ্রহারের কথা প্রবাদবাক্যের মত এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। একশো আট ভরির চন্দ্রহার, অর্থাৎ ওজনে পাঁচ পোয়ার উপর।

এর পরই হ'ল সরকারদের উন্নতি। চাকা আরও এক পাক ঘুরল।

উন্নতির মূলে নাকি সরকারদের গুরুবল। একদা এক সিদ্ধপুরুষ সন্ন্যাসী এসে অতিথি হলেন। সরকার-বাড়ির সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে, যাবার সময় দিয়ে গেলেন দীক্ষা এবং এক শালগ্রামশিলা। বললেন, 'রাজ-রাজেশ্বর'। সেবা করিস, রাজা করবেন তোর বংশকে।

রাজা না হোক, রাজ-সরকারে অর্থাৎ নবাব (মুর্শিদাবাদ নয়, স্থানীয় জেলার নবাব)-দপ্তরে চাকরি হ'ল। রাজরাজেশ্বরের জন্য নাখরাজ মিলল। ক্রমে ঘরে এসে ঢুকল রায়চৌধুরীদের বাড়ি থেকে স্থানীয় জমিদারির দু আনা অংশ। দুর্গোৎসব প্রতিষ্ঠা করলেন, কালীপূজা আনলেন, আর আনলেন আমিরী চাল। আর আনলেন দেশদেশান্তর থেকে কুলীনের ছেলে।

মেয়েদের কুলীনে বিয়ে দিয়ে দৌহিত্রদের স্বতন্ত্র এক পাড়া প্রতিষ্ঠা করলেন। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দত্তদের সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। কিন্তু রাজ-রাজেশ্বর ছিলেন সরকার-পক্ষের প্রতি সদয়; দত্তদের মাথা মাটিতে নোয়াতে সরকারদের হাত তুলতে হ'ল না। ষাঁড়ের শত্রুকে বাঘে বিনাশ করলে। রায়চৌধুরীদের শেষ পতনের সময় বাধল জেলার নবাবের সঙ্গে হাঙ্গামা, সেই হাঙ্গামার মধ্যে দত্তদেব গদিও লুঠ হয়ে গেল। তারপর থেকেই হ'ল দত্তদের অবনতি। তারপর কোম্পানির রাজত্বে রেল পড়ল। প্রথম রেল-লাইন সাত ক্রোশ দূর পর্যন্ত। সাত ক্রোশ দূরে গ'ড়ে উঠল প্রকাণ্ড গঞ্জ। এখানে দত্তদের গদি মুদীর দোকানে পরিণত হ'ল। নদীর ঘাটে নৌকা আসা বন্ধ হ'ল, বন্দর উঠে গেল। তখন অবশ্য সরকার-বংশেরও ভাগ্যের নদীতে থম ধরেছে। সরকার-বংশের ছেলেরা তখন নিজেদের মধ্যে ছোরা-ছুরি, লাঠি-সোঁটা নিয়ে মত্ত। ইংরেজ কোম্পানির আদব উপেক্ষা করে না, তবে চাকরিকে ঘৃণা করে। ওদিকে ভাগিনেয়দের বংশ—কুলীনের ছেলেগুলি সরকারদেরই প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা মক্তবে বাংলা-ফার্সী শিখে কেউ উকিল, কেউ মোক্তার, কেউ সাবরেজিস্ট্রার হয়ে চন্দ্রকলাব মত বাড়তে শুরু করেছে। এই সময়ে দত্তদের ঘটে পরম পরাজয়। সদর-রাস্তার উপরে সরকার-বাবুরা এবং ভাগিনেয়-বংশের বাবুরা মজলিস ক'রে একদা ব'সে ছিলেন, পাশ দিয়ে যাচ্ছিল দত্ত-বংশের একজন। যাবার সময় দত্ত ঈষৎ হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে চ'লে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ জমিদারের হুকুমে পাইকেরা তাকে ধ'রে এনে ঘাড়ে ধ'রে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। যার ফলে দত্তর কপালে বিঁধে গিয়েছিল এক টুকরো কাচ। সে ক্ষতচিহ্ন তার সমস্ত জীবনে মিলায় নাই।

দত্তদের পাকা বাড়ির ভগ্নাবশেষ—ছোট আকারের পাতলা ইটে গাঁথা একটা ভাঙা পাঁচিলের খানিকটা আজও আছে। দূর থেকে দেখিয়ে লোকে বলে—দত্তবাড়ি। কাছে কেউ যায় না। ওই ভাঙা পাঁচিলের গোড়ায় নাকি থাকে এক দুধে-গোখরো।

সে নাকি অথর্ব। এত বুড়ো হয়েছে যে নড়তে-চড়তে পারে না। লোকে তাকে বলে বুড়ো।

ওই বৃদ্ধ জানে, নবগ্রামের জীবন-নাট্যে কত অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে প্রশ্ন তাকে করবে কে? মানুষের অবসর নাই। আজ নবগ্রামের জীবন-নাট্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মুখর হয়ে উঠেছে। গ্রামের প্রাচীন প্রধান জমিদার স্বর্ণবাবু এবং নবোদিত ধনী ব্যবসায়ী গোপীচন্দ্র, এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

প্রচণ্ডতায় প্রবল হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে অকস্মাৎ অঙ্কটি এক অভিনব ঘটনার মধ্যে শেষ হয়ে এল।

* * * *

হঠাৎ সংবাদ র'টে গেল, এখানকার কৃষ্ণ চাটুজ্জে যাবেন কাশীধাম, বিশ্বনাথের পদপ্রান্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের বাসনায়। চাটুজ্জে প্রবীণ, ষাট বৎসর অতিক্রম করেছেন অনেকদিন; দীর্ঘকাল সদর শহরে স্থানীয় জমিদারের আমমোক্তারি ক'রে অন্নবস্ত্রের স্বচ্ছল সংস্থানও করেছেন, পুত্র-কন্যায় সংসারও পরিপূর্ণ; রোগশয্যায় শুয়েই কবিরাজের দিকে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কি বুঝছ?

কবিরাজ বললেন, কষ্ট পাবেন কয়েকদিন।

হেসে চাটুজ্জে আবার প্রশ্ন করলেন, কষ্টভোগের অন্তে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটবে কিনা তাই বল।

কবিরাজ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, সে রকম কোন লক্ষণই নাই —না না।

চাটুজ্জে ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু। ভাল ক'রে দেখ তুমি। আমার নিজেব এমন মনে হচ্ছে কেন!

কি মনে হচ্ছে?

কিছু না। তুমি তোমার বাবাকে পাঠিয়ে দাও একবার। ডুলি বা গরুর গাড়ি—যাতে তিনি আসতে পারেন, তাতেই আসবেন তিনি।

বৃদ্ধ কবিরাজ এসে হাতখানি তুলে ধ'রে চোখ বুজে স্থির হয়ে দেখলেন প্রায় পাঁচ মিনিট। তারপর ধীরে ধীরে হাতখানি বিছানায় নামিয়ে দিলেন। এক টিপ নস্য নিলেন।

চাটুজ্জে প্রশ্ন করলেন, দেখলেন?

কবিরাজ কোন উত্তর না দিয়ে বাঁ হাতখানি তুলে নিলেন। বাঁ হাতের নাড়ীও অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে চিকিৎসকোচিত ধীরতার সঙ্গে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে বললেন, বলুন তো কি কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট?

হ্যাঁ। কষ্টটা কি? বলুন?

একটু ভেবে নিয়ে চাটুজ্জে বললেন, বলতে পারব না।

হুঁ। একটু স্তব্ধ থেকে কবিরাজ বললেন, আর একটু ভাবুন। কষ্ট না বলতে পারেন, আরাম কিসে হয় ভেবে দেখুন। বলুন।

চাটুজ্জে আবার বললেন, হ্যাঁ। আরাম কিসে হয় সেটা বুঝতে পারি।

বলুন।

ঘুমে। গভীর দীর্ঘ নিদ্রা যদি হয়, তা হ'লে যেন সব গ্লানি কেটে যায়।

হুঁ। কিন্তু নিদ্রা হয় না।

চাটুজ্জে বললেন, না।

কবিরাজ আর এক টিপ নস্য নিলেন।

চাটুজ্জে হেসে বললেন, এইবার আপনি বলুন।

কবিরাজ মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলেন, কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে? রুচি কিসে?

রুচি?

হ্যাঁ, বলুন।

ঘাড় নেড়ে চাটুজ্জে উত্তর দিলেন, কিছুতে না, যা মুখে দি, বিস্বাদ মনে হয়। খাবার জিনিসের গন্ধে বমি আসে।

কবিরাজ আর একবার হাত দেখে বললেন, কি বাসনা আছে আর চাটুজ্জে মশায়?

হেসে চাটুজ্জে বললেন, সেই বাসনা পূর্ণ করবার জন্যেই আপনাকে কষ্ট দিলাম।

বলুন।

বাসনা! দেহখানা তো শবে পরিণত হবে, গঙ্গাতীরেও নিয়ে গিয়ে দাহ করবে; কিন্তু শিবময় কাশী ভিন্ন বিশ্বনাথের চরণাশ্রয় তো পাব না!

বেশ, কাশীই যান। পনরো দিনের পূর্বে কোনও আশঙ্কা নাই।

যেতে পারব তো?

যত্ন করে নিয়ে যেতে হবে। ধ'রে তুলবে, ধ'রে নামাবে; আমি কিছু ওষুধও দেব, ক্লান্তি অবসাদ অনুভব করলে খাবেন। একটু নীরব থেকে কবিরাজ বললেন, চ'লে যান আপনি। বেশ বুঝতে পারছি—বিশ্বনাথ আপনাকে ডেকেছেন। নইলে, আপনি এতটা বুঝতে পারতেন না। চ'লে যান, কোনও ভয় নাই।

দুদিনের মধ্যেই গ্রামে প্রচার হয়ে গেল কথাটা। আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। চাটুজ্জে-বাড়িতে ভদ্রমণ্ডলী একে একে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির বাইরে সাধারণ লোকে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক এবং অসাধারণ নয়। এখানকার প্রধানদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানগঙ্গা গিয়েছেন, তবে কাশী বড় কেউ যান নাই। পূর্বে

রেল যখন ছিল না, তখন এ কামনা কল্পনাতেও আসত না, রেল হওয়ার পর লোকে তীর্থভ্রমণের জন্য কাশী গিয়েছে, কিন্তু রুগ্ন অবস্থায় মৃত্যু অবধারিত জেনে কাশীতে মৃত্যুকামনায় এর পূর্বে মাত্র একজন গিয়েছেন। চুরাশি বৎসর বয়সে এখানকার দীনবন্ধুবাবু উকিল গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণ চাটুজ্জে। পরিণত বয়সে মৃত্যুকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করার যে আদর্শ এবং সাধনা, এখানকার সমাজে আজও তা বেঁচে আছে—মাটির সঙ্গে মিশে আছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাড়ির মধ্যে বারান্দায় বিছানা ক'রে, পিঠের দিকে কয়েকটা বালিশ দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে চাটুজ্জে আত্মীয়-জ্ঞাতি-প্রতিবেশী-বন্ধুদের স্মিত হাস্যে নীরবে সম্ভাষণ করলেন। কয়েকজন প্রবীণ ধর্মচর্চা করছিলেন—শিবলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি বিভিন্ন লোকের আলোচনা চলছিল। অল্পবয়স্কেরা বিস্মিত সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চাটুজ্জেকে দেখছিল। মেয়েদের আসর পড়েছে আর একটি বারান্দায়, সেখানেও গুঞ্জন চলছে। এ গ্রামের কন্যা এবং প্রবীণতমাদের প্রধান রজন-ঠাকরুণ অর্থাৎ রজনী ঠাকুরাণী, বিদায়ের প্রাক্কালে কি করতে হবে সেই সব বিধি দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দরজার মুখে লোকজনের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, ব্যস্ত হয়ে স'রে গিয়ে সকলে পথ দিলে, সেই পথে প্রবেশ করলেন রাধাকান্তবাবু—ওই উকিল দীনবন্ধুবাবুর পুত্র। বেশভূষার রুচিতে পদক্ষেপের ভঙ্গীতে একটি সহজ আভিজাত্য পরিস্ফুট। বলশালী দেহ, গম্ভীর মুখ, চোখের গভীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব যেন সহজাত ব'লে মনে হয়।

চাটুজ্জে আর একটু উঠে বসবার চেষ্টা করে বললেন, আসুন, রাধাকান্ত-কাকা আসুন।

যাঁরা আগের দিকে ব'সে ছিলেন, তাঁরা রাধাকান্তবাবুর জন্য বসবার স্থান ছেড়ে দিলেন।

রাধাকান্তবাবু বসলেন, বললেন, দাদার আচরণে আমি লজ্জা পেয়েছি। নইলে শালী দেহ, গম্ভীর মুখ, চোখের গভীর দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব যেন সহজাত ব'লে মনে হয়।

চাটুজ্জে বললেন, এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনার কথান্তরও হয়েছে, সে আমি শুনেছি, প্রতাপ আমাকে বলেছে। কিন্তু তার জন্যে আপনি কি করবেন বলুন? আপনি আমার যা করলেন, সে আমার মহা উপকার।

চাটুজ্জে একটু থামলেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বললেন, আপনি কর্তাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলেন, কোথায় কি করতে হবে—যে ভাবে লিখে

দিয়েছেন, কাশীতে বাসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, আপনার সম্বন্ধীকে লিখেছেন কাশীতে দেখাশুনা করতে, সাহায্য করতে। এর চেয়ে বেশি আর কে করবে বলুন।

রাধাকান্তবাবু বললেন, যাওয়ার ব্যবস্থা তা হ'লে গরুর গাড়িতেই ঠিক করলেন? সাত মাইল পথ!

ওদিকে দরজার সম্মুখে লোকজন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। দরজার ওপাশ থেকেই এখানকার সরকারবংশীয় জমিদার বংশলোচনবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল—মূকং করোতি বাচালং, মূককে বাচাল করেন, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, ভগবানের কৃপা থাকলে ভয় কি? সমতল রাস্তা, হাতীর মত গরু আমার, সাত মাইল পথ কতক্ষণ? শ্যামাকান্তকে ব'লো, পালকি-খানাকে আয়রনচেস্টে পুরে রাখতে। রাধে, রাধে, রাধে!

চাটুজ্জে আবার একবার অল্প ওঠবার চেষ্টা ক'রে বললেন, আসুন, আসুন।

বংশলোচন বললেন, আমার গরুর গাড়ি দেব, আপনার কোনও চিন্তা নাই।

বংশলোচনবাবুর সঙ্গে ছিলেন স্বর্ণকমলবাবু,—স্বর্ণকমলবাবু, এখন এখানকার প্রতিপত্তিশালী জমিদার হিসাবে প্রধান। গোঁফে তা দেওয়া তাঁর একটা অভ্যাস, অভ্যাসমত গোঁফে তা দিতে দিতে তিনি বললেন, তিনখানা ভাড়ার গাড়ি ঠিক হয়েছে, ঠিক সময়ে তারা আসবে। তাদের একটু আগেই রওনা ক'রে দেবেন। একটু হেসে বললেন, লচুকাকার হাতীর মত গরুর সঙ্গে তো সমানে চলবে না ওদের মর্কটের মত গরু।

বংশবাবু বললেন, তা শ্যামাকান্তর তেঠেঙে, ছাউনি ছেঁড়া পালকিটা যদি পালকি হয়, তবে আমার গরুও হাতী।

স্বর্ণবাবু বললেন, গুজরাটী।

বংশবাবু হঠাৎ রাধাকান্তের দিকে ফিরে বললেন, রাধাকান্ত কি পালকিখানা ভেঙে ফেলে রেখেছ, লোককে দেবার ভয়ে?

রাধাকান্ত হেসে বললেন, লোকের ভয়ে ঠিক নয়, নিজের ভয়ে।

নিজের ভয়ে? কেন, পাছে আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়? না কি?

রাধাকান্ত আবার ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে লচুকাকার দিকে চেয়ে বললেন, জবাবটা বাকি রইল লচুকাকা। চাটুজ্জের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আজকে ওঁর সামনে জবাবটা ঠিক শোভন হবে না। অন্য দিন মনে ক'রে দিও, জবাব দেব।

রুগ্ন চাটুজ্জে একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই জমিদারগুলিকে তিনি জানেন, ভয় করেন, রাধাকান্তকেও জানেন, হয়তো তাঁর এইখানেই এই উপলক্ষে কোন একটি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়ে যাবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, প্রতাপ! প্রতাপ!

কৃষ্ণচন্দ্রের ভাই প্রতাপচন্দ্র। প্রতাপ ব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়াতে তিনি বললেন, এঁদের তামাক দাও। আমার মহাভাগ্য যে এঁদের পায়ের ধুলো পড়েছে।

প্রতাপচন্দ্র বেরিয়ে যাচ্ছিল, দরজার মুখেই সে ব্যস্ত হয়ে কাকে আহ্বান করলে, আসুন, আসুন, আসুন।

সুদীর্ঘকায় গৌরবর্ণ, পাকাচুল লোকটি এসে দাঁড়ালেন। এবার সমগ্র বাড়িটাই যেন চঞ্চল হ'ল। শুধু স্বর্ণকমলবাবু বেশি গম্ভীর হয়ে গেলেন। এলেন যিনি, তিনি গোপীচন্দ্রবাবু, এ গ্রামের নূতন ধনী এবং ধনের পরিমাণে ইতিমধ্যেই স্থানীয় সকলকেই তিনি অতিক্রম করেছেন। সকলের চেয়ে বড় পাকাবাড়ি তৈরি করেছেন, ঠাকুর এবং ঠাকুর-বাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ গ্রাম এবং গ্রামখানির অব্যবহিত পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি না হ'লেও দূরে-দূরান্তরে জমিদারিও কিছু কিনেছেন, জুড়িগাড়িও তিনি সম্প্রতি কিনেছেন—যা এ অঞ্চলে কারও কখনও ছিল না বা নাই। স্বর্ণকমলবাবুও সম্প্রতি একটি ঘোড়া এবং একখানা টমটম কিনেছেন, কিন্তু জোড়া ঘোড়া ও পালকি-গাড়ির সঙ্গে তার মর্যাদার পার্থক্য অনেক। গোপীচন্দ্রবাবু এখানে বড় একটা থাকেন না, থাকেন কলকাতায় এবং কয়লাকুঠী-অঞ্চলে,—অনেকগুলি কয়লাকুঠীর মালিক তিনি। নিজের জীবনেই তিনি এ সব সম্পদ ও সম্পত্তি আয়ত্ত করেছেন ; তাঁর বাপ ছিলেন নিঃস্ব ; তিনি নিজে জীবন আরম্ভ করেছিলেন কয়লাকুঠীতে সাত টাকা বেতনে।

বংশলোচনবাবু বললেন, এস, এস। এলে কবে তুমি ?

বিনয়সহকারে কথা বলাই গোপীচন্দ্রের অভ্যাস এবং কথা ও কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই সুমিষ্ট, তিনি বললেন, আজই সকালে এসে পেঁৗছেছি। এসেই শুনলাম। তারপর একটু নীরব থেকে বললেন আপনি ভাল ছিলেন ?

বংশলোচন বললেন, 'তোমার কুশলে কুশল মানি', তুমি কেমন বল ?

রাধাকান্ত হঠাৎ উঠলেন, চাটুজ্জের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি উঠছি।—ব'লে চাটুজ্জের পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আপনাকে প্রণাম করছি আমি।

চাটুজ্জে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, সে কি, বয়সে অনেক ছোট হলেও আপনি আমার কাকা—

রাধাকান্ত বললেন, আজ আপনি শিবত্ব কামনায় কাশী চলেছেন, সংসারকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন, সকল সম্বন্ধকে অতিক্রম করেছেন—আজ আপনার চেয়ে বড় কেউ নাই, আপনি সকলের বড়, প্রণম্য।

কৃষ্ণ চাটুজ্জে স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রাধাকান্তের দিকে চেয়ে রইলেন, পার্থিব সকল কিছুকেই তিনি ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, বৈরাগ্য এবং মৃত্যুর দিকে প্রশান্ত মুখে অগ্রসর হওয়ার দৃঢ়তার নিকট সমস্ত কিছুই তুচ্ছ করতে চেয়েছেন তিনি ; কিন্তু তবু গ্রামের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাপন্ন পিতার সন্তান রাধাকান্ত সামাজিক সম্বন্ধে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সত্যই যেন মহত্তম স্বর্গের দিকে অগ্রসর ক'রে দিলেন ব'লে তাঁর মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তে তিনিই যে আজ সকলের চেয়ে মহত্তম ব্যক্তি, মহিমান্বিত ব্যক্তি—এ বোধও ওই রাধাকান্তই তাঁর অন্তরে জাগ্রত ক'রে দিলেন। রাধাকান্ত তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। সমস্ত বাড়িটি তখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। রাধাকান্তের কথাগুলির ধ্বনিই প্রতিটি লোকের কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ; মুখর বংশলোচন পর্যন্ত স্তব্ধ। স্বর্ণকমলবাবু নীরবই ছিলেন, কিন্তু গোপীচন্দ্র আসবামাত্র তাঁর মুখে যে দাম্ভিকতাদৃপ্ত গাম্ভীর্যের ছায়া নেমেছিল, সে ছায়াচ্ছন্নতা কেটে গিয়েছে। গোপীচন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রাধাকান্তের পর তিনিই সর্বপ্রথম উঠে এসে চাটুজ্জের পায়ের দিকে সুদীর্ঘ গৌরবর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন। নীরবেই পায়ের ধুলো নেওয়া শেষ ক'রে বললেন, একটা কথা বলছিলাম।— কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তিনি বললেন, শুনলাম, ট্রেন ধরবার জন্যে এখান থেকে গরুর গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। আমার ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে। যদি বলেন, তবে পাঠিয়ে দিই।

চাটুজ্জে বললেন, দেবেন।

তিনি সত্যই এক মুহূর্তে সংসারকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন, আজ যে যা দিতে চাইবে, তার কোন কিছু নিতেই তাঁর দ্বিধা নাই, শোধ করবার দায়িত্বই যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

সেই মুহূর্তেই রাধাকান্ত আবার ফিরলেন দরজার মুখ থেকে। বললেন, বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। আশ-পাশ গ্রাম থেকেও লোক আসছে। সম্ভব হ'লে, বাইরের বারান্দায় বিছানা ক'রে যদি আপনি সকলকে দেখা দেন—

চাটুজ্জে ডাকলেন, প্রতাপ!

বংশলোচন বললেন, বারবেলা, কি খারাপ সময় নয় তো ? পঞ্জিকাটা দেখ। ব'লে এবার তিনি এগিয়ে এলেন। বংশলোচনের পরে এলেন স্বর্ণবাবু, তারপর অন্য সকলে। বংশলোচনবাবু ধমক দিলেন, ধীরে, ধীরে—একে একে—আস্তে।

ঠিক এই সময়টিতেই, দরজার মুখ থেকে একজন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে স্বর্ণবাবুর কাছে দাঁড়াল। মৃদুস্বরে অথচ ব্যস্তভাবে বললে, আপনার নায়েব এসেছে। আপনাকে—

তার কথা শেষ হবার পূর্বেই কথার মাঝখানেই স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, রমণ এসেছে ?

হ্যাঁ। আপনাকে এখুনি যেতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব—

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব! ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি ?

ইস্কুলে এসেছেন, ইস্কুল দেখছেন।

ইস্কুল দেখছেন ?

হ্যাঁ।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, না, এস. ডি. ও. ?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই তো বললে আপনার নায়েব।

হুঁ। ব্যস্ত হয়ে স্বর্ণবাবু চাটুজ্জের দিকে ফিরে বললেন, কি ফ্যাসাদ দেখুন, হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন ইস্কুলে! আমি তা হ'লে যাই। গাড়ি আপনার ঠিক সময়ে আসবে। লচুকাকা, তুমি বরং ব্যবস্থা ক'রো সব।

বংশবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খামকা আসবেন কি হে বাপু ? তিনি এলে থানায় পরোয়ানা আসবে, জমিদারদের জানাবেন দারোগাবাবু, তাঁর খাদ্য-সরবরাহ আছে—

এবার স্বর্ণবাবুর নায়েব এগিয়ে এল, আজ্ঞে, হঠাৎ এসেছেন তিনি। গিয়েছিলেন শঙ্করপুর থানা। সেখান থেকে মনিহারপুর হয়ে সদরে ফিরছিলেন। পথে আমাদের নদীর ঘাটে ঘোড়ার গাড়ির চাকা ভেঙে যাওয়ায়, এখানকার থানায় যাচ্ছিলেন হেঁটে। গ্রামে ঢুকতেই ইস্কুল দেখে, ইস্কুলে ঢুকেছেন।

আর কোন কথা হবার আগেই এবার আর একজন এগিয়ে এল বাইরে থেকে।

রাইটার-বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাইটার-বাবু অর্থাৎ রাইটার কন্‌স্টেব্‌ল।

স্বর্ণবাবু ব্যস্তভাবেই গোঁফে তা দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

যথাসময়ে গরুর গাড়ি এল। স্বর্ণবাবুর ভাইও এলেন এই সময়টিতে। স্বর্ণবাবু পাঠিয়েছেন তাঁকে, গাড়ি এসেছে কি না দেখতে। ভাড়ার গাড়ি, গাড়োয়ানেরা স্বর্ণবাবুর প্রজা। তিনি তাঁদের ব'লে দিয়েছিলেন, খবরদার, যেন দেরি না হয়।

স্বর্ণবাবুর ভাই দাঁড়িয়ে তদ্বির ক'রে মালপত্র বোঝাই করালেন। চাটুজ্জের সঙ্গে যাবেন ছেলে গোপাল এবং ভগ্নী কাত্নু। তারা ছাড়া আর যাঁরা সঙ্গে যাবেন—চাটুজ্জের কন্যা, ছোট ছেলে, শ্যালিকা, ভাগ্নে—এঁরাও গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ির চারিদিকে লোকের ভিড় সমানে জ'মে আছে,—এক যাচ্ছে, এক আসছে। বাড়ির বাইরের বারান্দাতেই চাটুজ্জে আধাশোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন। মধ্যে মধ্যে নূতন লোকের দল এলে তাদের দিকে তাকাচ্ছেন। এ ছাড়া কখনও হঠাৎ মনে পড়ছে কোন একটা অতীত কথা, তখন সেই ঘটনাটি গ্রামের যেখানে ঘটেছিল, সেই স্থানটির দিক-লক্ষ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করতে চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টার মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ছে কোন প্রাচীন গাছের শাখাপল্লব, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে সেই গাছের ফলের কথা অথবা ফুলের কথা অথবা ছায়ার কথা।

স্বর্ণবাবুর ভাই এসে বললেন, দাদা আসতে পারলেন না, সায়েব এসেছেন, ইস্কুল নিয়ে কথাবার্তা—। তা ছাড়া, গাঁয়ের কথা তো জানেন। ইস্কুল নিয়ে শত্রুতা আরম্ভ করেছে।

চাটুজ্জের কানে বোধ হয় কথাটা গেল না। তিনি উদাস দৃষ্টিতে যেমন তাকিয়ে ছিলেন, তেমন ভাবেই তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর গোপীচন্দ্রবাবুব জুড়ি এসে দাঁড়াল। জুড়ির সঙ্গে গোপী-চন্দ্রের ছোট ছেলে এসেছে। ছেলেটির নাম পবিত্র। বাপের মতই মিষ্টভাষী এবং বিনয়ী। নম্রকণ্ঠে বললে, বাবা বললেন, তিনি ক্ষমা চেয়েছেন আপনার কাছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন শুনেছেন বোধ হয়। সাহেবের সঙ্গে এখানে এণ্ট্রেন্স স্কুল করবার কথা হচ্ছে। বড়দা মেজদাও সেখানে। আমি এসেছি। সে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে।

চাটুজ্জে এ সংবাদটায় যেন ঈষৎ চঞ্চল হলেন। ধীর ক্লান্ত স্বরে বললেন, এণ্ট্রেন্স ইস্কুল হবে?

হ্যাঁ। বাবার তো অনেক দিন থেকেই ইচ্ছে।

চাটুজ্জে বললেন, ভাল হবে, ভাল হবে।

আরও হয়তো কিছু বলতেন তিনি। কিন্তু কানে এসে ঢুকল খোল-

করতালের ধ্বনির সঙ্গে সংকীর্তন-গান—"ও সে নামের তরী বাঁধা ঘাটে, ডাকলে দয়াল পার করে"।

সংকীর্তনের দলের পিছনে বংশলোচনবাবু।

চাটুজ্জে প্রস্তুত হয়ে ঈষৎ খাড়া হয়ে গমনোদ্যত হয়ে উঠলেন—শিব, শিব, শিব!

গাড়ি চ'লে গেল। লোকজনের অনেকে গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত গাড়ির সঙ্গে ছুটে গেল। গ্রাম পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা বাগান।—ফলের বাগান, বাগানের মধ্যে একটি দেবমন্দির। রাধাকান্তবাবুর বাপ প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন। সেইখানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাধাকান্ত।

কোচোয়ান গাড়ি থামালে।

রাধাকান্ত বললেন, না, থামবার প্রয়োজন নাই। তিনি উঁকি মেরে দেখলেন, চাটুজ্জে চোখ বন্ধ ক'রে আধশোয়া অবস্থায় ব'সে রয়েছেন। জীর্ণরেখাঙ্কিত মুখের উপর দুটি শীর্ণ জলের ধারা নেমে এসেছে মুদ্রিত চোখের দুটি কোণ থেকে।

দুই

উনিশ শো পাঁচ সাল। বঙ্গব্যবচ্ছেদকে উপলক্ষ্য ক'রে অকস্মাৎ দেশময় একটা সাড়া জেগে উঠেছে। ঘুমন্ত জীবের ধমনীতে অপূর্ব কৌশলে ছিদ্র ক'রে এক শ্রেণীর বাদুড়ে রক্ত পান করে, ঘুমন্ত জীব রক্তক্ষয়ে দুর্বলতার জন্য একটা অশান্তি অনুভব করে, দুঃস্বপ্নাতুরের মত ঘুম ভেঙে উঠতেও চায়, কিন্তু উঠতে পারে না ; সে সময় যদি কৌশলী বাদুড় কৌশল ভুলে চঞ্চুর আঘাত করে দেহে, তবে সে আঘাতে জীব যে বেদনা, যে জ্বালা, যে ক্ষোভ নিয়ে চীৎকার ক'রে জেগে ওঠে, বঙ্গব্যবচ্ছেদের জাগরণ ঠিক সেই ধারার জাগরণ। সে জাগরণের কথা পৃথিবীর ইতিহাসে ইংরেজের আমলে গণ্য হবার মর্যাদা লাভ করবে না, শুধু সরকারী রিপোর্টে থাকবে। কিন্তু এ দেশের মানুষ সে তথ্য সংগ্রহ ক'রে রাখছে। একদিন সে জাগরণের কাহিনী প্রকাশিত হবে। এ গ্রামের রাধাকান্তবাবু নিয়মিত জীবনের দিনলিপি রেখে থাকেন, তিনিও লিখে রাখছেন।

উনিশ শো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গে দেশ জেগেছে। সরকারও সজাগ এবং

তৎপর হয়ে উঠেছেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের টুর-প্রোগ্রাম বেড়েছে। আগে সাধারণত এস. ডি. ও. সাহেবরাই আসতেন, যেতেন; ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহাশক্তির রহস্যের মত অদৃশ্য এবং দুর্লভ ছিলেন; কদাচিৎ বর অভয় করবার নিমিত্ত, অথবা দেবলোকে দানবোত্থানের মত কিছু সমুপস্থিত হ'লে তাকে দমনার্থ আবির্ভূত হতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে মোটর ছিল না, রেল-লাইন জেলাটার মধ্যে সবে একটা ছিল, কাজেই ছ্যাকরাগাড়িতে যাতায়াত করতে হ'ত। এই থানার পাশে শঙ্করপুর থানা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শঙ্করপুর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। পথে এই গ্রামপ্রান্তে নদী। নদী পার হয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক চ'লে গিয়েছে সদর শহরে। নদীর ঘাটে সাহেবের গাড়ি ভেঙেছে। সাহেব এসে ঢুকলেন এই গ্রামে।

পথে স্বর্ণবাবুর বাবার প্রতিষ্ঠিত এম. ই. স্কুলটা দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লেন। বেহার প্রদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশীয় ব্যক্তি—আই. সি. এস.। সম্ভ্রান্তদর্শন চেহারা, সর্বোপরি জমকালো একজোড়া গোঁফ। হেডমাস্টার তাঁকে দেখেই তটস্থ নয়, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কুর্নিসের মত আভূমি নত সেলাম জানিয়ে সত্য সত্যই হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন।

সাহেব বললেন, আমি এ জেলার কালেক্টার এবং ম্যাজিস্ট্রেট। তুমি হেডমাস্টার ?

হেডমাস্টার কেঁপে উঠলেন, তাঁর গলা শুকিয়ে গেল, কোন রকমে শুষ্ককণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, আই হ্যাভ দি অনার টু বি সার্, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট।

ধন্যবাদ তোমাকে। আমি তোমার স্কুল দেখতে চাই।

হেডমাস্টার করতলযুগল প্রসারিত ক'রে পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

স্বর্ণবাবুর অবস্থা খারাপ না হ'লেও, স্বচ্ছলতার সমস্তটুকুই এখন ব্যয়িত হচ্ছে তাঁর জ্ঞাতি এবং সদ্য-উদীয়মান ধনী গোপীচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতায়। মামলা-মকদ্দমা দিয়ে মালা গাঁথা যায়। স্কুলটা স্বর্ণবাবুর বাড়ির সীমানার মধ্যেই, তাঁর কাছারি এবং বৈঠকখানার সামনেই; তবুও তাঁর সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশও নাই, সামর্থ্যও নাই। স্কুলের আসবাবপত্র ভেঙেছে, চেয়ার-বেঞ্চগুলোর অধিকাংশই নড়ে, ব্ল্যাকবোর্ডগুলোর রঙ নষ্ট হয়েছে, দেওয়ালের চুন উঠে গিয়ে তৈলাক্ত টাক-পড়া মাথার মত মনে হচ্ছে, অনেক জায়গায় পলেস্তারা উঠে গেছে, খড়ের চাল থেকে ছাওয়ানো-অভাবে সারি

সারি জলের ধারা প'ড়ে সারা দেওয়ালটাকে তার উপর কর্দমাক্ত করে তুলেছে। কিন্তু ছেলের সংখ্যা কম নয়।

সাহেব বিস্মিত হয়ে নোট-বই খুলে এ গ্রামের তথ্যগুলির উপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন তাতেও তাঁর বিস্ময় কাটল না।

প্রাচীন জমিদারপ্রধান গ্রাম, ধনের খ্যাতি আছে, খ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। সভ্য সমাজ। তিনি প্রশ্ন করলেন, হেডমাস্টার, এমন গ্রামে স্কুলের অবস্থা এমন কেন?

হেডমাস্টার সবিনয়ে বললেন, হুজুরের কৃপাদৃষ্টি হ'লে অবস্থা এখুনি ভাল হবে।

সাহেব তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, গভর্মেণ্ট অবশ্যই তাঁর কর্তব্য ক'রবেন। এবং আমি আশা করি, এখনও করেন। গ্র্যাণ্ট পাও নিশ্চয়।

পাই। কিন্তু অত্যন্ত অল্প।

বাকিটা স্থানীয় লোকেরা দেবে।

হেডমাস্টার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

স্কুলের ফাউণ্ডার কি দেন?

আগে সবই দিয়েছেন, যখন যা অভাব হয়েছে যুগিয়েছেন, কিন্তু এখন অবস্থা তাঁর পূর্বের মত নাই, নানা কারণে তিনি এখন বিব্রত—। কথা অসমাপ্ত রেখেই তিনি চুপ করলেন। বাকিটা বুঝে নিতে সাহেবের কষ্ট হল না।

এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আছে শুনেছি, তারা কেউ দেয় না কেন?

হেডমাস্টার মাথা চুলকাতে লাগলেন। অবশেষে বললেন, তাঁরা এ বিষয়ে উদাসীন। হুজুর, এই এতগুলি ছেলে পড়ে স্কুলে, তার মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেদের বেতনই নিয়মিত পাই না।

সাহেব একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে হেসে বললেন, সেটাতে এরা ধারে ছেলে পড়াবার একটা গৌরব অনুভব করে। ওতে এদের ক্রেডিট বাড়ে ব'লে মনে করে। তোমরা কখনও সাহায্য চেয়েছো?

হেডমাস্টার বললেন, চাই নি এমন নয়। তবে—

তবে খুব আর্নেস্টলি চাও নি, কেমন?

হেডমাস্টার চুপ ক'রে রইলেন।

সাহেব একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আমি যদি চাঁদা আদায় করে দিই? মাস্টারের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের ফাউণ্ডার-প্রোপ্রাইটারের নিতে আপত্তি হবে না তো?

হেডমাস্টার বললেন, তাঁকে খবর পাঠিয়েছি সার্, তিনি আসবেন এক্ষুনি।
সাহেব পা তুলিয়ে বললেন, আমি এই সব পিপ্‌লকে জানি হেডমাস্টার। এরা হচ্ছে ফাঁকা ড্রামের মত দাম্ভিক।
হেডমাস্টার কোন উত্তর দিতে সাহস করলেন না।
সাহেব একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, এখানকার ইয়ং জেনারেশন কি রকম? তারা রট্‌ন 'বণ্ডে মাটরম্' করে না? বিলাতী কাপড় পুড়িয়ে বন্‌ফায়ার করে না? নিজেই ব'লে উঠলেন—প্রশ্ন-শেষের এক মুহূর্ত পরে, ইয়েস—ইয়েস, বন্‌ফায়ার করেছিল এখানে, পুলিস রিপোর্ট পেয়েছি আমি।
হেডমাস্টার বললেন, সে সার্ অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। সে সব এখানে কিছু নাই।
আমি আশা করি তাই। বিশেষ ক'রে আমি রয়েছি এ জেলায়।
কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, শোন হেডমাস্টার। গভর্মেণ্ট সব করতে প্রস্তুত তোমাদের জন্যে। আমি দেখব, যাতে তোমাদের গ্র্যাণ্ট বাড়ে। আমি গ্রামে স্থানীয় লোকদের কাছে সাহায্য আদায় ক'রে দেব। কিন্তু তুমি দেখো, but you see, এই ছেলেদের সৎশিক্ষা দিতে হবে তোমাদের। এই সব রট্‌ন থিংস—হুজুক, এতে যেন তারা না মাতে, ওদিকে তাদের টেণ্ডেন্সি না যায়।
বার কতক চুরুটে টান দিয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এ গ্রামের সবচেয়ে অর্থশালী ব্যক্তিটি কে?
হেডমাস্টার বললেন, বাবু গোপীচন্দ্র ব্যানার্জি।
জমিন্দার?
জমিন্দারি তিনি সম্প্রতি কিনেছেন বটে, কিন্তু জমিন্দার হিসেবে বড়-লোক নন। তিনি মার্চেণ্ট।
মার্চেণ্ট? ধান-চালের ব্যবসা করে?
না সার্। তিনি কলিয়ারি-প্রোপ্রাইটার, কোল-মার্চেণ্ট। বাংলা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোল-মার্চেণ্টদের একজন।
সাহেব সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বল কি? তবে তো তার মূল্য লক্ষাধিক টাকা?
অনেক লক্ষ টাকার মালিক তিনি সার্।
স্বর্ণবাবু এসে সাহেবকে আভূমি-নত সেলাম ক'রে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি বাড়ির ভিতর গিয়ে জামা-কাপড় পালটে চোগা-চাপকান প'রে এসেছেন। মুখে বললেন, গুডমর্নিং সার্।

হেডমাস্টার বললেন, ইনিই আমাদের প্রোপ্রাইটার এবং সেক্রেটারি।

সাহেব বললেন, গুডমর্নিং।

দারোগা এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। বললে, হুজুরের কত দেরি হবে এখানে? আমরা ডাকবাংলোয় হুজুরের খানার সমস্ত ব্যবস্থা করেছি। জিনিসপত্র সেখানে পাঠিয়েছি, বাবুর্চী খবর পাঠিয়েছে—

ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে সাহেব দেখলেন, উঃ, দেড়টা বাজে প্রায়! তিনি উঠলেন। হেডমাস্টারকে বললেন, ভেবো না হেডমাস্টার, আমি ব্যবস্থা করব একটা, আজই করব। স্বর্ণবাবুকে বললেন, বিকেল পাঁচটার সময় ডাকবাংলোয় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সাব ইন্সপেক্টর, তুমি গ্রামের জমিন্দার এবং ভদ্রলোকদের খবর দাও, সাড়ে পাঁচটায় যেন আমাকে ডাকবাংলোয় সেলাম দেয়। হেডমাস্টার, তুমি আমার সঙ্গে আসবে? আমি তোমাদের এই গোপীচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

স্বর্ণবাবু সেলাম জানিয়ে বললেন, আমি পাঁচটায় যাব। তিনি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহেবের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়াটাই বিধি, কিন্তু সে বিধি তিনি লঙ্ঘন করলেন। গোপীচন্দ্রের বাড়ি চলেছেন সাহেব, সেখানে যেতে তিনি বাধ্য নন।

গোপীচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জের বাড়িতে। নায়েব হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গেল। সাহেব বারান্দায় একখানা চেয়ারে ব'সে ছড়িটা মেঝেতে ঠুকতে লাগলেন, দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ ছিল গোপীচন্দ্রের নবনির্মিত ঠাকুর-দালান ও নাটমন্দিরের দিকে। হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মনে হ'ল, সাহেব যেন লাঠির প্রান্ত দিয়ে ঠুকে গোপীচন্দ্রের কীর্তির ভিতের দৃঢ়তা পরীক্ষা করছেন, যেমন ডাক্তারে বুকের উপর আঙুলের টোকা মেরে বুক পরীক্ষা করেন।

হঠাৎ সাহেব প্রশ্ন করলেন, এ সব তো তোমাদের দেবতার জন্যে করা হয়েছে?

হাঁ সার্।

কি হয় এখানে? ফুল আর পাতা দিয়ে পূজো? ড্রাম-ট্রাম্পেট-বেল্‌স বাজাও? নানা রকম সুখাদ্য খেতে দাও? কতকগুলো গোট্‌স স্যাক্‌রি-ফাইস করা হয়? হাও মেনি? অনেক? না?

না, সার্। গোট্‌স এখানে স্যাক্‌রিফাইস করা হয় না। রাধাকৃষ্ণ—বৈষ্ণবের দেবতা—

আই সি। রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন—অ্যা ?

ইয়েস সার্।

এ সব তো খুব বেশি দিনের নয়। খুব সম্প্রতি হয়েছে, না ?

হ্যাঁ সার্। বৎসর-তিনেক বোধ হয়। এই নাটমন্দির শেষ হয়েছে সেদিন—সেভ্ন অর এইট মান্থ্স ওন্লি।

আর কি কীর্তি করেছেন তিনি ?

হেডমাস্টার একটু ভেবে বললেন, আর ? আরও দুটি শিব প্রতিষ্ঠা করেছেন, এখানকার সর্বসাধারণের দেবস্থান মহাপীঠে দেবীর মন্দির ক'রে দিয়েছেন—

আর কি ?

হেডমাস্টার ব্যস্ত হয়ে বললেন, এই যে উনি আসছেন।

বিস্মিত দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে রইলেন সাহেব। বাঙালীর মধ্যে এ চেহারা সুদুর্লভ। ছ ফুটের উপর লম্বা একটি মানুষ, কাঁচা সোনার মত গৌর দেহবর্ণ, তুষারশুভ্র মাথার চুল, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাতলা রক্তাভ দুখানি ঠোঁটের মিলনরেখায় স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি যেন লেগে রয়েছে। পরনে সাদা থানধুতি, গায়ে তেমনই সাদা কফওয়ালা শার্ট, পায়ে দুপাশে স্প্রিংওয়ালা জুতো। গোপীচন্দ্র ঈষৎ অবনত হয়ে সেলাম করলেন—গুডমর্নিং সার্।

সাহেব তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, গুডমর্নিং বাবু। গোপীচন্দ্র হাত বাড়ালেন সসম্ভ্রমে ঈষৎ অবনত হয়ে। সাহেব গোপীচন্দ্রের হাতখানি তুলে নিতে গিয়ে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন গাঢ় রক্তাভ হাত তিনি কখনও দেখেন নাই। লাল পদ্মের পাপড়ির মত কোমল রক্তাভ।

গোপীচন্দ্র বাংলাতেই বললেন, হুজুর আমার বাড়িতে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। সাহেব বাংলা বুঝতে পারেন, ভাল বলতে পারেন না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি একজন বড় কলিয়ারি প্রোপ্রাইটার এবং কয়লার ব্যবসাদার, তোমাকে নিশ্চয় অনেক ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। আমি আশা করি, ইংরেজীতে কথা বললে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। অসুবিধা হ'লে আমি হিন্দীতে বলতে পারি।

হেডমাস্টার বললেন, ইংরেজী উনি বুঝতে পারেন সার্ বলার অভ্যাস নাই।

গুড। তারপর একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, তুমি বসতে পার গোপীচন্দ্রবাবু।

রাস্তার সামনে তখন অনেক লোক জ'মে গিয়েছে। জেলার হর্তা-কর্তাবিধাতা ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন—এ সংবাদে অনেক লোক ছুটে দেখতে এসেছে। কৃষ্ণ চাটুজ্জের কাশীযাত্রার বিস্ময়কর সংঘটনটি আজই না ঘটলে হয়তো রাস্তা আজ জনতায় ভ'রে যেত। তাবা বিস্মিত হয়ে গেল, সাহেব নিজে হাত বাড়িয়ে গোপীবাবুর সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করলেন, তাঁকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। দু-চারজন যারা গোড়া থেকেই সাহেবের সঙ্গে আছে, স্কুলে স্বর্ণবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা দেখেছে, তারা মৃদুস্বরে গুঞ্জন ক'রে উঠল, স্বর্ণবাবুকে বসতেও বলে নাই, শেকহ্যাণ্ডও করে নাই।

সাহেব বললেন, ওয়েল গোপীচন্দ্রবাবু, তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

গোপীচন্দ্র একটু ভীত হলেন। বললেন, আমি তো কোন অপরাধ করি নাই হুজুরের কাছে!

না, আমার কর নাই, কিন্তু তুমি তোমার গ্রামের লোকের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করেছ। তাদের কাছে তোমার ত্রুটি রয়েছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর, আমি সামান্য ব্যক্তি। গ্রামের লোকের প্রতি আমার কর্তব্য আমি—

না, তুমি সামান্য ব্যক্তি নও। তুমিই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। তোমার মত লোক থাকতে গ্রামের স্কুলের অবস্থা এত খারাপ কেন?

গোপীচন্দ্রের মুখ এবার কঠিন হয়ে উঠল। তিনি সহসা উত্তর দিলেন না, যোগ্য উত্তর ভাবতে লাগলেন।

সাহেব বললেন, স্কুলে তুমি সাহায্য কর না কেন?

গোপীচন্দ্র তবু চুপ ক'রে রইলেন।

সাহেব বললেন, কেন? তোমাকে স্কুলে সাহায্য করতে হবে। স্কুলটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে হবে তোমাকে।

সম্পদ ও প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা হেতু প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্বর্ণবাবুদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সাহায্য দিতে অনিচ্ছা থাকলেও সে কথা ভদ্রতাসম্মত নয় ব'লেই হোক, অথবা তাঁর মনের সত্য অভিপ্রায়ই হোক, গোপীচন্দ্র এবার বললেন, একটা জীর্ণ এম. ই. স্কুলের উপর অর্থব্যয় করাটা আমার বেশ ভাল লাগে না হুজুর, আমার ইচ্ছা—এখানে আমি একটি সর্বাঙ্গসুন্দর হাই ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করি।

সাহেব হাত বাড়িয়ে গোপীচন্দ্রের হাত ধ'রে ঝাঁকি দিয়ে বললেন,

তোমার এই মহৎ সংকল্পের জন্য তোমাকে আমি অন্তর থেকে অভিনন্দিত করি গোপীচন্দ্রবাবু।

গোপীচন্দ্র বললেন, হুজুর আমায় মহৎ সম্মান করলেন। আমি সামান্য ব্যক্তি—

নো নো নো। তুমি এখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এর পর একটু হাসলেন, হেসে বললেন, দিজ পিপ্‌ল—আমি জানি গোপীবাবু, এরা তোমাকে এখনও মানতে চায় না। তোমার সঙ্গে বিরোধিতা করে। আই নো। এই হ'ল এদের চরিত্র। কিন্তু তোমাকে এ সব জয় করতে হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, সেই বিরোধিতার ভয়ই আমি করছি হুজুর। আমার ভয় হয়, এ কাজে এখানকার সকলে—বিশেষ ক'রে যাঁরা জমিদার, তাঁরা বাধা দেবেন।

সাহেব হাসলেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

তা হ'লে আমি নির্ভয়ে কাজ করতে পারি।

নির্ভয়ে কাজ কব তুমি, এবং আমি আগামী এক বৎসরের মধ্যে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই। ইউ সি। আর এক বৎসর আমি এ জেলায় আছি। আমি স্কুল ওপন করব।

কাল থেকে আমি কাজ আরম্ভ করব।

গুড। আশা করি, দু মাসের মধ্যেই আমি এখানে এসে ফাউণ্ডেশন স্টোন পত্তনেব আনন্দ লাভ করতে পারব।

নিশ্চয়ই হুজুর। এত বড় সৌভাগ্য আমার হবে, এ আমি কল্পনাও কবতে পারি নি কোনদিন।

সাহেব বললেন, এইটা তোমাদের ভুল ধারণা। সরকার তোমাদের সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। ভাল কাজের জন্যে পুবস্কৃত করতে পাবলে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন গভর্মেণ্ট। কীর্তিমানদের টাইটেল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়, সম্মানিত করা হয়, শাসনকার্যে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে থাকি আমরা। কিন্তু ইউ সি—এই বেঙ্গল আজ সুরেন ব্যানার্জি অ্যাণ্ড আরও কতকজন অ্যাজিটেটারের পাল্লায় প'ড়ে হুজুক করছে; দিস রটন বণ্ডেমাটরম্, বিলিতী কাপড় বন্‌ফায়ার, বয়কট—দিজ থিংস ভেরি ব্যাড—ভেরি ব্যাড।

গোপীচন্দ্র বললেন, না, সে সব আমাদের এখানে কিছু নাই।

সাহেব উঠলেন, বললেন, যাতে না থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা তোমাদের মত লোকের কর্তব্য। ছেলেদের লেখাপড়া শেখাও, সেণ্ড দেম টু ইংল্যাণ্ড ফর হায়ার এডুকেশন। দেখে আসুক ইংরেজ কত বড় জাত। কত বড়

তাদের কাল্‌চার। আচ্ছা গোপীবাবু, এখন আমি ডাকবাংলোয় যাচ্ছি। তুমি বিকেলে এসো ওখানে, আমি গ্রামের জমিদারদের সংবাদ দিয়েছি; তারা আসছে। আজই হাই স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করব।···ওয়েল, এ গাড়ি কার? বিউটিফুল পেয়ার অব হর্স! গাড়িও সুন্দর! আমি আশা করি, এ গাড়ি তোমার?

হ্যাঁ সার্‌।

গোপীচন্দ্রের জুড়ি এসে দাঁড়াল।

গোপীচন্দ্র সবিনয়ে বললেন, হুজুর, এই গাড়িতে ডাকবাংলো গেলে আমি খুশি হব।

সাহেব অগ্রসর হলেন গাড়ির দিকে। গোপীচন্দ্র তাড়াতাড়ি কাছারি-ঘরের ভিতরে ঢুকে একটি রেশমী ঢাকা ছোট একটি পাত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন। গাড়ির ভিতরে উপবিষ্ট সাহেবের সম্মুখে রুমালখানি তুলে ধ'রে বললেন, হুজুর আমার বাড়িতে এসেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। আপনার সম্মান—। যদি অনুগ্রহ ক'রে হুজুর এই সামান্য—। একখানি রূপার রেকাবির উপর একটি সোনার ঘড়ি। এবারই তিনি এটি কিনে এনেছিলেন নিজের ব্যবহারের জন্য। টাকা বা গিনি দেওয়াটা ঠিক হবে না, হয়তো সাহেব অন্য রকম ভাবতে পারেন—ভেবে এই ঘড়িটিই তিনি উপঢৌকনস্বরূপ রূপার রেকাবির উপর রেখে সাহেবের সামনে ধরলেন। সাহেব একটু হেসে রেকাবখানি সমেত টেনে নিয়ে গাড়িতে নিজের পাশে রাখলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে আলাপে আনন্দ পেলাম। অনেকদিন মনে থাকবে আমার। তুমি বিকেলে নিশ্চয় আসছ? আমি সমস্ত আজ পাকা করতে চাই। কোচম্যান, চালাও।

*　　*　　*　　*

সজ্ঞানে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মৃত্যুর পরে শিবত্ব-কামনায় কৃষ্ণ চাটুজ্জে কাশী যাত্রা করলেন ওই গাড়িতেই। সাহেবকে ডাকবাংলোয় নামিয়ে দিয়ে গাড়ি ফিরে এসে দাঁড়াল চাটুজ্জে মহাশয়ের দরজায়। বয়স্ক সমাজপতিদের সঙ্গে যাত্রাকালে চাটুজ্জের দেখা হ'ল না। সমাজপতিরা সকলেই জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সাহেব ডাকবাংলোয় দরবার করছেন—দারোগা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন সাহেবের অভিপ্রায়; তাঁরা সকলেই সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তের মধ্যে নাকি আছে, সরকারী কর্মচারী, সরকারী ফৌজ যখন যেখানে যাবে, তখন সেখানকার জমিদারেরা এই বন্দোবস্তের শর্তানুযায়ী তাঁদের তদ্বির-তদারক করবেন, রসদসংগ্রহে

সাহায্য করবেন, পুলিসকে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করবেন। এক পুরুষ আগেও—যাঁর জমিদারির সীমানায় খুন-ডাকাতি হ'ত, তাঁকে আংশিকভাবে জবাবদিহি করতে হ'ত। চৌকিদারদের জমি দিয়ে পোষণ করতে হ'ত। বর্তমানে পুলিস বিভাগের দায়িত্ব অনেকটা কমেছে, চৌকিদারী জমি সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিজে তার আয় গ্রহণ ক'রে চৌকিদারকে পুরা থানার আয়ত্তে এনেছেন। ফৌজও আজকাল যাতায়াত করে না, কিন্তু সাহেবরা যখন আসেন, তখন মুর্গী মাছ ডিম ঘি দুধ কলা, ক্ষেত্রবিশেষে মূলা বেগুন সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে হয়, ডাকবাংলোয় অথবা থানায় সেলাম দিতে যেতে হয়।

সাধারণ মানুষের অশ্রুসিক্ত চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে এক সকরুণ রহস্যের মতই বৃদ্ধ চাটুজ্জে চ'লে গেলেন। গাড়িখানা দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল। তারা চোখ মুছে ফিরল।

সূর্যাস্ত হয়ে গিয়েছে।

গ্রামখানি তখন আবার মুখর হইয়া উঠেছে অভিনব উত্তেজনায়। গ্রামে হাই ইংলিশ স্কুল হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাকবাংলোয় দরবার করছেন। গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকেরা সেখানে গিয়েছেন। হ্যাঁ, একটা মহৎ অভাব দূর হ'ল; গোপীচন্দ্র দীর্ঘজীবী হোন। ভগবান যাঁকে বড় করেছেন, তাঁর স্তবগান তো করবেই মানুষ। তাঁকে না মেনে উপায় কি?

গ্রামান্তরের মধ্যবিত্তেরা, চাষীরা, যারা এসেছিল পুণ্যবান কৃষ্ণ চাটুজ্জের দর্শনের আশায়, জীবনের-নশ্বরত্ব-হেতু-বৈরাগ্য-অভিভূত মন নিয়ে যারা ফিরে যাচ্ছিল, তারাও না দাঁড়িয়ে, এ আলোচনা না শুনে পারলে না। এ দলের মধ্যে ছিল এক ক্রোশ দূরের চাষী রংলাল পাল। সে বললে, গোপীবাবুর জয় হোক। আমাদের ছেলেগুলানের একটা 'রুপায়' হবে। ঘরের খেয়েই পাসটা তো হবে, মুরুখ্যু নামটা তো ঘুচবে।

রাধাকান্তবাবুদের পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের মধ্যেও এই আলোচনা চলছিল। রজনী বা রজন-ঠাকরুন এ পাড়ারই মেয়ে, স্বর্ণবাবুদের জ্ঞাতিকন্যা, সম্বন্ধে ভগ্নী। তিনিই ছিলেন মুখপাত্রী। তিনিই বলছিলেন, আমাদের স্বর্ণের দোষ আছে অনেক স্বীকার করি, তা ব'লে গোপীবাবুর ও কাজটা ভাল হ'ল না। একজনের কীর্তি নষ্ট ক'রে—না, এ আমি ভাল বলতে পারি না। স্বর্ণর বাপের নামে যে ইস্কুল রয়েছে, সেই ইস্কুলকেই বড় করলে হ'ত।

বরদা দেবীও অন্যতমা প্রবীণা এবং প্রধানা এ পাড়ার। তিনি বললেন, তা ভাই এ কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না।

কেন?

ধর, একজনা পুকুর প্রতিষ্ঠে করেছে, গাঁয়ের লোকে তার জল খায়। এখন সে পুকুরের জল আর কেউ খাবে না, তাঁর মাহাত্ম্যি নষ্ট হবে ব'লে আর কেউ তার চেয়ে ভাল পুকুর প্রতিষ্ঠে করতে পাবে না?

কিসের সঙ্গে কি? ইস্কুলে আর পুকুরে বরদাদিদি? নতুন পুকুর প্রতিষ্ঠে করলে, পুরনো পুকুরটা তো বুজে যায় না। জল থাক্, না থাক্, কীর্তিটা থাকে। আর এতে পুরনোটা যে উঠে যাবে!

বরদা হেসে বললেন, তা বোন, আমার যেমন বুদ্ধিতে কুলাল বললাম। এখন আমাদেব উপকার নিয়ে কথা। ছেলেপুলেরা ঘরের খেয়ে পড়বে।

হ্যাঁ। পড়বে—ইংরিজী প'ড়ে সাহেব হবে, মুর্গী খাবে। এর পর মেয়েরা ইংরিজীতে কথা বলবে—। হঠাৎ রজন-ঠাকরুন থামলেন। বললেন, দাঁড়াও। তারপর দুর্গাঘরেব বারান্দার দিকে উদ্দেশ ক'রে কাউকে ডাকলেন, কাশীর বউ, শোন।

কাশীর বউ, রাধাকান্তের স্ত্রী। কাশীতে বাপের বাড়ি, তাই লোকে কাশীর বউ ব'লে ডেকে থাকে। কাশীর বউ উত্তর দিলেন না, ধীরপদক্ষেপে এসে সামনে দাঁড়ালেন, যার অর্থ—বলুন। দীপ্তিময়ী মেয়ে, দেহবর্ণের উজ্জ্বলতায় একটা প্রখর প্রভা আছে। চোখ দুটি পিঙ্গল; মাথায় ছোট, মেয়েটির বয়স কুড়ির কাছাকাছি, কিন্তু দেখে মনে হয়, পনরো-ষোলর বেশি নয়। কিন্তু ওই পিঙ্গল চোখের তারায় এবং মুখের গঠনের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাতে তাঁকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না।

রজন-ঠাকরুন মেয়েটিকে বিশেষ ভাল চোখে দেখেন না। কাশী শহরের এই মেয়েটি এসে অবধি তাঁর সূচীবিদ্যার পারদর্শিতার গৌরব কিছু খর্ব হয়েছে। মেয়েটি সূচীবিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিনী। লেখাপড়াও নাকি ভাল জানেন। হাতের লেখাও নাকি রজন-ঠাকরুনের চেয়ে ভাল। রজন সে কথা বিশ্বাস করে না।

কাশীর বউ এবার বললেন, বলুন, কি বলছিলেন?

স্কুলের জন্যে মীটিং ডেকেছেন সাহেব। রাধাকান্ত নাকি তাতে যায় নাই?

কাশীর বউ শান্ত স্বরে জবাব দিলেন, আমি তো জানি নে ঠাকুরঝি।

রাধাকান্ত এ সব ভাল করছে না। গ্রামের লোকের সঙ্গে যা করে তাই করে, সাহেব—জেলার মালিক, তাঁদের সঙ্গে এ সব ভাল নয়। বারণ ক'রো।

একটু হেসে কাশীর বউ বললেন, বলব তাঁকে, আপনি বলেছেন ব'লেই বলব। তিনি অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে চ'লে গেলেন।

রঞ্জন-ঠাকরুন বললেন, সংসারে অহঙ্কারটা কখনও ভাল নয়।

রাত্রে রাধাকান্ত সন্ধ্যা শেষ ক'রে দিনলিপি লিখে থাকেন। বাপ উকিল ছিলেন, তাঁর টেবিলখানার উপরে বাবার শেষ চটিজুতা জোড়াটি একখানি মখমলের আসনের উপর সাজানো রয়েছে, নিত্য চন্দন দিয়ে, ফুল সাজিয়ে অর্চনা ক'রে থাকেন; এই টেবিলের উপর ব'সেই তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, দিনলিপি লেখেন।

দিনলিপি লিখছিলেন তিনি। কাশীর বউ এসে দাঁড়ালেন। কোলে তাঁর ঘুমন্ত শিশু। ছেলেটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

মুখ তুলে রাধাকান্ত বললেন, বল।

তুমি ইস্কুলের মীটিঙে যাও নি?

না।

অত্যন্ত মিষ্ট এবং কতকটা আবদারের সুরে বললেন, কেন?

একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত বললেন, ভাল লাগল না যেতে। কৃষ্ণ চাটুজ্জে সজ্ঞানে মৃত্যুকামনায় কাশী গেলেন, স্বেচ্ছায় সব ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। ইচ্ছা ছিল, গ্রামের বাইরে, পথের ধারে দাঁড়িয়ে কেমন মুখের ভাব নিয়ে তিনি যান, সেইটুকু দেখব। দেখলাম, নিঃশব্দে চোখ বুজে গেলেন তিনি, দুটি জলের ধারা শুধু গড়িয়ে পড়ছে। দেখে বাগানেই ব'সে রইলাম সারাক্ষণ। মীটিঙে আর যেতে ইচ্ছে হ'ল না। তারপর একটু হেসে বললেন, কেন বল তো? গেলে তুমি খুশী হতে?

কাশীর বউ বললেন, দেশের কাজ ভাল কাজ, তাতে তুমি যাবে না, থাকবে না, এ কি ভাল লাগে আমার?

রাধাকান্ত উঠে ঘুমন্ত ছেলের মুখে চুমু খেলেন। বললেন, সে গৌরব বাড়াবে খোকা। তারপর গাঢ়স্বরে বললেন, গোপীচন্দ্র দেশের কল্যাণ করলেন। ভগবান তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন। এ গ্রামের এ দেশের আরও উপকার তাঁর দ্বারা হোক। স্কুল হচ্ছে, হাজার হাজার ছেলে লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু তাঁর এ নামের কাঙালপনা ভাল লাগল না। তিনি স্বর্গের বাপের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল উঠিয়ে নিজের নামে স্কুল করছেন। নিজের বাপের নামেও করলে পারতেন।

কাশীর বউ বললেন, তবু তোমার এ কাজ ভাল হয় নি। নাম যার হোক, কাজটা যে ভাল। দেশের কত বড় সুপ্রভাত আজ বল তো?

রাধাকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আমরা অস্তমিত হলাম। গোপীচন্দ্র উদিত হলেন। একটা দিন গিয়ে আর একদিন এল। তবে সুপ্রভাত এটা ঠিক। কিন্তু যে ডোবে সে থাকে পশ্চিমে, আর যে ওঠে সে থাকে পূর্বে, এমন ক্ষণে দুজনে কি ক'রে মেলে বল তো?

কাশীর বউ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, রাগ করলে তুমি?

রাগ? একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত মৃদু হেসে বললেন, না।

তিন

গ্রামখানির দিকে দিকে বার্তা র'টে গেল, বড় ইংরেজী ইস্কুল হবে। কৃষ্ণ চাটুজ্জের সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা দেখবার জন্য যারা এসেছিল, তারাই সংবাদটা বহন ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। চাটুজ্জের এই কাশীযাত্রা দেখে মনের মধ্যে শ্মশান-বৈরাগ্যের যে স্পর্শ তারা অনুভব করেছিল, সে অনুভূতি শরতের মেঘের মত স্বল্প কিছুক্ষণের জন্য ছায়ার বিষণ্ণতা বিস্তার ক'রেই মিলিয়ে গেল; মানুষের মন এই সংবাদটির আলোকে উত্তাপে প্রসন্ন উষ্ণ হয়ে উঠল।

বর্ষা শেষ হয়েছে। একটা ঋতুর অন্তে নব ঋতুর প্রারম্ভ। চাটুজ্জেই যেন চ'লে গেলেন এখানকার বর্ষাঋতুর শেষ মেঘসঞ্চারের মত। এই স্থানটির জীবন-নাট্যে একটি অঙ্কের শেষ হয়েছে। পরবর্তী অঙ্ক আরম্ভের সূচনা হচ্ছে।

এককালে মুসলমান জমিদারেরা গিয়েছেন। তারপর গিয়েছেন গন্ধ-বণিকেরা। তারপর উঠেছিলেন সরকার-বংশীয়েরা। পতনমুখে তাঁদের অতিক্রম ক'রে উঠেছিলেন তাঁদের বাড়ির দৌহিত্রেরা—স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্ত, রাধাকান্ত এবং আরও কয়েকজন। অকস্মাৎ তাঁদের সকলকে অস্তমিত ক'রে দিয়ে উদিত হচ্ছেন গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের বাপ এখানে আগন্তুক মাত্র। স্বর্ণবাবুদের জ্ঞাতি, তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রেই, এখানে এসে বাস করেছিলেন অনুগৃহীতরূপে। গোপীচন্দ্র ভাগ্যফলে সায়েবদের কয়লাকুঠীতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে মুন্সীর কাজ করতে গিয়ে লক্ষপতি হয়েছেন। কিন্তু তাতেও

এখানকার আকাশে অধিষ্ঠিত হবার স্থান লাভ করতে পারেন নাই। আজ বিধাতার দূতের মত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে তাঁকে হাত ধ'রে সকলের মধ্যস্থলে স্থান দিলেন। নবোদিত গোপীচন্দ্রের প্রথম রশ্মির মত নবগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়। মানুষেরা কলরব ক'রে উঠল ভোরের পাখির মত।

রাধাকান্ত, তাঁর দাদা শ্যামাকান্ত এঁরা বিমর্ষ হয়েছিলেন। রাধাকান্ত তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, আমরা অস্তমিত হলাম। কথাটার মধ্যে বেদনা ছিল। থাকা স্বাভাবিক। তাঁর জ্যেঠতুত দাদা শ্যামাকান্ত বিচিত্র ধরনের মানুষ। গোপীচন্দ্রের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত এ গ্রামে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা সম্পত্তিশালী এবং অর্থশালী ব্যক্তি। কিন্তু স্বভাবে তিনি অতি-মাত্রায় কৃপণ এবং প্রকৃতিতে অত্যন্ত ভীরু ব'লে প্রতিষ্ঠায় কখনও প্রাধান্য লাভ করতে পারেন নাই। সেই কারণে যারাই গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য কোন কাজ বা কীর্তি করে, তাদেরই তিনি গালাগাল করেন। সহজ অবস্থায় নয়, অল্প কিছু মদ্যপান ক'রে চক্ষুলজ্জা ঘুচিয়ে ইংরেজীতে গালাগাল ক'রে থাকেন। গৌরবর্ণ ছোটখাটো মানুষ। নিজের বাড়িতে সকলকে গালাগাল দিয়ে আসেন, আর বাইরে নিজের কর্মচারীদের সঙ্গে ব'সে অপরের সম্পত্তির অসারতা এবং তাঁদের ঋণের পরিমাণের কথার আলোচনা করেন। একমাত্র পুত্র সেও অহরহ মদ্যপান করে। শ্যামাকান্তের পাশের ঘরেই ব'সে সে মদ্যপান করে। শ্যামাকান্ত ব'সে নিরুপায়ের মত দেখেন। কুলধর্মে তাঁরা তান্ত্রিক, তিনি নিজেও মদ্যপান করেন, সুতরাং মদ্যপানটা দোষের নয়। তিনি নিজেই বলেন, ফার্স্ট গ্লাস ফর থার্স্ট, সেকেণ্ড গ্লাস ফর হেল্‌থ, থার্ড ফর প্লেসার, ফোর্থ ফর ম্যাড্‌নেস। শ্যামাকান্ত খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারেন; সেক্সপীয়র মিল্টন তিনি পড়েন নি, কিন্তু বাল্যকালে তাঁর বাপের কর্মজীবনে তিনি সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারই ফলে তাদের ভাষাটা তিনি প্রায় মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত করেছিলেন। চিন্তা প্রবল হ'লে নিজে দু পাত্র মদ্যপান ক'রে দুনিয়াকে গালাগাল দিতে শুরু করেন—বাংলা এবং ইংরেজী দুই ভাষাতেই গালাগালি। তিনি মদ্যপান ক'রে গোপীচন্দ্রকে গালাগালি করছিলেন, সন অব এ বেগার। এ থিফ। হি ইজ এ থিফ। চোর চোর। গোপে চোর।

ঈর্ষাকাতর শ্যামাকান্ত আপন মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন আপনার বৈঠক-খানা এবং কাছারিবাড়ির সামনের চত্বরে। রাধাকান্ত আপনার অন্দর-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন; শ্যামাকান্তের বৈঠকখানার পাশেই তাঁর বৈঠকখানা;

সেইখানেই যাচ্ছিলেন তিনি। শ্যামাকান্তকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, দাদা অপ্রকৃতিস্থ। রাধাকান্ত দাঁড়ালেন। বললেন, ঘরের ভিতরে গিয়ে ব'স দাদা।

শ্যামাকান্ত বললেন, আই অ্যাম অ্যাফ্রেড অব নান, নর ডু আই কেয়ার ফর এনিবডি। হি ইজ এ থিফ।

দাদার প্রকৃতি রাধাকান্ত জানেন, এখন এই মুহূর্তে তাঁকে বাধা না দিলে তিনি আরও দু-এক পাত্র মদ্যপান ক'রে পথে বেরিয়ে পড়বেন এবং রাস্তায় গালাগালি দিয়ে ঘুরবেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁদের নাতিসম্পর্কীয় অনেকে আছে, তারা তাঁকে নিয়ে কৌতুক আরম্ভ করবে। পিছন থেকে তারা তাঁর কাছা খুলে দেবে, শ্যামাকান্ত কাছাটা টেনে আবার গুঁজবেন এবং গাল দেবেন, শাল্লু। তারপর আরম্ভ করবেন ইংরেজীতে গালাগাল; আরও বারকতক কাছা খুলে দেবার পর, তিনি আর কাছা গুঁজবেন না, উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় অশ্লীল গালাগালি দিতে আরম্ভ করবেন। লোকে অবশ্য বলে, শ্যামাকান্তবাবুর গালাগাল হোক অশ্লীল, তবু শুনতে ভাল লাগে। রাধাকান্ত জানেন, ভাল লাগে না, তারা কৌতুক অনুভব করে। এই কৌতুকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অপমান রাধাকান্ত মর্মান্তিকভাবে অনুভব করেন, কিন্তু শ্যামাকান্ত তা অনুভবও করেন না, গ্রাহ্যও করেন না। পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠা এবং সঞ্চিত সম্পদের সম্মান তাঁর মর্যাদাকে রক্ষা করছে—এ কথা তিনি জানেন। রাধাকান্ত বললেন, যা বলছি শোন, যাও, ঘরের ভেতরে যাও।

ছোট হ'লেও শ্যামাকান্ত ভয় করেন রাধাকান্তকে; রাধাকান্তের সাহসকে ভয় করেন, তাঁর দৃঢ়তা এবং ধীরতাকে সম্ভ্রম না ক'রে উপায় নাই। দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত রাধাকান্তের এই কথা কয়েকটিতে তিনি এবার একটু দ'মে গেলেন।

রাধাকান্ত বললেন, যাও, ঘরের ভেতর যাও।

অকস্মাৎ শ্যামাকান্ত বার বার ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে ব'লে উঠলেন, নো নো নো। তারপর আরম্ভ করলেন, আমি মা রাজার ছেলে, প্রণাম নাহি জানি। কারও হুকুম আমি মানি না। কথাটা শেষ করলেন উর্দুতে—ময় নেহি যাউঙ্গা।

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, তবে মদ খেয়ে একজন মানী লোককে গালাগাল করবে?

গালাগাল? শ্যামাকান্ত কণ্ঠস্বর উচ্চ ক'রে এবার আরম্ভ করলেন, হিঁ

ইজ এ থিফ। ইট ইজ ট্রুথ। ট্রুথ ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ক্যান নেভার বি অ্যান অ্যাবিউজ। গোপে ইজ এ থিফ।

রাধাকান্ত এবার কঠোর স্বরে বললেন, না। ও কথা সত্য নয়। যাও, ঘরের মধ্যে ব'সে যাকে যা ইচ্ছে তাই বল গিয়ে। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, ছি ছি ছি! জ্যাঠামশায়, বাবা—এঁরা কত বড় লোক ছিলেন, পুণ্যকর্ম তাঁরা ক'রে গিয়েছেন। তাঁদের অযোগ্য সন্তান আমরা। তাঁদের কীর্তিকে আমরা উজ্জ্বল করতে না পারি, তাকে ম্লান করলে আমাদের যে নরকেও স্থান হবে না। সে কথাটাও একবার মনে হয় না তোমার?

শ্যামাকান্ত আর বাইরে থাকতে সাহস করলেন না, তিনি আপনার ঘরের মধ্যে গিয়ে তক্তাপোশের উপর বিছানো ফরাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে ব'সে আপন মনেই বলতে আরম্ভ করলেন, হি ইজ টেরিব্‌ল এ ডিস্‌ওবিডিয়েন্ট টেরিব্‌ল ব্রাদার। বাট—বাট—। একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, বাট ট্রুথ ইজ ট্রুথ, হি—ছাট গোপে, গোপে ইজ এ থিফ।

রাধাকান্ত এসে আপনার বৈঠকখানায় বসলেন।

রাধাকান্তের বৈঠকখানাটি অতি চমৎকার; লম্বা ধরনের বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি, মাঝখানে একখানি বড় হল, দু পাশে দুটি ঘর, ঘর দুখানিও বেশ বড়; তিন দিকে বারান্দা, হলের সম্মুখের বারান্দার কোলেই ছোট একটি ফুলবাগান, তারপর তাঁর খামার-বাড়ি। হলের ভিতরেই রাধাকান্তের বৈঠকখানা। আসবাবপত্র খুব বেশি নয়, দু পাশে দুখানি প্রশস্ত তক্তাপোশের দুটি ফরাশ, তক্তাপোশ দুখানির মাঝখানে একখানি টেবিল, টেবিলের দু পাশে তিনখানি চেয়ার। তক্তাপোশ দুখানির দু পাশে দেওয়ালের গায়ে দুখানি বেঞ্চ। টেবিলে ব'সে তিনি চিঠিপত্র লেখেন, আর লেখেন তাঁর দৈনিক জীবনবৃত্তান্ত। পড়ার সময় তিনি তক্তাপোশেই বসেন। কিছু গ্রন্থসংগ্রহ তাঁর আছে। পুরাণ-সংহিতার সংগ্রহই বেশি। বাংলা সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী এবং তন্ত্রের অনেক বই। কয়েকখানি সাময়িক পত্রিকারও গ্রাহক তিনি; সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও একখানি আসে। কিছু উপন্যাসও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, চণ্ডীচরণ সেন তাঁর প্রিয় লেখক।

রাধাকান্ত নিজের দিনলিপি খুলে বসলেন। লিখলেন: গোপীচন্দ্র এখানে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সংকল্প করিয়াছেন। গতকল্য অপরাহ্ণে জেলার মহামান্য রাজপ্রতিনিধি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের

উপস্থিতিতে সবই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। গোপীচন্দ্র অবশ্যই পুণ্যকর্ম করিতেছেন। তিনি প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াও এতাবৎ কাল পর্যন্ত অত্র গ্রামে সর্বপ্রধান ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। এই পুণ্যকর্মের ফলে সেই প্রতিষ্ঠা তাঁহার অবশ্যম্ভাবী। তাহার সূচনা করিয়া দিয়া গেলেন স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি। তিনি গোপীচন্দ্রের সহিত করমর্দন করিয়াছেন, যাহা এ পর্যন্ত এ গ্রামের আর কোন জমিদার বা ধনী লাভ করেন নাই। গতকল্য হইতেই আমি চিন্তা কবিতেছি, আমাদের ভবিষ্যতের কথা। মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া আছে। কিন্তু অদ্য এই মাত্র দাদাব কীর্তি দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি মদ খাইয়া গোপীচন্দ্রকে গালাগালি করিতেছেন। তাঁহাকে বহুকষ্টে ঘরের মধ্যে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছি। উচ্চ শব্দে আহ্বান এবং উগ্র হিংসায় পরনিন্দা, ভদ্রতাবিগর্হিত শাস্ত্রবহির্ভূত; ইহা অধীবতার লক্ষণ, ইহা পাপ। শুধু উচ্চারণেই পাপ নয়, শ্রবণেও পাপ। অসৎপ্রলাপরূপ তিক্তরসে-দূষিত রসনার মতই এই রস-দূষিত কর্ণেবও একমাত্র শরণ, একমাত্র পরমামৃত রসায়ন ভগবৎনাম কীর্তন, ভগবৎমহিমা স্মরণ। হে প্রভো, মঙ্গলময় মহেশ্বর, তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বাইরের বাবান্দায় জুতোর শব্দ উঠল। রাধাকান্তের কতকগুলি অনুভূতি বড় তীব্র; পায়ের শব্দে তিনি পরিচিত আগন্তুককে চিনতে পারেন। চটি টানাব শব্দে তিনি বুঝলেন স্বর্ণবাবু আসছেন। তিনি কলম রাখলেন। স্বর্ণবাবু দবজাব সামনে আসতেই সাদবে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, এস।

হেসে স্বর্ণবাবু বললেন, এলাম।

চাণক্য পণ্ডিতের কৌটিল্যনীতি অনুযায়ী নয়, এই যুগের অভিজাত সভ্যতার শিক্ষায় স্বর্ণবাবুর মনের ভাব মুখে প্রকাশ পায় না। হাস্যমুখেই স্বর্ণবাবু এসে বসলেন।

রাধাকান্ত চাকরকে ডাকলেন, ওরে বিষ্টু, তামাক দে।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, শ্যামাকান্তদাকে কি বলছিলে? কতক কানে এল, কতক এল না। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনলাম। দাদা মদ খেয়েছেন বুঝি?

রাধাকান্ত হাসলেন, বললেন, তবে তো সবই শুনেছ।

কাকে গালাগালি করছেন আজ? আমাকে?

রাধাকান্ত স্বর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, তোমাকে নয়, সে

তুমি জান মনে হচ্ছে। তা হ'লে মুখখানা তোমার অন্যরকম হ'ত। অত্যন্ত আমি ধরতে পারতাম।

স্বর্ণবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন, বললেন, আমার উপর অবিচার করছ তুমি। শ্যামাকান্তদার গালাগালি আমার গায়ে লাগে না, ভাল লাগে। বিশেষ ক'রে যখন অশ্লীল গালাগালি করেন। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, গোপীচন্দ্রকে গালাগাল করছিলেন বুঝি?

চাকর বিষ্টুচরণ এসে গড়গড়ার মাথায় কল্কে বসিয়ে নলটি স্বর্ণবাবুর সামনে তুলে ধরলে। স্বর্ণবাবু নলটি হাতে নিয়ে মৃদু একটি টান দিয়ে বললেন, এ ব্যাটার হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হয়। যেমন ব্যাটা চা তৈরি করে, তেমনই তামাক সাজে—টানতে এতটুকু জোর লাগে না, তেমনই ব্যাটা কাপড় কোঁচায়।

বিষ্টুচরণ স্মিতমুখে স্বর্ণবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্বর্ণবাবু আবার একটি টান দিয়ে বললেন, তামাকটা বোধ হয় কাষ্ঠগড়ার, না?

হ্যাঁ।

আবার একটি টান দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, দাদা কি এমন গালাগাল দিচ্ছিলেন গোপীচন্দ্রকে যে, তুমি তাঁকে—। স্বর্ণবাবু হাসলেন, তারপর হেসে বললেন, মনে হ'ল, যেন ধমক দিচ্ছিলে তুমি।

রাধাকান্তও হাসলেন এবার, বললেন, তুমি বলছিলে—কতক তোমার কানে যায় নি। না গেলেও, সবই তুমি সঠিক অনুমানে বুঝে নিয়েছ। সুতরাং ও কথার বেশি আলোচনা ক'রে লাভ কি?

স্বর্ণবাবু নলটি এগিয়ে রাধাকান্তের হাতে দিলেন, নাও, খাও। তারপর একটু এগিয়ে এসে বললেন, চোরকে যদি কেউ চোর বলে, তবে সেটা কি গালাগালি? প্রশ্নটা ক'রে তিনি রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, বল, আমার কথার জবাব দাও।

রাধাকান্তবাবু বললেন, স্বর্ণ, ও আলোচনা থাক্।

স্বর্ণবাবু আরও একটু এগিয়ে এসে বললেন, গোপীচন্দ্র তার প্রথম কয়লার কুঠী মনিব সাহেব কোম্পানির নামে ডাকতে গিয়ে, ওই মনিব-কোম্পানির টাকায় বেনাম ক'রে ডাকে নি?

রাধাকান্ত কোন উত্তর দিলেন না।

স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, এটা চুরি নয়?

রাধাকান্ত বললেন, না, চুরি নয়।

চুরি নয়?

চুরি করলে বলতে হয়, গোপীচন্দ্র চুরি করেছিলেন কোম্পানির টাকা। কয়লার কুঠীটা নয়। কারণ ওটা সাহেবদের সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু যে জিনিস মানুষ চুরি করে, তা চোর ফেরত দেয় না। গোপীচন্দ্র সাহেবদের টাকা তো পাই-পয়সা ফেরত দিয়েছেন।

স্বর্ণবাবু হেসে বললেন, উকিল হ'লে তুমি খুব বড় উকিল হতে রাধাকান্তদা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রাধাকান্ত। বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, "কারও দোষ নয়কো গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।" বাল্যকাল হেলায় হারিয়েছি, তার ফলে আজ বংশগত প্রতিষ্ঠা হারাতে বসেছি। অপরকে তার জন্য দোষ দিয়ে কি হবে, সেই জন্যই দাদাকে যে সক্ষম, যে কৃতী, তাকে গালাগাল করতে বারণ করছিলাম।

স্বর্ণবাবু হাত বাড়িয়ে নলটা নিলেন, দাও, তামাকটা মজেছে ভাল। তামাক টানতে টানতে তিনি অস্বীকারের ভঙ্গীতে বার বার মাথা নাড়লেন।

রাধাকান্ত বললেন, এ কথা তুমি অস্বীকার করছ? 'না' বলছ?

স্বর্ণবাবু নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন, তুমি বাল্যকাল হেলায় হারিয়েছ, আমিও হারিয়েছি, ও কথার আমি 'না' বলছি না। কিন্তু গোপীচন্দ্রও কিছু বিদ্যালাভ ক'রে অর্থ উপার্জন করে নি। চুরি না বল, প্রবঞ্চনা তো বলতেই হবে। প্রবঞ্চনার অর্থ লাভ ক'রে অর্থের জোরে আজ সে গ্রামের মাথায় বসতে চাইছে। সে আমি হ'তে দোব না—কিছুতেই না। আমার সূচ্যগ্র মেদিনী থাকতে না।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

স্বর্ণবাবু হাসলেন, বললেন, আমরা এককালে শখের যাত্রার দল খুলেছিলাম। তুমি সাজতে যুধিষ্ঠির, আমি সাজতাম দুর্যোধন। উর্বশী-উদ্ধার পালায়, পাণ্ডব কৌরব এক হয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে?

রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মাইনর-ইস্কুলকে হাই-ইস্কুল করবে?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্বর্ণবাবু বললেন, সে একটা আকাশকুসুম রাধাকান্তদা, এত টাকা কোথায় আমার? তোমারও টাকা নাই। টাকা আছে শ্যামাকান্তদার, সে তিনি খরচ করবেন না।

তবে?

গোপীচন্দ্রের সব কাজে আমরা বাধা দোব।

একটু চুপ ক'রে থেকে রাধাকান্ত বললেন, দেখ স্বর্ণ, তোমাকে ভালবাসি, তুমি বন্ধুলোক, তাই বলছি—। তিনি চুপ করলেন।

স্বর্ণবাবু বললেন, তুমি ভয় পাচ্ছ?

ভয় নয় স্বর্ণ। শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ছে। শাস্ত্রে বলে, গৃহের ভূষণ পুত্র, সভার ভূষণ পণ্ডিত, পুরুষের ভূষণ সদ্‌বুদ্ধি, রমণীর ভূষণ লজ্জা। গোপীচন্দ্রের সব কাজে বাধা দিতে চাও বলছ, তার মানে সৎ-অসৎ সব কাজেই বাধা দিতে চাও। সৎকার্যে বাধা দেওয়া কখনও সদ্‌বুদ্ধির নয়।

স্বর্ণবাবু বললেন, কোন্ শাস্ত্র আওড়াচ্ছ জানি না। কিন্তু সদ্‌বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ ভূষণ হ'ল পুরুষের বীর্য।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, বীর্য ভূষণ নয়, বীর্যই হ'ল পৌরুষের প্রাণ। বীর্যহীন পৌরুষ হয় না, হ'লে তার নাম হয় ক্লীবত্ব।

তবে? স্বর্ণবাবুব দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাধাকান্ত বললেন, সৎকার্যের বিরোধিতা করে যে বীর্য, সে হ'ল অসুর বীর্য। তার—

স্বর্ণবাবু অকস্মাৎ উঠে দাঁড়ালেন। রাধাকান্তের কথার মাঝখানেই বললেন, উঠলাম।

রাধাকান্ত বলেন, ব'স ব'স।

না। কাজ মনে প'ড়ে গেল। স্বর্ণবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দরজার একপাশে এসে কিন্তু থমকে ঘুরে দাঁড়ালেন। শ্লেষের সঙ্গেই বললেন, তা হ'লে সুরশক্তির সঙ্গেই যোগ দেবে ঠিক করেছ?

রাধাকান্ত বললেন, না।

অর্থাৎ?

রাধাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন, অর্থ জটিল নয়, তবু পরিষ্কার ক'রে বলি। তুমি বিরোধ করতে না চাইলে, তোমার সঙ্গে আমি বিরোধ করব না। গোপীচন্দ্র আমার সঙ্গে বিরোধ করতে চাইলে, তাতেও আমি পশ্চাৎপদ হব না।

যথেষ্ট, যথেষ্ট। এই আমার পথে যথেষ্ট রাধাকান্তদা। আচ্ছা। কথা শেষ ক'রে স্বর্ণবাবু বেরিয়ে গেলেন। রাধাকান্ত দাঁড়িয়েই রইলেন।

রাধাকান্তদা! আবার ফিরলেন স্বর্ণবাবু। এই দেখ, যার জন্য আসা, তাই ভুলে গিয়েছি।

রাধাকান্ত বললেন, তাই তো বলছিলাম স্বর্ণ, তুমি অত্যন্ত অধীর হয়ে

উঠেছ। ধীরতাই হ'ল মানুষের সু-বুদ্ধি। যা সুন্দর তাই শিব, সুতরাং তাই সৎ।

রাধাকান্তের এসব কথার কোন জবাব দিলেন না স্বর্ণবাবু, বললেন, এসেছিলাম একটি জিনিস চাইতে, ভিক্ষা বল—ভিক্ষা।

রাধাকান্ত হাসলেন, বস্তুটা কি ?

আগে বল দেবে ?

রাধাকান্ত একটু ভেবে বললেন, বস্তু হ'লে যা অদেয় নয়, তা দোব। কিন্তু কোন প্রতিশ্রুতি হ'লে না ভেবে দিতে পারব না।

স্বর্ণবাবু বললেন, বস্তুও বটে, দেয়ও বটে।

বল।

মানিকচকের জোলে, আমার জমির পাশে গোপথের গায়ে তোমার দু টুকরো জমি আছে ; দু টুকরো আমাকে দিয়ে আমার অন্য জায়গার জমি তুমি নাও।

কেন বল তো ?

বলব। আগে দেবে বল।

সে তো আগেই বলেছি।

উঁহুঁ, ত্রিসত্য কর।

আচ্ছা তাই। হাসলেন রাধাকান্ত, বললেন, দিলাম দিলাম দিলাম।

স্বর্ণবাবু বললেন, তা হ'লে শোন। গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকে যেখানে ইস্কুল হবে, সেখানে যাবার সোজা পথ হ'ল ওই গোপথ। গোপীচন্দ্র ইস্কুলের পাশেই আস্তাবল করছে। গাড়ি ঘোড়া আনবার জন্যে ওই গোপথকে বাড়িয়ে বড় রাস্তা করতে চায়। তাই গোপথের দু পাশের জমি আমার চাই। ও পথ বড় ক'রে গাড়ি আনতে আমি দোব না। তা ছাড়া, 'লড়িয়া' ব'লে মজা পুকুরটাও নাকি কাটাবে। সিচ নিয়ে আমি মামলা করব। সিচ বন্ধ করতে আমি দোব না।

রাধাকান্তের মুখ থমথমে হয়ে উঠল, বললেন, আমি তোমাকে বলেছি স্বর্ণ, গোপীচন্দ্র বিরোধ করতে চাইলে পেছুব না। তুমি কি আমাকে অক্ষম মনে কর ?

স্বর্ণবাবু বললেন, না, তা নয়। ওখানে আমার জমি অনেকখানি, তোমার মাত্র ওই দুই টুকরো। আমার পোষাবে, তোমার পোষাবে না। তা ছাড়া গোপীচন্দ্র বিনয় ক'রে চাইলেই বা তুমি 'না' বলবে কি ক'রে ? প্রশস্ত সুগম রাস্তা করাটা তো ভাল কাজ। ভাল কাজে তো তুমি বাধা

দেবে না, নিজেই বলেছ। স্বর্ণবাবু হাসতে লাগলেন। তিনি সত্যই পুলকিত হয়েছেন এবার। শুধু তাঁর একটা কার্যোদ্ধার হয়েছেই নয়, বাক্-চাতুর্যে এবং বুদ্ধিকৌশলে তিনি রাধাকান্তকে পরাস্ত করেছেন। এর মধ্যে বেশ একটি মানস-বিলাস আছে—আত্মগৌরব এবং জয়ের তৃপ্তিতে মন ভ'রে ওঠে। হাসতে হাসতেই স্বর্ণবাবু চ'লে গেলেন।

রাধাকান্তও হাসলেন। এক্ষেত্রে তাঁর আঘাত বা পরাজয়টা বেদনা-দায়ক নয়। তাঁর আভিজাত্যের অহঙ্কার, স্বর্ণবাবুর সঙ্গে একমত; তাঁর জৈবপ্রবৃত্তি-সুলভ ঈর্ষা স্বর্ণবাবুর মতই ক্ষুব্ধ; কিন্তু এ ছাড়াও তাঁর জীবনে আরও কিছু সম্পদ আছে, যার তৃপ্তিতে অহঙ্কার নম্র হয়েছে, অন্তঃসলিলা হতে বাধ্য হয়েছে। হাসির মধ্যেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। সে দীর্ঘশ্বাস স্বর্ণবাবুর জন্যও হতে পারে, আবার তাঁর অন্তঃসলিলা ক্ষোভের অজ্ঞাত অবাধ্য স্ফুরণও হতে পারে; হয়তো দুইই হতে পারে।

চার

দুপুরবেলা এবং সন্ধ্যাবেলা রাধাকান্তের অন্দরে একটি ছোটখাটো মজলিস বসে। রাধাকান্তের স্ত্রীর নাম কিরণবালা; সে নামটা কিন্তু চাপা প'ড়ে গিয়েছে, কিরণবালা নামটা পাড়ার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ জানে, সাধারণ্যে তিনি কাশীর বউ নামেই পরিচিত। কাশীর বউ ভাল লেখাপড়া জানেন, সেলাইয়ের কাজেও তাঁর হাত অতি চমৎকার। পাড়ার তরুণী মেয়েদের অনেকে তাঁর কাছে দুপুরে আসে চিঠি পড়াতে, চিঠি লেখাতে, এবং সংসারজীবনের সমস্যায় উপদেশ নিতে। নিজেদের দুঃখের কথাও তাঁকে জানিয়ে তারা তৃপ্তি পায়, যেহেতু এই বুদ্ধিমতী মিষ্টভাষিণী মেয়েটি কথার মধ্যে দরদ মিশিয়ে সান্ত্বনা দিলে সত্যই যেন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা-বেলায় মজলিসে তিনি কোনদিন বই পড়েন, কোনদিন গল্প বলেন। রাধাকান্তের নিজের ধর্মশাস্ত্রে অনুরাগ আছে, উপন্যাসও পড়েন; শুধু তাই নয়, বইও তিনি মধ্যে মধ্যে কেনেন। কাশীর বউ তাঁর বইগুলির যত্ন করেন, ঝাড়েন-মোছেন, সদ্ব্যবহারও করেন। রাধাকান্তও এতে আনন্দ পান। এর পূর্বকালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ছিল না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাকে সমাজ সুচক্ষে দেখত না। অনেক বাড়ির

সংস্কার এমনও ছিল যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের অকালবৈধব্য ঘটে ব'লে বিশ্বাস করত। সে যুগটা পার হয়ে আসছে। কলকাতায় স্ত্রী-শিক্ষার আন্দোলন পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য শহরেও সে আন্দোলন ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করছে, তারই ঢেউ ক্রমশ পল্লীতেও এসে লেগেছে, বিশেষ ক'রে নবগ্রামের মত গ্রামে। আশেপাশে প্রায় আশি-একশোখানি গ্রামের কেন্দ্রস্থল নবগ্রাম। তাই বিয়ের সম্বন্ধের সময়, ভাবী বধূ লেখাপড়া জানে জেনে, রাধাকান্তের উকিল পিতা এবং রাধাকান্ত নিজেও খুশি হয়েছিলেন। কখনও কখনও রাত্রে কাশীর বউ বই প'ড়ে শোনান তাঁকে। শুনতে শুনতে রাধাকান্ত মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে ধন্যবাদ দেন পত্নীভাগ্যের জন্য।

আজ সন্ধ্যার মজলিসে কাশীর বউ গল্প বলছিলেন। গল্পের মজলিসের প্রধান শ্রোতা তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে গৌরীকান্ত এবং গৌরীকান্তের খেলার সাথী চারু। রাধাকান্তের নিকট-আত্মীয় সম্পর্কে এক ভাইপোর মেয়ে চারু। চারুর বাপ রাধাকান্তের সমবয়সী, বন্ধু এবং অনুগত জনও বটে। ভদ্রলোক বিদেশে থাকেন, সেখানে এম. ই. ইস্কুলে মাস্টারি এবং সেখানকার এক্সপেরিমেণ্টাল পোস্ট-আপিসে পোস্টমাস্টারি—দুটো চাকরি করেন। চারুর মাও কাশীর বউয়ের অনুরক্ত ভক্ত। চারু গৌরীকান্তের চেয়ে এক বছরের বড়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসার—ভাশুর, দেওর, জা নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার, চারুর মায়ের কাজ অনেক। পালা ক'রে কাজ করতে হয়, কোনদিন পড়ে বাসন-মাজা ঝাঁট-দেওয়া এঁটোকাঁটা-পরিষ্কার এই সবের কাজ, কোনদিন পড়ে বাটনা-বাটা কুটনো-কোটা জল-তোলার কাজ। বিলেতেও ঘরের কাজে রবিবার নাই, এখানে তো নাই-ই। চারুর মা গৌরীকান্তের সঙ্গে খেলা করবার জন্যে মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে যায়। গৌরীকান্ত হুকুম করে, চারু শোনে, না শুনলে গৌরীকান্ত তাকে পিট্টি লাগায়। কাশীর বউয়ের চোখে পড়লে তিনি ছেলের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, গৌরীকান্ত তখন চারুকে আদর ক'রে ডাকে। চারু মায়ের একমাত্র সন্তান, তার উপর সাধারণত বাঙালীর মেয়ের যে বয়সে সন্তান হয়, সেই বিচারে চারুর মায়ের একটু বেশি বয়সেই চারু মায়ের কোলে এসেছে, তাই সে বেশ একটু আদরিণী মেয়ে এবং স্বাস্থ্যও তার ভাল। মারধোরের পর গৌরী তাকে আদর ক'রে ডাকলে সে বিদ্রোহিনীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু যখন সে দেখে, গৌরীকান্তের মায়ের চোখে শাসনের দৃষ্টি রূঢ় থেকে রূঢ়তর হয়ে উঠছে, তখন সে হাসিমুখে

গৌরীকান্তের কাছে এগিয়ে এসে বলে, না ভাই, আর আমি দুষ্টুমি করব না।

মধ্যে মধ্যে গৌরীকান্ত যায় বাপের কাছে বৈঠকখানায়। রাধাকান্ত পুত্রের সম্বন্ধে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেন। এখন থেকেই তাকে অনেক বড় বড় কথা বলেন, কখনও কখনও মনের আবেগে ডায়েরির মধ্যেও পুত্রকে সম্বোধন ক'রে অনেক কথা লেখেন। গত বৎসর গৌরীকান্তের হাতে-খড়ি হয়েছে। এ বৎসর সরস্বতীপূজোর সময় ছেলেকে নিয়ে পূজাস্থানে গিয়েছিলেন। পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার পর তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, গৌরী বাপি, কি ব'লে মাকে প্রণাম করলে? গৌরীকান্তের বয়স মাত্র ছয়, কিন্তু বাপের বড় বড় কথাগুলি তাকে এদিক দিয়ে অনেকটা বেশি-বয়সী ছেলের মত পরিপক্ক ক'রে তুলেছে। ময়নাপাখির বুলি বলার মত, মানে না বুঝেও বেশ ভাল ভাল কথা বলতে পারে। সে বাপের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, "বললাম, মা আমাকে খুব বিদ্যা দাও, আমি খুব ধুম ক'রে তোমার পূজো করব। পূজোর দালান করব।" ঘটা ক'রে পূজো করার কথা, পুজোর দালানের কল্পনা মা-বাপ দুজনের কাছেই সে শুনেছে। রাধাকান্ত সে কথা তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। ঘটনাটি লিখে তিনি নিজের মন্তব্য লিখেছেন, "বালকের মুখে এবম্বিধ উক্তি পরমাশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দে ভাসিতে লাগিলাম। এ বালক অবশ্যই আমার কুল উজ্জ্বল করিবে। বাবা গৌরীকান্ত, তোমার কথা আমি লিখিয়া রাখিতেছি। মা-সরস্বতীর কৃপায় বিদ্যালাভ হইলে (অবশ্যই হইবে) যেন তোমার এই কথা স্থির থাকে। কদাচ বিস্মৃত হইও না। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হও এবং ঈশ্বরের কার্যে এই অনুরাগ এবং দেবতার প্রতি ভক্তি তোমার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক; তাঁহার কৃপায় গ্রামে দেশে তুমি সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ কর। গ্রামের ধনোদ্ধত ব্যক্তিদের দম্ভকে চূর্ণ করিয়া প্রমাণ কর—স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।"

রাধাকান্ত তাঁর নিজের জীবনের সকল ভরসায় আপনার অজ্ঞাতসারে হতাশ হয়েছেন, গোপীচন্দ্রের উন্নতির গতিবেগ হিসাব ক'রে নিজের চেষ্টায় প্রাধান্যলাভের ভরসা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়েছে, তাই ছেলের উপর সকল আশা-ভরসা স্থাপন ক'রে তার কানের কাছে সেই কথাগুলি গুঞ্জন করেন। শখের পোষা-পাখির স্পষ্ট ভাষায় বুলি বলার মত গৌরীকান্ত তার পুনরুক্তি করলে হতাশার গ্লানি কাটিয়ে তাঁর অন্তর আশার আনন্দে

ভ'রে উঠে। সেই জন্য গৌরীকান্তকে মধ্যে মধ্যে যেতে হয় বাপের কাছে। বিজ্ঞের মত বাপের পাশে ব'সে থাকে।

গৌরীকান্ত যখন বৈঠকখানায় থাকে, তখন চারু সেটা অনুভব করে। তাই কাশীর বউ তাকে বৈঠকখানায় যেতে বললে সে বলে, বাবা! বাবুর যে চোখ! দেখলে ভয় লাগে! তা হ'লেও সে বাড়ি যায় না। কাশীর বউয়ের কাছেই সে ব'সে থাকে, অনর্গল বকবক ক'রে ব'কে যায়। ছড়া বলে, গান করে, ঝুমুর-নাচ দেখায়, নিজের বিয়ের গল্প বলে—দান আঙাদিদি, আমার বিয়ে হবে, বর আসবে, গয়না পব্ব, চুড়ি বালা অনন্ত বাজু হার সাতনরী চিক ছাপটা কান-মল তোড়া প'রে ঝম্‌ঝম্ ক'রে চ'লে যাব শ্বশুরবাড়ি। গৌরীকাকা একলা ব'সে থাকবে ঘরে আ—র কাঁদবে, ঝরঝর ক'রে কাঁদবে। কার ছঙ্গে খেলা করবে তখন?

সন্ধ্যাবেলা গৌরীকান্ত এবং চারুকে নিয়ে কাশীর বউ গল্প করতে বসেন। স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের সংসার, রাঁধুনী রান্না করে, ঝি সাহায্য করে, চাকর বাইরের বাড়ির বরাত যোগায়, প্রয়োজন হ'লে সেও এসে অন্দরের কাজ সেরে দিয়ে যায়; কাশীর বউকে ব'সে থাকতে হয়। গল্প ব'লে তাঁরও সময় কাটে। আরও কয়েকজন তার সখী আসেন। ভাশুর শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ, মহাদেবের স্ত্রী, চারুর মা, চারুর খুড়ী। আরও দুইটি নিয়মিত শ্রোতা আছে—প্রতিবেশী-কন্যা দুই বোন—সরো এবং নীরো; সরোজা এবং নীরজা পিতৃগৃহবাসিনী দুই কুলীনকন্যা। চুলের দড়ি চিরুনি নিয়ে আসেন, এক দিকে গল্প শোনেন, অন্য দিকে চুল আঁচড়ান, বেণীরচনাপর্ব শেষ করেন, পায়ে তেল মালিশ করেন, মধ্যে মধ্যে পান-দোক্তা খান।

আজ গল্প হচ্ছিল,—এক ছিলেন রাজা। মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী ছিলেন তিনি। বহু রাজা তাঁকে কর দিত। সসাগরা ধরার অধীশ্বর বললেও চলে। রাজকোষ মণি মুক্তা হীরা জহরৎ সোনা রূপায় পরিপূর্ণ, সৈন্যশালায় রাজভক্ত সুশিক্ষিত বিক্রমশালী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সেনাপতি, হাতিশালায় ঐরাবতের মত হাতি, অশ্বশালায় উচ্চৈঃশ্রবার মত ঘোড়া, অসংখ্য দাস-দাসী নিয়ে রাজার সৌভাগ্য বর্ষার নদীর মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। রাজা নিজেও খুব বিক্রমশালী পুরুষ। প্রজা থেকে, কর্মচারী থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত রাজার মুখের দিকে চাইতে সাহস করেন না। সূর্যের দিকে যেমন চাওয়া যায় না, অমিততেজী সেই যে রাজাধিরাজ, তাঁর মুখের দিকেও তেমনই চাওয়া যায় না। কিন্তু রাজার একমাত্র দোষ—রাজা ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে মহা অহঙ্কারী। তিনি যখন চ'লে যান, তখন পায়ের

শব্দে তাঁর দম্ভ লোকে অনুভব করে, রাজপ্রাসাদ যেন কাঁপে। রাজার পুত্র-সন্তান নাই, আছে দুটি কন্যা। বড়টির নাম মুক্তামালা, ছোটটির নাম কাজলরেখা। রাজার রাণী নাই। মেয়ে দুটির শৈশবেই তিনি মারা গিয়েছেন। রাজা আর বিবাহ করেন নাই। মেয়ে দুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। যা চায়, তাই দেন। মেয়েদের ধাইমা মেয়েদের মানুষ করে। তারা আপন মনে নিজের নিজের খুশিমত খেলা করে, গান গায়, হাসে খায় দায়; রাজপণ্ডিত আসেন, তাঁর কাছে পাঠ নেয়। দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে যেমন একটু একটু ক'রে পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে, তেমনই ক'রে তারা বড় হয়ে ওঠে। এক বাপ-মায়ের দুই মেয়ে, কি আশ্চর্য, রূপে গুণে দুই মেয়ে ঠিক বিপরীত। বড় মেয়ের রূপ দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায়, আয়নাতে রোদের ছটা প'ড়ে তার আভা যেমন ঝকঝক করে—তেমনই রূপ তাঁর। গুণেও ঠিক তাই। শাণিত অস্ত্রের মত তাঁর স্বভাব। দাসদাসী সকলে তাঁর কাছে জোড়হাত ক'রে সশঙ্কিত হয়ে থাকে। আর ছোট রাজকুমারী কাজলরেখার রূপ শান্ত, স্নিগ্ধ, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার মত; স্বভাবও ঠিক তেমনই, মধুভরা ফুল যেমন মধুর ভারে নুয়ে পড়ে, মিষ্ট গন্ধে বুক ভরিয়ে দেয়, তেমনই ধারা মধুর প্রকৃতি তাঁর, ঠোঁটের ডগায় হাসি লেগেই আছে—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের মত হাসিটুকু। বড় রাজকন্যা মুক্তামালা মেয়ে হ'লেও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, তিনি ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করতে যান, তাঁর তীর ছোটে উল্কার মত। আকাশের বুকে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় যে সব পাখি, তাঁর তীর তাদের বিঁধে মাটির বুকে নামিয়ে আনে ঝড়ে-ঝ'রে-পড়া ফুলের মত। কাজলরেখাও রাজকন্যা, সেই হিসাবে তিনিও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন; অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ বেশি। তিনি ঘরে ব'সে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন, পড়তে পড়তে দিন শেষ হয়ে যায়; ঘরের আলো ক'মে যায়, তিনি গিয়ে বসেন তখন জানলার ধারে। আকাশের বুকে পাখির ঝাঁক উড়ে যায় গান ক'রে, তাদের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। আঁচলে ক'রে নিয়ে যান পঞ্চশস্য, ছাদের উপর অঞ্জলি ভ'রে ছড়িয়ে দেন, ডাকেন তাদের—আয় আয় আয়! ওরে পাখিরা, তোদের আমি ভালবাসি, তোরা খেয়ে যা। তারা শনশন শব্দে পাক দিয়ে নেমে আসে,—কেউ বসে তাঁর মাথায়, কেউ বসে কাঁধে, কেউ বসে হাতে, বসবার জায়গা যারা না পায় তারা পাক দিয়ে দিয়ে উড়তে থাকে—যেমন ভ্রমরে ওড়ে ফুলের চারদিকে, মাছেরা ঘোরে জলবালার চারদিকে, তারার দল ঘোরে চাঁদের

চারদিকে, তেমনই ভাবে তারাও কাজলরেখাকে প্রদক্ষিণ ক'রে উড়তে থাকে।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমে মেয়েরা বড় হয়ে উঠলেন। একদিন রাজবাড়ির বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে বললেন, মহারাজ, কন্যাদের এইবার বিবাহের কাল হয়েছে। মহারাণী নাই, থাকলে তিনিই রাজাধিরাজকে এ কথা বলতেন। তাঁহার অভাবে কর্তব্য আমার, আমিই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলেন, হাঁ, তাই তো, মুক্তামালার বয়স হ'ল আঠারো, কাজলরেখার ষোল। তিনি ডাকলেন মেয়েদের। দেখলেন। চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন সদ্যফোটা দুটি পদ্মফুল। ছোট মেয়ে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। রাজা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কাজলরেখাকে বললেন, এ কি, তুমি মাটিতে বসলে কেন? উঠে ব'স। কাজল বললেন, বাবা, শাস্ত্রে আছে—পিতা দেবতা, তাঁর সঙ্গে সমাসনে বসা উচিত নয়, তাঁর পায়ের তলাতেই বসা কর্তব্য। আর আসন হিসাবে মৃত্তিকাই হ'ল শ্রেষ্ঠ আসন। তবে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন তাই বসছি।

এ উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হলেন। তারপর কন্যাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন, মা, তোমরা এইবার বড় হয়েছ। বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু পাত্র সন্ধান করবার পূর্বে আমি জানতে চাই, তোমাদের কার কিরূপ আকাঙ্ক্ষা, কে কেমন স্বামী প্রার্থনা কর? মা মুক্তামালা, তুমি বড়, তুমিই বল আগে।

মুক্তামালা বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা—আমার স্বামী হবেন তিনি, যিনি শৌর্যে বীর্যে তেজস্বিতায় হবেন আপনার যোগ্য জামাতা। রূপে হবেন তিনি ঝড়ের সদৃশ, পবনদেবতার মত।

রাজা হেসে কন্যার কথায় বাধা দিয়ে রহস্য করলেন, তা হ'লে তোমার ছেলের একটি প্রকাণ্ড লেজ থাকবে মা। কেননা, পবননন্দন হলেন হনুমান। পিঠের উপরে লেজ তুলে দিয়ে 'জয় রাম' ব'লে এক লাফে সাগর ডিঙিয়েছিলেন জান তো?

মুক্তামালা একটু লজ্জিত হলেন। রাজা হেসে বলেন, বল বল।

মুক্তামালা বললেন, তিনি পবনের মত হবেন এইজন্য যে, শত্রুকুল তাঁর বীরত্বের সম্মুখে বড় বড় গাছের মত ভেঙে পড়বে। তেজে তিনি হবেন অগ্নির মত, তাঁর রক্তচক্ষুর দৃষ্টির উত্তাপে, যারা দুষ্ট, যারা হবে তাঁর প্রতি

ঈর্ষাপরায়ণ, তারা অগ্নির সম্মুখে তৃণের মত ম্লান হয়ে শুকিয়ে যাবে ; তাতেও যারা সংযত না হবে, তারা সেই তেজে হবে ভস্মীভূত। তাঁকে হতে হবে খ্যাতিমান প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। যেহেতু না সকল গুণের আকরই হ'ল বীজ, অমৃতফলের বীজ হতে জন্মায় যে গাছ সে গাছের ফল কখনও বিস্বাদ অথবা বিষাক্ত হয় না। সংসারে জন্মগুণই শ্রেষ্ঠ।

রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন কন্যার কথা শুনে। হ্যাঁ, তাঁর মত রাজাধিরাজের উপযুক্ত কন্যা।, রাজকন্যার উপযুক্ত কথা বলেছে সে। কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বাপ আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তুমি ইন্দ্রাণীর মত ভাগ্য লাভ কর। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার মনোমত স্বামীই আমি অনুসন্ধান করব। পৃথিবীতে না পাই, দেবলোক গন্ধর্বলোক পর্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে অবশ্যই নিয়ে আসব। মুক্তামালার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর রাজা ছোট মেয়ের দিকে ফিরে হাসিমুখে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, মা, এইবার তুমি বল তোমার মনের কথা।

কাজলরেখা চুপ ক'রে রইলেন। বাপকে নিজের বিয়ের কথা—বরের কথা বলতে লজ্জা হ'ল তাঁর।

রাজা হেসে আবার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, লজ্জাবোধ করছ? আচ্ছা, থাক্। আমি বুঝেছি, তোমার দিদি যা বলেছেন, তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষা, তোমারও কল্পনা তেমনই, বক্তব্যও তোমার তাই।

কঞ্চুকী বিনয় ক'রে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, অন্য প্রকার বাসনা বা বক্তব্য থাকবে কেন? পর্বতের কন্যা হ'ল নদী। নানা ধারায়, নানা দেশের মধ্য দিয়ে তারা স্বয়ম্বর হবার জন্য ছুটে চলে। তাদের গুণও এক —দেশকে করে উর্বর, আর তাদের লক্ষ্যও এক—মহাসাগরে মিলিত হবারই তাদের একমাত্র কামনা। সুতরাং মা কাজলরেখার বক্তব্যও ওই এক।

এবার কাজলরেখা ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন, তবে বল তোমরা কামনার কথা।

কাজলরেখা মৃদুস্বরে বললেন, আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি যেন হন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি রাজপুত্র হতে পারেন, আবার অতি সাধারণ, এমন কি দীনদরিদ্রের সন্তানও হতে পারেন। কান্তিতে তিনি কন্দর্পতুল্যও হতে পারেন, আবার মহর্ষি অষ্টাবক্রের মত রূপহীনও হতেও পারেন। তিনি গুণে হবেন মহাজ্ঞানী। যেহেতু জ্ঞানই হ'ল প্রশান্তির একমাত্র আকর, এবং যেহেতু অন্তরের প্রশান্তির রশ্মিই হ'ল সৌম্যতা, সেই হেতু তিনি রূপহীন যদি হন, তবুও হবেন সৌম্যদর্শন এবং শান্তপ্রকৃতি। পুণ্যকর্মই হবে তাঁর

অস্ত্র, ক্ষমাই হবে তাঁর ধর্ম। মানুষকে তিনি জয় করবেন না, মানুষের সেবায় তিনি তাদের সেবক হবেন, মানুষই তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে বিজয়ী ব'লে। সাম্রাজ্য তিনি কামনা করবেন না, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যে তিনি মোহগ্রস্ত হবেন না, সাম্রাজ্য উথলে উঠবে তাঁর পদক্ষেপে, রাজপ্রাসাদ কাঁদবে তাঁর পদধূলির জন্য। তাঁর রক্ষী থাকবে না কেউ, যেহেতু জীবনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় নয়, এবং সেই হেতুই তিনি হবেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সামান্য ব্যক্তির মতই সর্বসাধারণের একজন হবেন, সেই হেতুই তিনি হবেন অসামান্য।

রাজা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁর কন্যা হয়ে এ কি বলছে কাজলরেখা! তার কথার মধ্যে সে বার বার রাজত্বকে তুচ্ছ করছে, রাজাকে হেয় করছে। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, তোমার মস্তিষ্কের বোধ হয় ঠিক নাই কাজলরেখা। তাই বরাবর তুমি অসম্ভব কথা বলছ। রাজপুত্রকে কামনা না ক'রে সাধারণ মানুষকে বরণ করবার কথা বলছ।

কাজলরেখা বললেন, সাধারণের মধ্যে থেকেই তিনি হবেন অসাধারণ।

রাজা বললেন, সাধারণ কখনও অসাধারণ হয় না। মুক্তামালার কথা সত্য। বীজই সকল গুণের আকর। সুতরাং জন্ম যার উচ্চকুলে নয়, সে কখনও মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ হতে পারে না।

কাজলরেখা বললেন, কন্যার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। আমি কিন্তু মনে করি অন্যরূপ। জন্ম থেকেও কর্ম শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি। কর্ম থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, মানুষের প্রতিষ্ঠা থেকেই হয় একটি বংশের প্রতিষ্ঠা। আবার সেই বংশের বংশধরের অপকর্মে হয় সেই বংশের অধঃপতন। আপনার এই মহৎ বংশ—এই বংশের মহিমা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করছে পুণ্যকর্মী উত্তরাধিকারীর উপর। উদ্ধত উগ্র ক্ষমাহীন প্রেমহীন উত্তরাধিকারী আপনার দৌহিত্র, হোক না কেন মাতৃকুলের দিকে তার আপনার বংশে জন্ম, হোক না কেন পিতার দিক থেকে অন্য কোন মহৎ রাজবংশে জন্ম, সে কখনও আপনার বংশমহিমা এবং কুলগরিমাকে অক্ষুণ্ন অটুট রাখতে পারবে না। বিধাতার লিপিও খণ্ডিত হয় মানুষের কর্মফলে, সুতরাং কেবল আপনার ইচ্ছা এবং আশীর্বাদই আপনার উত্তরাধিকারীকে ভাবীকালে রক্ষা করতে পারবে না।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন কাজলরেখার উপর। কেন না, তাঁর মনে হ'ল কাজলরেখা তাঁর অপমান করেছে। রাজার পুত্রকে কামনা না ক'রে সাধারণ মানুষকে কামনা ক'রে, সে বংশের অপমান করেছে।

তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করতে পারবে না ব'লে সে তাঁর অপমান করেছে। একবার তাঁর ইচ্ছা হ'ল, প্রহরীকে ডেকে এক্ষুনি এই হীনমতি কন্যাকে বন্দিনী ক'রে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। তারপর একটা কথা তাঁর বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। ভাল, তাই হবে। কাজলরেখা রাজ্যকে উপেক্ষা করে, সাধারণ মানুষকে বিবাহ করতে তার প্রবৃত্তি! তাই তিনি করবেন। সেই বিবাহই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। রাজকন্যা হয়ে সে গরিবের বউ হবে। দাস থাকবে না, দাসী থাকবে না, রাজভোগ পাবে না, মোটা কাপড় পরবে, নিজে ভাত রাঁধবে, ঘুঁটে দেবে, নিজের হাতে ঝাঁটা ধরবে—এই তো উপযুক্ত শাস্তি।

তিনি তাই স্থির ক'রে দুই কন্যার পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন। মুক্তামালার বর খুঁজতে চারিদিকে রাজ্যে-রাজ্যে রাজ-ঘটক গেল; আর গরিবদের ঘটকালি করে যারা, তাদের কয়েক জনকে ডেকে কাজলরেখার পাত্র সন্ধান করতে বললেন। এই ঘটকদের মধ্যে এক বৃদ্ধ, তিনি বললেন, মহারাজ, যদি অনুমতি করেন, তবে ছোট রাজকন্যার মুখ থেকে একবার তাঁর কথা শুনতে চাই। রাজা অনুমতি দিলেন। বুড়ো ঘটক রাজকন্যাকে প্রশ্ন করলেন, মা, কয়েকটি প্রশ্ন করব? মহাদেবের বয়সের গাছপাথর ছিল না। জান তো? তিনি শ্মশানে বাস করেন। জান তো? দেবতারা যখন অমৃত পান করেন, তখন তিনি বিষ পান করেন। জান তো? দক্ষরাজার কন্যা তাঁকে বিবাহ করার ফলে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। জান তো?

কাজলরেখা বললেন, জানি।

বৃদ্ধ বললেন, তবে?

তবে? কাজলরেখা বললেন, বৃদ্ধ, আমি সতীকন্যা। আমার সংকল্প কখনও ভঙ্গ হয় না।

হ্যাঁ। বুঝলাম। তুমি সমস্ত কিছুই সহ্য করতে প্রস্তুত।

নিশ্চয়।

* * *

হঠাৎ গল্পে বাধা পড়ল। চারুর মা এসে দাঁড়াল। গল্পে বাধা দিলে সে-ই, বললে, গল্প চলছে বুঝি?

কাশীর বউ হেসে বললেন, হ্যাঁ। তারপর গল্পে আবার মন দিলেন, হ্যাঁ, তারপর, রাজ্যে একদিন মহাউৎসব আরম্ভ হ'ল—মুক্তামালার বিবাহ।

চারুর মা বললে, আমি ভাবলাম, গল্প তোমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে।

সারাদিনের মধ্যে ছুটি নাই। দাসী-বাঁদীর ভাগ্য নিয়ে সংসারে এসেছি, সেই খেটেই জীবন গেল। আমার যে একখানা চিঠি প'ড়ে দিতে হবে।

ব'স। গল্পটা শেষ করি।

বসব? বসবার ভাগ্যি ক'রে তো আসি নাই মা। তুমি বরং আমার চিঠিখানা প'ড়ে দাও। তারপর গল্প করবে।

চারিদিক থেকে আপত্তি উঠল। বিবাহের আসর সেজে উঠছিল গল্পে, বর আসছে, বাদ্যভাণ্ড বাজছে, হঠাৎ বাধা পড়ল। সকলেরই মন উতলা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। মেয়ে চারুই বললে, না না। মাকে সে বললে, না, তুমি এখন যাও।

একজন বয়স্কা শ্রোত্রী বললে, কাল পড়াবে চিঠি।

কাল? কাল তো সকাল থেকে এই রাত্রি পর্যন্ত সময় থাকবে না মা।

কাশীর বউ উঠলেন। বললেন, দাও। কই চিঠি?

একটু ঘরে চল খুড়ী। অর্থাৎ চিঠিখানি তাঁর স্বামীর, চারুর বাপের চিঠি।

ঘরের মধ্যে এসে চিঠিখানি হাতে দিয়ে চারুর মা বললে, দেখ তো মা, কি লিখেছে? আমার নামে সাতখানা ক'রে লাগিয়ে চিঠি গিয়েছে এখান থেকে আমি জানি। ভাশুর আমার নিজে লিখেছে।

বাদামী রঙের বালি-কাগজে লেখা চিঠি। বিশেষণহীন নামে সম্বোধন করেছে স্বামী—ইন্দুমতী, অগ্রজ মহাশয়ের পত্রে তোমার ও ছোট বধূমাতার বিবাদ-বিসম্বাদের কথা অবগত হইয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইলাম। শুনিলাম, তোমরা উভয়ে একজোট করিয়া মধ্যে মধ্যে পূজনীয়া মানিকবধূর সহিত ঝগড়া কর, সমান উত্তর কর। তুমি আপনাকে কি ভাবিয়াছ? একটা মেয়ের মা হইয়া তুমি কি হইয়াছ তুমিই জান। মনে করিয়াছ, একটা গোলমাল করিয়া পৃথক হইব। তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, আমি অগ্রজ মহাশয়ের বা পূজনীয়া মানিকবধূর অমতে কখনই যাইব না। আমি তোমাকে শেষ কথা বলিয়া দিতেছি যে, বাটিতে যদি সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পার, থাকিবে; নতুবা যেখানে সুখে থাক, সেইখানেই যাইবে।

চারুর মা খপ ক'রে কাশীর বউয়ের হাত থেকে টেনে নিয়ে বললে, থাক্। আর পড়তে হবে না। চিঠিখানা হাতে নিয়ে সে হনহন ক'রে বেরিয়ে গেল।

কাশীর বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

বাইরে থেকে গৌরীকান্ত ডাকলে, মা!

চারু ডাকলে, আঙাদিদি!

কাশীর বউ এসে আবার বসলেন।

তারপর? মুক্তামালার বিয়ে—

হ্যাঁ, মহাসমারোহ ক'রে মুক্তামালার বিয়ে হ'ল এক রাজপুত্রের সঙ্গে। যেমন বর চেয়েছিলেন মুক্তামালা, তেমনই বর।

আর কাজলরেখা?

হ্যাঁ। তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘটক নিয়ে এল এক বর। সাধারণ একটি লোক। এক কবি। গরিব, কিন্তু খুব পণ্ডিত। দেখতে মোটেই সুন্দর নন, কিন্তু মুখের হাসিটা বড় শান্ত। দেখলে মানুষও শান্তি পায়। রাজা কন্যাদান করবার সময় ভেবেছিলেন, মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন, মুখ দেখবেন না। হঠাৎ একবার দৃষ্টি পড়ল ছেলেটির দিকে। তার মুখের হাসিটি বড় ভাল লাগল। তিনি একবার ভাল ক'রে দেখলেন। আবার দেখলেন। কন্যাদান শেষ ক'রে উঠে একবার ভাবলেন, তাদের ডেকে ধনরত্ন দিয়ে তাদের আদর ক'রে নিজের কাছেই রাখবেন। কিন্তু না। নিজেকে কঠোর ক'রে তুললেন। কর্তব্য করতেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, আজ রাত্রে তোমরা আমার রাজ্য থেকে চ'লে যাও। প্রভাতে যেন দেখতে না পাই। কেউ যেন জানতে না পারে। কাজলরেখার বিয়ের কথা কাউকে জানান নি তিনি। আলো জ্বলে নাই, শুধু দুবার চারবার শাঁক বেজেছিল। দুটি প্রদীপ জ্বলেছিল। তাও ঘর বন্ধ ক'রে। অন্ধকারের মধ্যে বর আর কনে—কবি আর কাজলরেখা হাত ধরাধরি ক'রে পায়ে হেঁটে রাজ্য থেকে চ'লে গেল। যাবার সময় রাজা কিছু ধনরত্ন দিতে চাইলেন জামাইকে। জামাই বললেন, আমাকে ওসবের বদলে কিছু চাল দিন, যা নাকি রান্না ক'রে দশজনকে ভোজন করিয়ে, অবশিষ্টাংশ আমরা ভোজন ক'রে তৃপ্তি পাব। ধনরত্ন অলঙ্কার—এর মূল্য আমি বুঝি না। কন্যা কাজলরেখা তাঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে বাপের পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন।

*　　　*　　　*

আবার বাধা পড়ল। খিড়কির দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কে ডাকছে, রাঙাদি!

কে?

আমি কিশোর।

কিশোর? এস। কবে এলে তুমি কলকাতা থেকে?

খিড়কির দরজার ওপারের অন্ধকার থেকে একটি দীর্ঘাকৃতি তরুণ এসে উঠানে দাঁড়াল। দৃপ্ত এবং দীপ্ত চেহারার আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে। মেয়েরা যারা গল্প শুনছিল, তারা উঠে সংযত এবং সম্বৃত হয়ে বসল। চারু গৌরীকান্ত দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিশোরের দিকে। ছেলেটি এই বাড়ির দৌহিত্র-বংশের ছেলে। কিশোরের পিতামহের কালে তারা এই বাড়িতেই বাস করত। এখনও তাঁদের বাড়ি এই বাড়ির পাশেই। এদের বাড়ির সকলেই চাকুরে। ছেলেটি এন্ট্রান্স পাস ক'রে কলকাতায় পড়ে।

একজন গল্প-শ্রোত্রী বললে, ব'স ভাই, ব'স। গান শুনিয়ে যেতে হবে কিন্তু। বল ভাই কাশীর বউ, তুমি বল।

কিশোর জন্মগায়ক; মধুক্ষরা তার কণ্ঠস্বর, বাঁশী হার মানে। শুধু তাই নয়, সে কবিতা লিখতে পারে; খেলায় শক্তিতে সে নাম-করা ছেলে।

মেয়েটির অনুরোধ শুনে কাশীর বউ হাসলেন। বললেন, শুনছ কিশোর?

কিশোর বললে, আজ নয় রাঙাদি, অন্য দিন। আজ আমি বিপদে পড়েছি, আপনাকে উদ্ধার করতে হবে।

কি হ'ল? বাড়িতে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কিশোরদের বাড়িরও ওই চারুদের বাড়ির মত অবস্থা। একান্নবর্তী পরিবার। কিশোরের বাপের ছয় সহোদর, সাত বউয়ের বাড়ি; বাড়ির কর্ত্রী কিন্তু কিশোরের পিসীমা। তাঁর শাসনে মধ্যে মধ্যে কিশোরের মাকে কাঁদতে হয়, কিশোর বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করেন কিশোরের এক কাকা, নির্মম হস্তে দমন করেন, এখনও কিশোরের পিঠে বেত পড়ে। কিশোরের বাপ ভাইদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ, তবু তিনি এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন না। জ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি অগ্রজভক্ত চারুর বাপের মতই অনুজভক্ত। ভক্তি বা প্রীতিই এখানে একমাত্র কারণ নয়, প্রধান কারণ— এই রীতিই হ'ল সমাজ-প্রচলিত প্রশংসিত রীতি এবং বিধান। কিশোর এক-একদিন রাগ ক'রে বাড়ি থেকে চ'লে আসে। কাশীর বউ বুঝলেন, আজ তারও চেয়ে বেশি কিছু হয়েছে, নতুবা বাড়ি থেকে রাগ ক'রে চ'লে এসে কিশোর তো অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করবার ছেলে নয়, প্রয়োজন হ'লে সে গাছতলায় আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না।

আপনি একটু উঠে আসুন।

উঠে যেতে হবে? হাসলেন কাশীর বউ।

খিড়কি দরজার ওপাশে অন্ধকারের মধ্যে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেন কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। কিশোর বললে, একে আশ্রয় দিতে হবে আপনাকে।

একটি মেয়ে। বিস্মিত হয়ে গেলেন কাশীর বউ। কিশোরের প্রতি একটা বিরূপতা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর অন্তরে মাথা ঠেলে জেগে উঠছিল।—এ কে কিশোর?

একটি অনাথা মেয়ে রাঙাদি। গোয়ালপাড়া জানেন? গোয়ালপাড়া বাড়ি মেয়েটির, নাম ষোড়শী।

কাশীর বউ বললেন, ওর নাম আমি শুনেছি কিশোর। তুমি ওকে কোথায় পেলে?

কিশোর বললে, তা হ'লে তো আপনি অনেক কিছু জানেন রাঙাদিদি, গ্রামের লোকে ওর ওপর বিরূপ হয়েছে, ওকে সমাজে ঠাঁই দিতে চায় না। ও চ'লে এসেছে বাড়ি থেকে। কোথায় যাচ্ছিল ও-ই জানে, কিন্তু আমরা কজন বেড়িয়ে ফেরবার পথে দেখলাম, অমূল্য ভূপতি আরও কজন চেলাচামুণ্ডী নিয়ে, ওকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। মেয়েটি আমাদের দেখে কেঁদে উঠল। আমরা ওদের সঙ্গে মারামারি ক'রে বেচারাকে উদ্ধার করলাম। এখন কি করব? গ্রামেও ফিরে যাবে না। বিদেশে গেলে ওর অবস্থা যে কি হবে ভেবে দেখুন। আমার বাড়ির কথা তো আপনি জানেন। তাই নিয়ে এলাম আপনার কাছে। আমাদের দেশের এই সব হতভাগিনীদের দশা আপনি বুঝবেন। আপনি ওকে ঝি হিসেবে রাখুন। ও তা থাকতে চায়।

একটু চুপ ক'রে থেকে কাশীর বউ বললেন, আজ রাত্রির মত আশ্রয় আমি ওকে দিচ্ছি। বরাবরের কথা ওঁকে না জিজ্ঞাসা ক'রে তো বলতে পারব না ভাই।

কিশোর হেসে বললে, দাদাকে?

হ্যাঁ।

রাঙাদি, আপনাকে লোকে ডাকে কাশীর বউ ব'লে, কিন্তু আমরা ছেলের দল আপনার নাম দিয়েছি 'অন্নপূর্ণা'। রুদ্রদেবের মত রাধাকান্তদাদাকে আপনি ভিখিরী শিব বশ মানিয়েছেন, শিবের রাজ্য কাশী এই দাদার রাজ্যেই। ওটা ক'রে আপনি আমাকে ছলনা করছেন।

কাশীর বউ হেসে বললেন, ও তোষামোদের চেয়ে একখানা গান শোনালে আমি বেশি তুষ্ট হতাম নাতি।

আর একদিন। কাল দুপুরে এসে পেট ভ'রে গান শুনিয়ে যাব। কিন্তু আশ্রয় দিলেন তো তা হ'লে?

ওঁকে জিজ্ঞেস না ক'রে নয় ভাই। শিবই যখন বললে তোমার দাদুকে, আমাকে বললে অন্নপূর্ণা, তখন দক্ষযজ্ঞের কথাটা মনে করিয়ে দি তোমাকে। জোর ক'রে শিবের অনুমতি আদায় করার ফলে শিবানীকে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল, তার ফলে হয়েছিল দক্ষযজ্ঞ।

কিশোর বললে, দাঁড়ান দিদি, আপনাকে একটা প্রণাম করি।

কাশীর বউ হেসে বললেন, আশীর্বাদ করছি, টুকটুকে একটি বউ হোক শিগগির।

কিশোর বললে, রাঙাদি বুঝি আমাদের দেশের রসিকতাগুলো শিখছেন?

না শিখলে চলে? তোমাদের দেশের অন্নজল যখন বরাদ্দ করলেন ভগবান, তখন এই দেশের সব কিছুই যে শিখতে হবে ভাই। জান, বিয়ের পর এখানে এলাম; স্নান করব, বাড়ির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলাম, জল কোথায়? বলে, ঘাটে যাও। এই গোনে-গোনে আমার সঙ্গে এস, কেউ নাই এ গোনে, তবু সান কেড়ে লাও। আমি গোনও বুঝতে পারি না, সানও বুঝতে পারি না। তিনি হাসলেন। তারপর আবার বললেন, তখন তো ভাই, তোমাদের এ কালের ছেলেদের মত শহরের ভাষায় এ কালের ভাবের কথা কেউ বলত না, তোমরাও তখন শেখো নি। কাজেই এ দেশের কথা শিখতে হয়েছে বইকি।

তা শিখুন। গোন শিখুন, সান শিখুন, সে কথা আমি বলি নি। আমি বলছি, এ দেশের ওই রসিকতা আর বঁড়শির মত পাঁজরা-বেঁধা বাঁকা কথাগুলো শিখবেন না রাঙাদিদি। আর গালাগালগুলো শিখবেন না।

ভিতর থেকে চারুর কান্না ভেসে এল। চারু কাঁদছে, বোধ হয় গৌরীকান্ত তাকে মেরেছে। কাশীর বউ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আচ্ছা ভাই, কাল দুপুরে এসো, ওর পাকা ব্যবস্থা যা হয় হবে তখন। তারপর ষোড়শীকে বললেন, এস গো মেয়ে, আমার সঙ্গে এস।

কিশোর সম্ভবত কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্মদের ছোঁয়াচ লাগিয়েছে। কাশীর মেয়ে তিনি, ব্রাহ্মদের শুদ্ধ রুচিবাতিকের কথা জানেন। টুকটুকে বউ হোক —এ পরিহাসও কিশোরের কাছে অরুচিকর ঠেকছে। তা ভাল, দেশের ছেলেদের মধ্যে হাওয়া ফিরুক।

চারু চীৎকার ক'রে কাঁদছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, কি হ'ল? গৌরী মেরেছে বুঝি? গৌরী!

গৌরীকান্ত বললে, না, আমি মারি নি।

শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্যতমা গ্রামের মেয়ে পুঁটি বললে, না মা, তুমি চ'লে গেলে, ও শুল। আমি তাই উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম,—ওঠ্ চারু, মা আসছে, গল্প বলবে, শুনবি। এই কান্না! কে জানে মা, এমন রঙ্গের রাধা তো আমি দেখি নাই। তা আবার শুইয়ে দিলাম, বলি—তবে শো, ঘুমো। তাও শোবে না। কাঁদছে। এ কি আদর মেয়ের মা! ভাতারের ঘর করবে কি ক'রে এসব মেয়ে?

কান্নার মধ্যেই চারু ফোঁস ক'রে উঠল, বেশ, তা তোর কি ভাতারখাকী?

শুনলে, শুনলে,? কাশীর বউ, তুমি শুনলে? কষা ধ'রে মাটিতে ঘ'ষে দিতে হয় না মেয়ের? সাঁড়াশি তাতিয়ে ব্যাত (জিভ) ছিঁড়ে নিতে হয় না? বল তুমি?

কাশীর বউ বিব্রত হলেন। বললেন, চুপ কর, চুপ কর। ছোট ছেলে। যাক গে, মরুক গে, গল্প শোন।

পুঁটি উঠে দাঁড়াল। বললে, অ! ভালবাসার লোক যে চারুর মা, তাই বুঝি তার বেটীর দোষ হয় না? দোষ বুঝি আমাদের? তা বেশ। চললাম ভাই, আর আসব না।

কাশীর বউ বললেন, না না। ব'স পুঁটি, ব'স।

না।

শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ মহাদেবের স্ত্রী স্থূলকায়া, সে নির্বিকারের মত শুয়ে ছিল, সে বললে, গল্পটা শুনে যাও ভাই। গল্প আধশোনা রাখলে আধকপালে হয়।

পুঁটি এবার থমকে দাঁড়াল। এটা এখানকার প্রচলিত বিশ্বাস। তার উপর মাথা তার মধ্যে মধ্যে ধরে। সে ফিরে এসে বসল। বললে, তাই বল, 'বলেছি গুখেকোর ব্যাটা আর তো ফেরে না!' আধখানা যখন শুনেছি, তখন গু খেয়েছি, তা বল, শেষ কর, গু খেয়ে শেষই করি।

কাশীর বউ আশ্বস্ত হলেন। পুঁটি কুলীনের ঘরের মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নামে, স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, বাপের ঘরেও ভ্রাতৃবধূর বিষদৃষ্টি তার উপর; পুঁটির উপর রাগ করতে গেলে ওই কথাগুলিই মনে হয় কাশীর বউয়ের, তিনি রাগ করতে পারেন না। মায়ায় তাঁর মন ভ'রে ওঠে। যাক, পুঁটি

যখন ফিরে বসেছে, তখন আর ভাবনা নাই। গল্প শেষ হতে হতে তার সব রাগ জল হয়ে যাবে। চারুটাও আবার শুয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। ওটার ওই রোগ। আর গল্প-পাগল যেমন তাঁর শ্রীমানটি! গল্প যতক্ষণ শেষ না হবে ততক্ষণ জেগে থাকবে। সস্নেহে ছেলেকে কাছে একটু টেনে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তারপর—। কতদূর বলেছি বল তো ?

পুঁটি বললে, বিয়ে হ'ল গো ছোট রাজকন্যের। কি নাম যেন ?

গৌরীকান্ত বললে, বর-কনে রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেল অন্ধকারে। কাজলরেখা গয়না খুলে বাবার পায়ে নামিয়ে দিলে।

পুঁটি বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা তোতাপাখি ছেলে তোমার মা! ঠিক মনে রেখেছে। আমরা বুড়ো মাগী, আমাদের মনে নেই। বাবা আমাকে খ্যাপা বলে, তা মিছে নয় ভাই। কিছুই আমার মনে থাকে না।

শ্যামাকান্তের পুত্রবধূ বললে, বলুন খুড়ী, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে।

সত্য কথা। কাশীর বউয়েরও অনেক কাজ বাকি। রাধাকান্তের জন্য তিনি নিজে হাতে রুটি তরকারি তৈরি ক'রে থাকেন। তারও সময় হয়ে এল। তিনি আরম্ভ করলেন, হ্যাঁ, তারপর—

তাবপর কবি আর কাজলরেখা এলেন কবির ঘরে। গরিবের ঘর। কাজলরেখার তাতে কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। প্রসন্ন মনে সমস্ত করেন, —ঝাঁট দেওয়া থেকে রান্নাবান্না, বিছানা-পাতা, জল-আনা সমস্ত। কবি কাব্য লেখেন। রাত্রে কাজলরেখাকে শোনান। কাব্যে কবি ভগবানের স্তব করেন, প্রার্থনা করেন—হে ভগবান, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দীনদরিদ্রের বন্ধু, তাদের দুঃখ তুমি দূর কর। সকল বিপদে তুমি তাদের রক্ষা কর। তাদের বড় কষ্ট, তুমি তাদের দিকে তাকাও। শুনতে শুনতে কাজলরেখার চোখ জলে ভ'রে ওঠে, কবি সকালে বার হন একতারা নিয়ে। গ্রামের পথে পথে গান গেয়ে চলেন—ধনী, তুমি অহঙ্কার ক'রো না, ধনসম্পদ হ'ল পদ্মপত্রের জল। দরিদ্র, তুমি দারিদ্র্যদুঃখে পরের হিংসা ক'রো না, অসৎ উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা ক'রো না ; হিংসা হ'ল নিজের-কাপড়ে-ধরানো আগুন, তাতে তুমিই পুড়ে মরবে ; অসৎ উপায়ে উপার্জন হ'ল পাপ, পাপ তোমাকে ধ্বংস করবে। উপরের দিকে চাও, সেখানে আছেন সকল মানুষের পরম বন্ধু এবং সকল রাজার রাজা ; তিনি তোমাদের রক্ষা করবার জন্য, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ব'সে আছেন, সকল অবিচারের বিচার করবার জন্য ন্যায়দণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর

দ্বারস্থ না হ'লে তিনি কি করবেন? তাঁর শরণ নাও, তাঁর শরণ নাও, তোমরা সকলে তাঁর শরণ নাও।

এদিকে রাজা মুক্তামালার বরকে তাঁর প্রতিনিধি ক'রে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মুক্তামালার বর মহাবীর মহাযোদ্ধা, তিনি মৃগয়ায় যান, পশুপক্ষী বধ করেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ জয় করেন। রাজাদের বন্দী ক'রে এনে দাস করেন, রাণী-রাজকন্যাদের এনে মুক্তামালার দাসী ক'রে দেন। আবার তিনি কঠোর শাসক। সামান্য দোষও কেউ করলে তার নিষ্কৃতি নাই। চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। কে কোথায় রাজার নিন্দা করছে, সন্ধান করে গুপ্তচরেরা। কে কোথায় রাজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছে, সে সন্ধান রাখে তারা। জামাই-রাজা কঠোর শাস্তি দেন।

প্রজারা সবাই সশঙ্কিত হয়ে দিন যাপন করে। কার কোন্‌দিন কি হয়! শস্য উঠলে সর্বাগ্রে রাজাব কর আদায় দেয়, শস্য যদি নাও হয়, তবুও ঋণ করে অথবা কিছু বিক্রি ক'রে—যেমন ক'রেই হোক, রাজার কর দিয়ে আসে।

ক্রমে দুই কন্যারই দুটি ছেলে হ'ল। ছেলে দুটি আপন আপন বাপ-মায়ের কাছে বড় হতে লাগল। মুক্তামালার ছেলে ভবিষ্যৎ রাজা, রাজপ্রাসাদে সোনার ভাঁটা নিয়ে খেলা করে। তীর ধনুক নিয়ে পোষা-পাখি বিঁধে লক্ষ্যভেদ শেখে। কাজলরেখার ছেলে ভোরে উঠে জোড়হাত ক'রে বসে, কাজলরেখার সঙ্গে তার বাপের রচনা করা ভগবানের স্তব গান করে, আঙিনায় খেলা করে, পাথর নুড়ি কুড়িয়ে আনে। যেগুলিতে ময়লা মাটি লেগে থাকে, সেগুলিকে বলে, মা, এরা গরিব দুঃখী, নয়? গায়ে ময়লা মাটি লেগে রয়েছে; তাদের সে স্নান করায়। বলে, এদের সেবা করছি। সন্ধ্যায় শাস্ত্র পড়ে বাপের কাছে—নানা শাস্ত্র।

এমন সময়, সেবার একবার দেশে এল মহা হাহাকার। একেবারেই বৃষ্টি হ'ল না। দারুণ অনাবৃষ্টি। বর্ষা না হ'লে শস্য হয় না। শস্য না হ'লেই দেশে হয় দুর্ভিক্ষ। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'ল। লোকেরা অন্নের অভাবে, গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করলে, স্ত্রী-পুত্র বেচতে আরম্ভ করলে।

জামাই-রাজার কঠোর শাসন। রাজকর আদায়ের জন্য নায়েব-গোমস্তার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত দেওয়া হ'ল।

কাজলরেখার স্বামী কবি, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে অবিরাম কাঁদেন। ভগবানকে ডাকেন, উপায় কর, প্রভু, তুমি উপায় কর। মানুষকে তুমি রক্ষা

কর। কাজলরেখা জোড়হাত ক'রে ব'সে থাকেন স্বামীর পাশে। ছেলেটিও থাকে। রাত্রে কবিকে স্বপ্নাদেশ হ'ল। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ দেশে রাজা রয়েছে। তুমি প্রজাদের সঙ্গে ক'রে তাঁর দরবারে যাও। জানাও তাঁকে তোমাদের দুঃখের কথা। তিনি যদি প্রতিকার না করেন, তখন আমার কাছে নালিশ জানালে তার প্রতিকার আমি করব।

সকালে উঠেই কবি কাজলরেখাকে সব বললেন। বলে বললেন, দেখ, তোমার দিদি মুক্তামালার স্বামীর যে প্রকৃতির কথা আমি শুনেছি, তাতে ভগবানের অভিপ্রায় যে কি, তা আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমাকে যেতে হবে। সত্যপ্রিয় (ছেলের নাম সত্যপ্রিয়) তোমার কাছে রইল। আমি যদি না ফিরি, তার ভার তোমার উপর রইল।

তারপর তিনি দুঃখীদের নিয়ে রাজধানীতে গেলেন। যত যান, তত দলে দলে লোক তাঁর পাশে জমা হয়। এমনই ভাবে তারা প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে জোড়হাত ক'রে ডাকলে, হে মহারাজ, আমাদের দয়া করুন, আমাদের অন্ন দিন।

মুক্তামালার স্বামী ঘুমুচ্ছিলেন। চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায় রক্তচক্ষু হয়ে, ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে। বিছানা থেকে তরবারি হাতে নিতেই কিন্তু চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, সম্ভবত তারা তাঁর তরবারি হাতে নেওয়া জানতে পেরেছে। কিন্তু তিনি বারান্দায় এসে দেখলেন, শক্তিপ্রিয় (তাঁর ছেলের নাম শক্তিপ্রিয়), তারই ভয়ে প্রজাদের চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে ; শক্তিপ্রিয় ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে, আর নীচে প্রজাদের সামনে—সর্বাগ্রে একটি মানুষের দেহ প'ড়ে আছে। তার বুকে একটা তীর বিঁধে রয়েছে। দেখেই ছেলেকে তিনি মহাগৌরবের সঙ্গে বুকে তুলে নিলেন। উপযুক্ত পুত্র। বিদ্রোহ দমন করতে সে পারবে।

ওদিকে প্রজারা কবির মৃতদেহ তুলে নিয়ে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল। কবিই ছিলেন সকলের সম্মুখে, সর্বাগ্রে। শক্তিপ্রিয়ের তীর তাঁর বুকেই এসে বিদ্ধ হয়েছিল।

কাশীর বউ একটু থামলেন।

তারপর মা? সত্যপ্রিয় কি করলে? মা, তাকেও মেরে ফেললে?—গৌরীকান্তের গলা কাঁপছে। কান্না এসেছে তার।

পুঁটি বললে, না ভাই, এ গল্প তোমার ভাল নয়! বিয়ে নাই, রাজকন্যে নাই। মারামারি কাটাকাটি। না ভাই।

চাকর বিষ্টুচরণ এসে দাঁড়াল—মা!

কাশীর বউ বললেন, ভাঁড়ারে ময়দা বের করা আছে বাবা, তুমি নিয়ে মাখতে আরম্ভ কর। আমার হয়ে গেছে।

কাশীর বউ গল্প বলার ভঙ্গির ঈষৎ পরিবর্তন করলেন। সংক্ষিপ্ত ক'রে ব'লে গেলেন। বললেন, ওদিকে কাজলরেখা স্বামীর দেহ নিয়ে নদীর ধারে দাহ করলেন। চিতার পাশে মাতাপুত্রে হাতজোড় ক'রে ভগবানকে ডাকলেন। বললেন, প্রভু, তোমার আদেশে সে গিয়েছিল। তাকে রাজা বধ করেছে। তার প্রতিহিংসা আমরা চাই না, আমরা চাই, তুমি বলেছিলে রাজা প্রতিকার না করলে তখন তোমার কাছে নালিশ জানাতে। রাজা প্রতিকার করে নাই, তুমি এইবার প্রতিকার কর, দুঃখীদের বাঁচাও, ত্রাণ কর। এইবার ভগবানের আসন ট'লে উঠল। তিনি ডাকলেন ক্রোধকে। বললেন, যাও, তুমি গিয়ে প্রজাদের বুকের মধ্যে অধিষ্ঠান হও, দাউদাউ ক'রে জ্বলে ওঠ, তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে—এমনভাবে তাদের ক্রুদ্ধ ক'রে তোল। ক্রোধ এল।

অনাহারে মানুষ পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে পেটের জ্বালায়। পথে প'ড়ে মরছিল। সেই সব মড়ার মাংস খাচ্ছিল। তারা দেখতে দেখতে অন্যরকম হয়ে উঠল। দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের জটা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ, তেমনই মূর্তি হ'ল তাদের। তারা ছুটল দলে দলে —মার্-মার্ শব্দে। মার্, ওই রাজাকে মার্। রাজার পাপেই হয় অনাবৃষ্টি, রাজার পাপেই হয় দুর্ভিক্ষ, রাজার অত্যাচারেই আমাদের এই দশা। রাজাকে মার্।

সকলের নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে আসছিল।

গৌরী বললে, মা, কি করলে তারা?

তারা ছুটে গিয়ে পড়ল দলে দলে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা ক্ষেপে উঠল, হাতি খেপে উঠল, ঘোড়া খেপে উঠল, আকাশে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধিনী; সে এক প্রলয়ের মত ব্যাপার। ভেঙে পড়ল রাজার সিংহদ্বার। ছিঁড়ে পড়ল ঝাড়-লণ্ঠন। দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল কাঠের আসবাব। প্রজারা হুঙ্কার দিতে উঠতে লাগল উপরে। মুক্তামালার বর কিন্তু মহাবীর, শক্তিপ্রিয়ও বীর, মুক্তামালাও যুদ্ধ করতে জানেন।

তাঁরা পালালেন না, যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু এত মানুষের কাছে তাঁরা কি করবেন? কিছুক্ষণের মধ্যে তিনজন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। প্রজারা তাদের দেহ মাড়িয়ে এর পর ছুটল—কোথায় সেই বুড়ো রাজা! এইবার তাকে আমরা বধ করব। কোথায়? অথর্ব বৃদ্ধ রাজা ব'সে ছিলেন আপনার ঘরে। তিনি ইষ্ট স্মরণ করতে লাগলেন। কোলাহল এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু রাজা আশ্চর্য হলেন, হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁশির আওয়াজের মত একটি মিষ্টি আওয়াজ তাঁর কানে এল—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, হিংসাকে সম্বরণ কর। বাঁশির আওয়াজ শুনে ছুটন্ত হরিণের দল যেমন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, পাগলা হাতি যেমন শান্ত হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই পাগল লোকেরা থমকে গেল। রাজার ঘরে এসে ঢুকল ষোল-সতেরো বৎসরের একটি ছেলে, সে যেন কুমার কার্তিক। কিন্তু তার হাতে ধনুর্বাণ নাই, অঙ্গে রাজবেশ নাই। পিছনে পিছনে এসে ঢুকলেন বিধবা কাজলরেখা। বাবা! রাজা চমকে উঠলেন, মা কাজলরেখা?

হ্যাঁ, বাবা। এই আপনার দৌহিত্র।

জামাই?

তাঁকে তো বধ করেছে শক্তিপ্রিয়।

রাজা কাঁদতে লাগলেন। কাজলরেখা বললেন, বাবা, জন্ম থেকে শ্রেষ্ঠ কর্ম, তাই সেই কর্মপুণ্যবলে মানুষের সেবার পুণ্যে উন্মত্ত মানুষ আজ সত্যপ্রিয়ের অনুগত। সেই পুণ্যেই আপনাকে আজ রক্ষা করতে পেরেছি—এই আমার মহাভাগ্য।

রাজা উঠলেন, নিজের মাথার মুকুট খুলে পরিয়ে দিলেন সত্যপ্রিয়ের মাথায়। প্রজারা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। রাজা বললেন, আমার নাতির বিবাহ দেব। সেই বিবাহে রাজকোষ রাজভাণ্ডার তোমাদের খুলে দিলাম।

* * *

রাত্রে রাধাকান্ত খেতে বসেছিলেন। কাশীর বউ বললেন ওই ষোড়শী মেয়েটির কথা।—একটি মেয়েকে আমি আশ্রয় দিয়েছি তোমার মত না নিয়েই।

কে?—চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। কে সে মেয়ে?

নাম ষোড়শী, গোয়ালপাড়ায় বাড়ি।

রাধাকান্ত বললেন, ষোড়শীর অনেক অখ্যাতি কাশীর বউ।

কাশীর বউ বললেন, খ্যাতি-অখ্যাতিই কি সব? মানুষের দাম কি কিছুই নাই?

রাধাকান্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কাশীর বউ, তুমি নতুন কালের কথা বলছ। আমি পুরনো কালের মানুষ। বয়সে না হ'লেও মনে মনে আমরা পুরনো কালের। আমাদের কালের কথা হ'ল—মানুষের দাম খ্যাতি-অখ্যাতিতেই। মানুষ জন্মায়, তারপর একদিন মবে, মরতে হবেই। কিন্তু যে খ্যাতি অর্জন করে, সে ম'রেও বেঁচে থাকে; আর জীবনটা যার অখ্যাতিতে কলঙ্কিত, তার মৃত্যুতে সংসার নিশ্চিন্ত হয় ব্যাধিমোচন হ'ল ব'লে। চুপ করলেন রাধাকান্ত। একটু পর বললেন, আশ্রয় দিয়েছ—প্রতিশ্রুতি দিয়েছ?

কাশীর বউ বললেন, আমি অবশ্য আশ্রয় দিই নি। তোমার ঘর, তোমার অমতে আশ্রয় দোব কোন্ অধিকারে? রাত্রের মত থাকতে দিয়েছি। বলেছি সে কথা কিশোরকে। কিন্তু কিশোরের একটা কথা আমার প্রাণে বড় লেগেছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রাধাকান্ত স্ত্রীর মুখেব দিকে চাইলেন।

কাশীর বউ বললেন, কিশোর বললে—আশ্রয় না পেলে ওর পরিণামটা ভেবে দেখুন। ভাবতে গিয়ে আমি শিউরে উঠলাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাধাকান্ত বললেন, ভাবনা তো শুধু ওর পরিণামই নয়। ভাবনার যে অনেক কিছু আছে কাশীর বউ।

এবার কাশীর বউ সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাইলেন।

রাধাকান্ত বললেন, ওর ভাবনা ভাববার আগে, আমার নিজেব ভাবনা ভাবতে হবে।

কাশীর বউ·হেসে ফেললেন, বললেন, বাঁশি শুনে এত, তা হ'লে না জানি তাকে দেখলে কি বলবে তুমি! কিন্তু তুমি এত দুর্বল, তা জানতাম না।

রাধাকান্তও হেসে ফেললেন। বললেন, বাক্‌পটুতা পুরুষের পক্ষে ভাল লক্ষণ, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে আজ মুখরা বলতে হ'ল আমাকে। নিজের ভাবনা হ'ল—আমার ঘরের ভাবনা। জান, চরিত্রহীনা নারী যে সংসারে থাকে, সে সংসারে লক্ষ্মীর আসন টলে?

কাশীর বউ বললেন, তুমি আমাকে মুখরা বললে, আর আমার কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে না ব'লে পারছি না। তুমি তো শাস্ত্র অনেক পড়েছ। কোজাগরী লক্ষ্মীর কথায় আছে, আশ্রয় চাইতে আসায় অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণ। তাতে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেছিলেন তাঁকে।

কিন্তু তাঁর ধর্ম তাতে বলীয়ান হয়েছিলেন। লক্ষ্মীকে ফিরতে হয়েছিল সে বলে। এ মেয়েটিও তো আশ্রয়প্রার্থী তোমার কাছে।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে রইলেন।

হঠাৎ একটা ডাক কানে এল।—রাধাকান্তদা! রাধাকান্তদা!

খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত উত্তর দিলেন, কে?

আমি স্বর্ণ। বাড়ির ছাদের উপর থেকে ডাকছি।

কি? কি হ'ল?

ধোঁয়াতে যে গ্রাম ভ'রে গেল! কিছু বুঝতে পারছ না?

ধোঁয়া?

কাশীর বউ বললেন, হ্যাঁ গো, তাই তো। কথার মধ্যে অন্যমনস্ক ছিলাম। সত্যিই তো ধোঁয়া এসে ঢুকছে ঘরে।

রাধাকান্ত উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাতে জল দিয়ে, নিজের ছাদেব উপব গিয়ে উঠলেন। দেখলেন, গ্রামের মাথার উপরে যেন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে নেমেছে। আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে গ্রামের আকাশ। আকাশের গ্রহলোক পর্যন্ত অস্পষ্ট আবছা দেখাচ্ছে। চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, শুধুই ধোঁয়া, আগুনের আভাস কিন্তু কোথাও দেখা যায় না।

স্বর্ণ!

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার?

অন্য একটি ছাদ থেকে কেউ ডাকলে, কে? রাধাকান্তমামা?

গোপীচন্দ্র ডাকলেন। তাঁরও ঘুম ভেঙেছে। রাধাকান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। গ্রাম ধোঁয়ায় ঢেকে গেল, দেখেছেন? কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

গোপীচন্দ্র বললেন, ও ভয়ের কিছু নয়। ইঁটের ভাটার ধোঁয়া। ইস্কুল-ঘরের জন্য ইঁটের ভাটায় আজই আগুন দেওয়া হয়েছে। তারই ধোঁয়া! শুয়ে পড়ুন গিয়ে।

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। চিলে-কোঠার দরজা-বন্ধের শব্দে বুঝা গেল, গোপীচন্দ্র ছাদ থেকে নেমে গেলেন। স্বর্ণের আর সাড়া পাওয়া গেল না। সে নিঃশব্দে নেমে গিয়েছে নিশ্চয়! ইঁটের ভাটার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। হ্যাঁ, ইস্কুল-ঘরের জন্য ইঁট-পোড়াই শুরু হয়েছে বটে! খবরটা তিনি শুনেছিলেন। গ্রামে দিনমজুর পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। সকলেই ওখানে খাটতে যায়।

কাশীর বউ এসে ডাকলেন, কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে রাধাকান্ত বললেন, চল, যাই।

কি ভাবছ বল তো ?

ভাবছি ? চল যাই, শুই গিয়ে। আর একদিন বলব।

চল। গৌরী জেগে রয়েছে। গল্প শুনে ঘুম আসছে না তার। গল্প না শুনেও ছাড়বে না ; আবার শুনে ছেলের ঘুম আসবে না।

* * *

সকালে উঠে রাধাকান্ত জানলার ধারে দাঁড়ালেন। গৌরী এখনও ঘুমুচ্ছে। বেচারা কাল রাত্রে বার দুই চেঁচিয়ে ঘুম ভেঙে উঠেছে। গল্পের কথা স্বপ্ন দেখেছে। সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপর তিনি চেয়ে দেখলেন জানলার বাইরে গ্রামের আকাশের দিকে। এখনও পর্যন্ত ধোঁয়ার স্তর পাতলা ছিল্‌কে মেঘের মত গ্রামের মাথায় উড়ে চলেছে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়ালেন। নীচে না নেমে, ছাদে উঠে গেলেন।

ছাদে থেকে গ্রামের পশ্চিম দিকের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন। পশ্চিম প্রান্তে একটি অনুর্বর কাঁকর-বালি-মেশানো মাটির উঁচু প্রান্তর। মাটি এত অনুর্বর যে, ওটা অনাবাদী হয়েই প'ড়ে আছে ; গোচারণের জন্যও কেউ ওদিকে যায় না। ওই যে বটগাছটা, ওটাতে—লোকে বলে—ভূত আছে। ওই প্রান্তরটার মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে—এখান থেকে সাত মাইল দূরবর্তী রেল-স্টেশন যাবার পাকা সড়ক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড রোড।

ওই প্রান্তর কিনেছে গোপীচন্দ্র। ওই প্রান্তরে ইস্কুল হবে। ওরই ইটের ভাটা পুড়ছে—একটা দুটো তিনটে। তিনটে ভাটার প্রায় সর্বাঙ্গ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া বেরিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। আরও একটা দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন, পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর দিকে মাঠের পথ ধ'রে আসছে কালো পিঁপড়ের সারির মত মানুষের সারি। বুঝলেন, মজুরেরা আসছে খাটতে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন।

মাটি কাটছে, জল ঢালছে, কাদা ছাঁটছে পায়ের কৌশলে, ফর্মায় ফর্মায় ফেলে ইট পেড়ে যাচ্ছে। গাড়ি গাড়ি কয়লা আসছে। শুকনো ইট তুলে ভাটা সাজানো হচ্ছে। ইট পুড়ছে। কাঁচা ইট লাল হয়ে কালজয়ী শক্তি অর্জন করছে। ঘুটিং আসছে। চুন হচ্ছে। ভিত খোঁড়া হচ্ছে। গাঁথান গাঁথা হচ্ছে, গ'ড়ে উঠছে ইমারৎ। ইস্কুলবাড়ি। তারপর আরও,

আরও ইমারতে ভ'রে উঠল ওই প্রান্তর। গ্রামের লোক ছুটে চলছে ওখানে। গ্রামান্তরের লোক আসছে ওখানে।

তিনি পূর্ব দিকে একবার ফিরে চাইলেন। নদীর ধারে বন্দরটিপির জঙ্গল দেখা যাচ্ছে দূরে। গাছের মাথায় পাখিরা উড়ছে। নীচে? নীচে বেড়াচ্ছে সাপ। অসংখ্য কীট পতঙ্গ ঝিঁঝি ডাকছে অবিরাম। নির্জন স্তব্ধতার মধ্যে অবিরাম ডেকে চলেছে তারা।

ওই চণ্ডীতলা। ও পথে চলেছে কয়েকটি পুণ্যার্থিনী মেয়ে মাত্র। মাঠে কজন চাষী ঘুরছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরাও চ'লে আসবে। চণ্ডীতলার মাঠ খাঁ-খাঁ করবে।

উত্তর-পূর্ব দিকে গন্ধবণিকপাড়া। ভাঙা দালানখানা দেখা যাচ্ছে শুধু। তিনি বেশ দেখতে পেলেন, ওখানে দুপাশে ছোটখাটো মুদীর দোকানের মাঝখানে রাস্তায় দু-চারখানি গাড়ি, দু-দশজন মানুষ শুধু ঘুরছে।

নিজেদের পাড়ায় অবশ্য কলরব উঠছে, গমগম করছে। তাঁর ওখানেই হয়তো পাঁচ-দশজন ব'সে আছে।

আবার তিনি চাইলেন পশ্চিম দিকে। উঃ, এখনও মানুষ আসছে! গ্রামান্তর—ওই ব্যাপারীপাড়া, গোগ্রাম, দেবীপুর, সজলপুর, মিলনপুর থেকে মানুষ আসছে। মাঠে-মাঠে চ'লে আসছে। ওই প্রান্তরে গোপী-চন্দ্রের যে কীর্তিপল্লী গড়ে উঠছে, যেখানে একদা গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ আসবে, পদচিহ্নে পদচিহ্নে সেখানে আসবার পথ রচনা ক'রে আসছে তারা।

রাধাকান্ত কাল রাত্রি থেকেই ভাবছিলেন এই কথাটা। নবগ্রাম, এই অঞ্চলের সত্তর-আশিখানা গ্রামের কেন্দ্রস্থল, জনপদতুল্য এই নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মী পার্শ্বপরিবর্তন ক'রে ওই দিকে মুখ ফেরাচ্ছেন। একদা তিনি ছিলেন চণ্ডীতলা-অভিমুখিনী। দেশ-দেশান্তরের যাত্রী আসত। চণ্ডীতলার ঘণ্টাধ্বনিতে মানুষের ঘুম ভাঙত। চণ্ডীতলায় যেত মানুষ দলে দলে। শান্তি নিয়ে ফিরে আসত। তারপর গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফিরিয়েছিলেন ঘাট-বন্দরের দিকে। দেশান্তর থেকে নৌকা আসত। ঘাট থেকে গ্রাম পর্যন্ত গ্রামান্তর পর্যন্ত চলত বোঝাই গাড়ির সারি। মানুষ—মানুষ—মানুষ। তারা চলত পাশে পাশে। তারপর রেল হ'ল, নদী মজল। বন্দরটিপি জঙ্গলে পরিণত হ'ল। গ্রামলক্ষ্মী মুখ ফেরালেন তাঁদের পল্লীর দিকে—উকিল, জমিদার, চাকুরে এদের পল্লীর দিকে। মা আবার মুখ ফেরাচ্ছেন। ফেরাচ্ছেন ওই ধুধু-করা প্রান্তরের দিকে। চঞ্চলা! তুমি চঞ্চলা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন রাধাকান্ত। 'চঞ্চলা' ব'লে মাকে দোষ দেওয়া

কেন? কালের রথ চলেছে। সেই রথে গ্রামলক্ষ্মী পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ, তারপর দক্ষিণ দিক দিয়ে চলেছেন, এইবার কিছুক্ষণের জন্য গিয়ে থামবেন পশ্চিমে। জনপদতুল্য নবগ্রামে লক্ষ্মীর রথ চলেছে। দিল্লী গিয়েছিলেন তিনি। দেখে এসেছেন—হস্তিনাপুরী থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে হিন্দু রাজাদের দিল্লী, তারপর পাঠান, তারপর মোগলের দিল্লী, এই চক্রে রথে চ'ড়ে ঘুরেছেন সেখানকার লক্ষ্মী। দীর্ঘকাল তাঁর রথ থেমে আছে। হয়তো আবার চলবে তাঁর রথ কোনদিন, অকস্মাৎ নতুন দিকে মুখ ফেরাবেন। মনে পড়ল বাংলার কথা। গৌড়, গৌড় থেকে ঢাকা, রাজমহল; সেখান থেকে মুরশিদাবাদ, মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে থেমেছেন বাংলার লক্ষ্মী।

নবগ্রামের পল্লীলক্ষ্মীর রথ চলেছে। মানুষ বুঝতে পারে না, দেখতে পায় না। শতাব্দীতে শতাব্দীতে এক-একবার হয়তো বুঝা যায়, লক্ষ্মীর মুখ ফিরেছে। মা এবার ওই ইস্কুলের দিকে মুখ ফেরালেন।

পাঁচ

রাধাকান্ত ছাদ থেকে যে দৃশ্য দেখলেন—গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ পিঁপড়ের সারির মত প্রান্তর এবং ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পায়ে পায়ে নতুন পথ রচনা ক'রে গোপীচন্দ্রের ইটখোলা এবং ইস্কুল-ইমারতের কাজে আসছে, সে দৃশ্য স্বর্ণবাবুও দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রামপ্রান্তে তাঁর কলমের আমবাগানের মধ্যে। কলমের গাছের শাখাপল্লবের আড়াল পড়ায় দেখতে অসুবিধা অনুভব করলেন তিনি। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে স্বর্ণবাবু খোলা মাঠের উপর দাঁড়ালেন।

এত লোক? এত লোক কত কাজ করছে? কি এত কাজ? গুড়ের সন্ধান পেয়ে চারিদিকের গর্ত থেকে পিঁপড়ে ছুটে আসে। কিন্তু গুড়ের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের সংখ্যার তারতম্য হয়। এক ফোঁটা গুড় পড়লে, পিঁপড়ে খুব বেশি আসে না। গুড়ের হাঁড়ি ভেঙে গেলে, এক বেলার মধ্যেই উঠোন ভ'রে যায় অসংখ্য পিঁপড়েতে। বোলতা আসে, আরও অনেক পোকা আসে। একটা ইস্কুলের ইমারৎ, এক ফোঁটা গুড়ের চেয়ে আর কত বেশি? বাঁ হাতে গোঁফে এবং ডান হাতে টিকিতে পাক দিতে

শুরু করলেন স্বর্ণবাবু। নিশ্চয়ই অনেক কিছু আয়োজন করছেন গোপীচন্দ্র। কি করছেন, সেটা জানার প্রয়োজন হয়েছে তাঁর। গ্রামের উন্নতি, দেশের উপকার, কীর্তিতে অনুরাগ, যে যাই বলুক, স্বর্ণবাবু জানেন—গোপীচন্দ্রের সকল আয়োজনের অর্থ কি? স্বর্ণবাবুর প্রতিষ্ঠা ও সম্মানকে ক্ষুণ্ণ ক'রে, খর্ব করে, গোপীচন্দ্রেব আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জনের জন্য। স্বর্ণবাবুর পক্ষে এ এক রকম জীবনমরণ-সমস্যা। এক রকম কেন, একেবারে সঠিক, স্থিব। তিনি ডাকলেন মালীকে, তিতুয়া! সহিসকে টমটম জুততে বল্।

*　　　*　　　*

নবগ্রামের বাজারের মধ্য দিয়ে চ'লে গিয়েছে পাকা সড়ক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেব রাস্তা। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পাকা সড়ক জেলার সদর-শহর থেকে বেরিয়ে এ জেলা অতিক্রম ক'রে পূর্ব দিকে অন্য জেলায় গিয়ে ঢুকেছে। গিয়ে থেমেছে গঙ্গার তটভূমি—প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ একটি বন্দরতুল্য স্থানে। স্বর্ণবাবুর টমটম বাজারের পাকা সড়কে এসে পশ্চিমমুখে মোড় ফিরল।

বাজারে বিকিকিনি শুরু হয়েছে। দোকানগুলির সামনে খরিদ্দারেরা দাঁড়িয়ে আছে। পথে লোক চলছে। স্বর্ণবাবুর টমটম দেখে দোকানীরা দোকানের বারান্দার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালে। খরিদ্দারেরাও অধিকাংশ স্থানীয় লোক, তাবাও ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে পথ ছেড়ে এক পাশে দাঁড়াল। স্মিতমুখে স্বর্ণবাবু মাথা নুইয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

হাজার হ'লেও নবগ্রাম শহর নয়; বাজারের পথের পাশে যাদের বাড়ি, তাদের মেয়েরা পথে বের হয়। মেয়েরা ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এ সম্মান স্বর্ণবাবুব পৈতৃক। তিনি এ সম্মানকে জন্মগত ভাগ্যফল ব'লে জানেন। গ্রামে আরও বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি আছেন, তাঁরাও জমিদার; প্রাচীন সরকার-বংশের মধ্যে অবস্থাশালী বংশলোচন আছেন, রাধাকান্তের জাঠতুতো ভাই শ্যামাকান্ত আছেন, সম্পদ এবং সম্পত্তির দিক দিয়ে তিনি স্বর্ণবাবুর চেয়েও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; রাধাকান্ত আছেন, তিনি অবশ্য জমিদার নন, জোতজমাসম্পন্ন গৃহস্থ, তবু তাঁরও সম্মান আছে; কিন্তু প্রতিষ্ঠায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নন, এবং গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা এই ভাবে প্রণাম জানিয়ে সকলকে সম্মান জানালেও, তাঁর ধারণা—তাঁকে যতখানি হেঁট হয়ে তারা প্রণাম জানায়, অন্য কাউকে ততখানি নত হয়ে প্রণাম জানায় না।

এই শ্রেষ্ঠ প্রণাম কেড়ে নেবার জন্য গোপীচন্দ্র আয়োজন করছেন। এ তাঁর জীবনমরণ-সমস্যা। এ সম্মান হানি হওয়ার চেয়ে সত্য সত্যই মৃত্যু শ্রেয়। কানের দুই পাশ তাঁর গরম হয়ে উঠল, ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঘোড়াটা বেশ দ্রুতগতিতেই চলছিল, তবু স্বর্ণবাবু মনের অধীরতায় চাবুকটা তুলে নিয়ে সপাসপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন ঘোড়াটার পিঠে। লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা দুলকি চাল ছেড়ে ছত্রকে লাফিয়ে চলতে লাগল। স্বর্ণবাবু ক'ষে লাগাম টেনে ধরলেন দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ ক'রে, নিষ্ঠুর আনন্দে। দুর্দান্ত জানোয়ারটাকে বাগ মানিয়ে মন তাঁর ঈষৎ তৃপ্ত হ'ল, সুস্থ হ'ল।

বাজার পার হয়ে সড়কটা চ'লে গিয়েছে। প্রথমেই খানিকটা ধানক্ষেত দু ধারে। তারপর একটা মজা দিঘির বুকের মধ্যে দিয়ে। দিঘিটার সীমানা পার হয়ে ওই ঊষর প্রান্তর, যে প্রান্তরে গোপীচন্দ্র ইস্কুল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন।

মজা দিঘিটার মুখে এসেই তিনি ঘোড়ার রাশ টেনে ধ'রে ঠোঁটে শব্দ ক'রে থামবার ইঙ্গিত করলেন। পিছন থেকে সহিসটা ছুটে এসে ঘোড়াটার সামনে দাঁড়াল, ঘাড়ে আদর ক'রে দুটো চাপড় দিয়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিলে।

এখানে মজুর জমায়েৎ হয়েছে অনেক। পাকা সড়কটা থেকে একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। মজা দিঘিটার মাঝামাঝি চ'লে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক; এই সড়কটাকে ধনুকের জ্যায়ের মত রেখে অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকিয়ে ধনুকের দণ্ডের মত নতুন সড়কটা তৈরি হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ারও দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

স্বর্ণবাবুর বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। অনুমানে তিনি বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। মজা দিঘিটা গোপীচন্দ্রের সম্পত্তি। মজা পুকুরটাকে কাটিয়ে পঙ্কোদ্ধার করার পথে একমাত্র বাধা দিঘির মাঝের এই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডর সড়ক। দিঘি-টার জলকর পাশে রেখে সড়কটাকে এই ভাবে অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকিয়ে দিতে পারলে, সে বাধা থাকবে না।

গাড়িটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বর্ণবাবু এক হাতে ঘোড়ার রাশ ধ'রে, অন্য হাতে গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করলেন। একজন মজুরকে বললেন, এরে, এই, ওভারসিয়ারবাবুকে ডাক্ তো।

মজুরেরা প্রায় সকলেই কাজ বন্ধ ক'রে সভয় সম্ভ্রমে স্বর্ণবাবুকে দেখছে; মজুরমেয়েদের চোখে অপরূপ বিস্ময় ফুটে উঠেছে। এটুকু স্বর্ণবাবুর বড় ভাল লাগে।

ওভারসিয়ারবাবু এগিয়ে এলেন। স্বর্ণবাবুকে তিনি চেনেন। তাঁর দায়িত্ব এই রাস্তা-মেরামতের কাজের জন্য, স্বর্ণবাবুর মত বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের চিনতে হয়; তাঁদের সহায়তা ভিন্ন মজুর এবং গরুর গাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না।

ধন্য দেশ! এ দেশকে ওভারসিয়ারবাবু ধন্য ধন্য করেন। বিংশ শতাব্দী নাকি পৃথিবীতে কলকারখানার যুগ। দুনিয়া ভ'রে গেল কলে আর মজুরে। কিন্তু এই উনিশ শো ছ সালে এ দেশে লোকে চাষ ছাড়া অন্য কিছুতে মজুর খাটবে না। তাও চালের মণ পাঁচ সিকে থেকে দু টাকা। টাকায় তেরো সের চাল, অর্থাৎ তিন টাকা মণ হ'লে, দেশে আকাড়া অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হয়েছে ব'লে হাহাকার ওঠে; চাষ ছাড়া মানুষ কিছু বুঝে না। চাষের কাজে স্থায়ী কৃষাণ-জীবিকা যাদের নাই, তারা শ্রমিক হিসেবে এই চাষেই খাটে। আর আছে বছরে একবার খুঁড়ো ঘরের চাল-ছাওয়ানোর কাজ। তাও বাবুর মত ব্যক্তিদের হুকুমে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে আসতে বাধ্য হয়; কারণ তাঁরা জমিদার; তারা আপন গ্রামের মধ্যেই মজুর-খাটার গণ্ডি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চায়। কেবল স্বর্ণ-জমিদার-দের হুকুম অমান্য করতে নাই—এইটেই চলিত শিক্ষা, এবং অমান্য করবার মত সাহস, সাহস দূরের কথা, কল্পনাও তারা করতে পারে না। তা ছাড়া নিজেদের গ্রামের গৃহস্থদের চাপ থেকে, অত্যাচার অবিচার থেকে বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই জমিদার। তাই ওভারসিয়ারবাবুর রাস্তা-মেরামতের কাজের প্রয়োজন হ'লে, ঠিকাদারকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হয় এঁদের কাছে। স্বর্ণবাবুর কাছে প্রতি বৎসরই তিনি আসেন। ঠিকাদার কখনও সদর শহর থেকে ভাল তামাক এনে দেয়, কখনও আনে গড়গড়া-ফুরসির নল, তাওয়াদার কলকে, কখনও আনে মোরব্বা—এমনই অল্পস্বল্প উপঢৌকন। এ ছাড়া বছরে লাগে একটা খাওয়া-দাওয়ার খরচ—একটা পাঁঠা, পোলাওয়ের চাল, ঘি, মিষ্টি। নুন তেল মসলার খরচ দিতে চাইলেও স্বর্ণবাবু প্রত্যাখ্যান করেন, ওগুলো ছোট জিনিস—আর লাগে 'কারণ' অর্থাৎ মদ। ওভার-সিয়ারবাবুরাও এ প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রণ পান। সেসব এক একটা মাই-ফেলি, অর্থাৎ মহফিলের কাণ্ড।

ওভারসিয়ারবাবু একটু চিন্তিত হয়েই এগিয়ে এলেন। এবার লোকজনের সাহায্যের জন্য স্বর্ণবাবুর কাছে তিনি যান নাই। প্রয়োজনও হয় নাই, অবকাশও ছিল এই নবগ্রাম থানার দারোগার লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ল। দারোগাবাবু এক ফেরারী আসামীর সন্ধানে দূর পল্লী-অঞ্চলে

যাচ্ছিলেন। পথে পড়ে ওই জমিদারবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে চ'লে গেলে ধ'রে এনে লাথি মারেন। তিনি তো সামান্য ডিস্ট্রিক্ট-না। কিন্তু না-যাওয়াটা অন্যায় হয়েছে। এতকাল পর্যন্ত স্বর্ণবাবুই এ বিষয়ে সাহায্য ক'রে এসেছেন, সে হিসেবে এটা তাঁর অকৃতজ্ঞতার কাজ হয়েছে। নৈতিক অপরাধ অন্যায় চুলোয় যাক, তাঁর পক্ষে এটা বিপদের কথা। স্বর্ণবাবুরা যত উদার, তত ভয়ঙ্কর। এঁদের দ্বারস্থ হ'লে এঁরা মাথায় করেন, কিন্তু দ্বারস্থ না হয়ে দরজার বোর্ডের ওভারসিয়ার! পুলিসের দারোগা পর্যন্ত এ বিষয়ে সাবধান হয়ে চলেন। বেশি দিনের কথা নয়, মাস কয়েক আগে স্বর্ণবাবুদের শ্রেণীর এক জমিদারের হাতে দেউড়ি। দেউড়ি মানে পলকা কাঠের আগড়। জমিদার খুব উল্লাস প্রকাশ ক'রে দারোগাকে আহ্বান করলেন। ফেরারী আসামী পালিয়ে যেতে পারে আশঙ্কায় ব্যস্ত দারোগাবাবু সে আহ্বান না রেখেই চ'লে যান। ফলে আসামী তো ধরা পড়লই না, উপরন্তু দারোগাবাবু নাজেহাল হয়ে যখন ফিরলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। দারোগা ফেরার পথে সরল বিশ্বাসে আশ্রয় নিলেন ওই জমিদারের বাড়িতে। জমিদার খাওয়ালেন প্রচুর—মদ্য মাংস পোলাও ইত্যাদি, এবং শীতের রাত্রে পাকা-মেঝে ঘরের মধ্যে পুরু বিছানা পেতে শোয়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। ক্লান্ত দারোগা এবং তাঁর সিপাহীরা শীতের রাত্রে বেশ আরামেই ঘুমুচ্ছিলেন। কিন্তু মধ্যরাত্রে প্রচণ্ড শীত বোধ হওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল। দেখলেন, বিছানাপত্র সব ভিজে সপসপে হয়ে উঠেছে। ঘর অন্ধকার, আলোটা কখন তেলের অভাবে নিবে গিয়েছে। দেশলাই জ্বেলে দেখলেন, ঘরের মেঝেতে জল। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, জল নির্গমের নর্দমার মুখও বন্ধ; জানালার একখানা পাল্লায় ছিদ্র ক'রে একটা টিনের নল পরিয়ে কেউ বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে জল ঢালছে। ভদ্রলোক দরজায় ধাক্কাধাক্কি ক'রে চীৎকার আরম্ভ করলেন। কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিলে না। ভদ্রলোককে সমস্ত রাত্রি ঘরের কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাটাতে হয়েছিল। সকালে জমিদারবাবু ফেরারী আসামীটিকে দারোগার হাতে সমর্পণ ক'রে বললেন, দিনের বেলা যখন আমি বলেছিলাম তখুনি যদি কষ্ট ক'রে এইখানে উঠতেন, তবে ব্যাটাকে কালই ধ'রে এনে দিতাম। রাত্রেও আপনাকে এত কষ্ট পেতে হ'ত না। নিয়ে যান ব্যাটাকে। লোকটাকে বললেন, যা ব্যাটা, ঘুরে আয় দিন কতক। তোর ছেলেপুলে পরিবার রইল, আমি রইলাম। তারপর দারোগা সিপাহীদের আবার একবার সর্দির ওষুধ খাইয়ে শরীর তাজা ক'রে বিদায় দিয়েছিলেন।

মাত্রাতিরিক্ত বিনয়সহকারে নমস্কার ক'রে গভীর সসম্ভ্রম প্রীতি ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে ওভারসিয়ারবাবু বললেন, ভাল আছেন?

প্রতিনমস্কারে স্বর্ণবাবু মাথাটা একটু নোয়ালেন মাত্র। গোঁফে তা দিতে দিতেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কি হচ্ছে এসব?

আজ্ঞে, রাস্তা।

হ্যাঁ, রাস্তা তো বটেই। কিন্তু পাশেই যেন ঘাট হবার আয়োজন হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে?

ওভারসিয়ার কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না, তিনি হাসতে লাগলেন; এমন রসিকজনোচিত উক্তি যেন তিনি এর পূর্বে আর কখনও শোনেন নাই।

স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, রাস্তাটা যাবে কোথায়? স্বর্গে, না নরকে?

আজ্ঞে, সড়কটাকে বেঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানে—

মানে, গোপীবাবু মজা দিঘিটা কাটাবেন, তাঁর সুবিধার জন্য দিঘির মাঝখানের রাস্তার অংশটা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আজ্ঞে, গোপীবাবুই সমস্ত খরচ বহন করছেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও রাস্তা-ঘাটের উন্নতির জন্য—

কত? কত টাকা দিয়েছেন? দানই বা কত, দক্ষিণাই বা কত? মানে, আপনারা কে কি পেলেন?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না স্বর্ণবাবু, হাতের ঝাঁকিতে ঘোড়ার পিঠে রাশের আছাড় দিয়ে চলবার ইঙ্গিত জানালেন। গাড়ি ছুটল।

ক্ষোভে দাঁতের উপর দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন ওভারসিয়ারবাবু, তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি মজুরদের উপর।—হারামজাদা ব্যাটারা, ছুঁচো শূয়ারের দল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে সব! ঠাকুর উঠেছে যেন! এতেও তাঁর ক্ষোভের নিবৃত্তি হ'ল না, সকলের চেয়ে কাছে ছিল যে লোকটা তার গালে তিনি বসিয়ে দিলেন এক চড়।—চালাও, কাম চালাও, শালা, শূয়ারকি বাচ্চা! চালাও, দশ পয়সা মজুরি চোদ্দ পয়সা হয়েছে, তবু ফাঁকি, তবু ফাঁকি?

* * *

গোপীচন্দ্র দশ পয়সা মজুরির রেট বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করেছেন। গ্রামে গ্রামে লোক পাঠিয়ে তিনি দীনদরিদ্রের দৈনন্দিন জীবনের চার পয়সা মূল্যবৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। জমিদারের প্রতিষ্ঠা এখনও তিনি অর্জন

করতে পারেন নাই; নিজে ব্যবসায়ী ব্যক্তি, কয়লার খনির মালিক, শুধু মালিকই নন, খনির সামান্য কাজ থেকে সকল কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। চাষ-জীবিকা ছাড়িয়ে সাঁওতাল ও বাউরীদের পয়সায় খেলা দেখিয়ে কি ভাবে খনির কাজে আনতে হয় তাও তিনি জানেন, তাই তিনি পাইক পেয়াদা পাগড়ি লাঠি উপেক্ষা ক'রে চার পয়সার উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এর ফল যে সুদূরপ্রসারী, তাও তিনি জানেন। প্রয়োজন হয় চোদ্দ পয়সাকে চার আনা করবেন তিনি।

ইট-পাড়াইয়েই রেট বাড়িয়েছেন দু আনা। ভাটা-সাজাইয়ের রেটও বেড়েছে। গাড়ির ভাড়া, তাও বাড়িয়েছেন। দু পয়সা থেকে দু আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি। রাজমিস্ত্রীর মাইনে বেড়েছে একেবারে চার আনা—ছ আনা থেকে দশ আনা। আবার মুরশিদাবাদ বেলডাঙা থেকে রাজমিস্ত্রী আসছে, তাদের মাইনে বারো আনা।

গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মজুরেরা এসেছে দলে দলে। এ অঞ্চলের মধ্যে জনপদতুল্য গ্রাম—নবগ্রাম। জমিদার এইখানে বাস করেন—স্বর্ণবাবু, শ্যামাকান্তবাবু, সরকারবংশীয় বংশলোচনবাবু এবং আরও ছোটখাটো কয়েকজন তাঁদের বাড়িতে তারা পালেপার্বণে বেগার দিতে আসে; উৎসবের সমারোহে রবাহূত হয়ে এসে উৎসবক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে উপভোগ করে উৎসবের আনন্দ; জমিদারের নির্দেশমত প্রয়োজনে মজুর খাটতেও আসে; এইখানেই অর্থশালীদের বাস, তাঁরাই মহাজন। তাঁদের কাছে অল্পস্বল্প প্রয়োজনে যেতে পারে না, যায় তাঁদের অন্দরের দরজায়, বাড়ির মেয়েরা এসব 'পেটী' মহাজনি করেন, থালা-ঘটি বন্ধক রেখে টাকা ধার দেন, সুদ টাকায় মাসিক দু পয়সা থেকে চার পয়সা, অনেক ক্ষেত্রে নেপথ্যে গাই-গরু বন্ধক দেয় অর্থাৎ গরু থাকে খাতকের বাড়িতেই, সেই খাওয়ায়, পালন করে, সুদ বাবদ দুধের একটা অংশ দিতে হয়; গাই যখন দুধ বন্ধ করে তখন সুদ চলে পয়সার চাকায়। এই নবগ্রামেই এ অঞ্চলের বাজার হাট, এখানে তারা কাপড় কিনতে আসে, হাটে ঘরের তরিতরকারি বেচতে আসে, মসলাপাতি কিনে নিয়ে যায়; দেশে আকাড়া হ'লে তারা এখানে প্রসাদের জন্য আসে; রোগে অথবা বয়সে যারা জীর্ণ হয়, তারা এখানে নিত্য আসে ভিক্ষার জন্য, উচ্ছিষ্টের জন্য। কিন্তু এমন ভাবে চারিদিকের গ্রাম থেকে সকলে একসঙ্গে কখনও এই ভাবের মজুরি খাটতে আসে না। এ অঞ্চলে এমন বিপুল খরচের ক্ষেত্র কেউ কখনও খোলে নাই; এইভাবে ষোল আনা মজুরি, ষোল আনা কাজ—এ রেওয়াজ কেউ প্রবর্তন করে নাই। ইচ্ছা হয়

কাজ কর, অনিচ্ছা থাকে এসো না; জবরদস্তি নাই, এমন সম্মানজনক শর্তও কখনও তারা শোনে নাই।

পুরুষেরা এসেছে টামনা ফাওড়া নিয়ে; মেয়েরা নিয়ে এসেছে ঝুড়ি বিঁড়ে। খড়ের পাকানো বিঁড়ের উপর এরই মধ্যে তারা ন্যাকড়ার ফালি জড়িয়ে মনোহর ক'রে তুলেছে। পুরুষেরা টামনা-ফাওড়ার বাঁট কাচভাঙা দিয়ে চেঁচে চিকন ক'রে তুলেছে।

পথের পাশে কয়েকটা গাছ। গাছগুলির তলায় বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন জাতি ও দলের ছোট ছেলেমেয়েরা ব'সে আছে, খেলা করছে এবং ন্যাকড়ায়-বাঁধা খোরাবাটিতে-আনা খাবার পাহারা দিচ্ছে।

ওরা কাজ করছে, সে কাজ করার মধ্যেও যেমন একটি নতুন ধরনের শৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তেমনিই চালে-চলনেও দেখা দিয়েছে একটা নতুনতম ভাবভঙ্গী; স্বর্ণবাবুর মনে হ'ল, এটা উচ্ছৃঙ্খলতা; পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হ'ল, না, এ তার চেয়েও বেশি, বেয়াদপির চাল। পুরুষগুলো হি-হি ক'রে হাসছে দাঁত মেলে, মেয়েগুলো চলছে হেলে দুলে।

স্বর্ণবাবু ঘোড়ার রাশ আবার টেনে ধরলেন। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। কে? কে? কে এই মেয়েটা?

পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে একটা। নিপুণ ভাস্করের হাতে তৈরি কষ্টিপাথরের বাসুদেব মূর্তির পাশে চামরধারিণী। ক্ষীণকটি নিটোলদেহ দেবদাসীর মত অবয়ব; এক হাতে মাথার ঝুড়ি ধ'রে মেয়েটা ঈষৎ হেলে দাঁড়িয়েছে; ওর দেহে কটিতটে ফুটে উঠেছে সেই দেবদাসীর মতই বঙ্কিম ভঙ্গিমা—সেই লাস্য। আর একজনের সঙ্গে মাথায়-বোঝাই ঝুড়ি বদল ক'রে খালি ঝুড়িটা হাতে নিয়ে সে ফিরল। কালো নিটোল মুখে বড় বড় দুটি চোখ। আঁটসাঁট-ক'রে-পরা কাপড়খানা দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে বসেছে। মাথায় কাপড় নাই মেয়েটার, ঝিউড়ি মেয়ে নিশ্চয়। মাথার চুলগুলি ভ্রমরের মত কালো এবং কোঁকড়ানো।

কে এ মেয়েটা?

পিছন থেকে সহিসটা মৃদুস্বরে বললে, ও আমাদের গাঁয়েরই। সাতকড়ে বাউরীর বুন—পরী।

হুঁ।

তাই বটে। মেয়েটা সত্যিই তো চেনা। ছোট অবস্থায় দেখেছেন। দু-তিন বৎসর দেখেন নাই, সম্ভবত শ্বশুরবাড়িতে ছিল। মেয়েটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে এই দু-তিন বৎসরের মধ্যে। ওই যে সাতকড়ের মা রয়েছে

এদের মধ্যে। আরও অনেককে চিনলেন, কুলীন বাউরী, বাঁকা বাউরী, বিন্দাবন, সাতকড়ে, নকড়ে, যগন্দ, কালাচাঁদ, অটল—সব এসেছে খাটতে। গোষ্ঠবালা, সত্যদাসী, সুরধুনী, ভজুদাসী, ললিতে, গোপালীবালা, সিধুবালা, মধুমতী, ময়না—বাকি আর কেউ নাই। সব এসেছে। সামনে একসারি গাড়ি আসছে। গাড়োয়ানদের সহজে চেনা যায় না, কালিতে সর্বাঙ্গ ভ'রে গেছে। সম্ভবত কয়লা ঢালাই করছে; সাত মাইল দূরবর্তী রেল-স্টেশন থেকে ইঁট পোড়াবার জন্য কয়লা ব'য়ে আনছে। ক্রমে তাদের চিনলেন স্বর্ণবাবু। পাশের মুসলমানের গ্রাম—ব্যাপারীপাড়ার অধিবাসী এরা। ব্যাপারীপাড়ার জমিদারির অংশ তাঁরই সবচেয়ে বেশি, এবং প্রতাপে তিনিই প্রায় একচ্ছত্র। এই যে, দিলদার শেখ সর্বাগ্রে! দিলদার—দিলুই ওদের মাতব্বর। দিলদারের পিছনে নাদের, তারপর গফুর, ফাজিল, ইদু, মাতাহর, ওসমান, বাহারুদ্দিন, হোসেনী—প্রত্যেককে তিনি চেনেন।

দিলু শেখ গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে, কালি-মাখা কালো মুখে সাদা দাঁত বার ক'রে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলে, সালাম হুজুর।

দিলুর পিছনে পিছনে সকলে নামল গাড়ি থেকে। গাড়ির সারিটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল। ইঙ্গিতে মাথা হেলিয়ে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে স্বর্ণবাবু স্তব্ধভাবে টমটমের উপরে ব'সে রইলেন। ওদিকে ওরা কারা? ওই দূরে, যেখানে পাশাপাশি তিনটে প্রকাণ্ড ইঁট ভাটার সর্বাঙ্গ থেকে মাটির প্রলেপের ফাটল দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে, তার পাশেই যেখানে ইঁটের জন্য মাটি কাটা হচ্ছে, সেখানে ইঁট-পাড়াইয়ের কাজে পারদর্শী শেখের পাড়ার হাবু শেখ, হেদায়েৎ, রহমৎ, হাফিজ, এদের তিনি ধোঁয়ার আবছায়ার মধ্যেও চিনতে পারছেন। তার পাশে? মাটির কাজে ওস্তাদ, দেবীপুরের বাগদীর দল নয়? হ্যাঁ, ও যে, বিরাট চেহারার লোকটা নাচের ভঙ্গীতে পায়ে পায়ে মাটি ছাঁটছে, ওই তো নকুড় বাগদী।

স্বর্ণবাবুর চারিদিকে সেলাম পড়ছে, সেলামির মত।

সালাম হুজুর।

সালাম গো বাবু।

সালাম কর্তা।

সালাম।

সালাম।

সালাম হুজুর। সকালবেলা কোথা যাবেন বাবু?

সালাম মালিক। হাওয়া খেতে বেইরেছেন হুজুর?

পেনাম বাবুমশায়।

পেনাম।

মুসলমান গাড়োয়ানদের দেখাদেখি, বাউরী হাড়ী ডোম মজুরের দল এগিয়ে এসে প্রণাম জানাচ্ছে।

একটু দূরে পাশাপাশি তিনটে লম্বা খড়ের চালা তৈরি হয়েছে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন মুসলমান। এই—এই কয়লার গাড়ি, এখানে, এই—এখানে ঢাল্ সব। ওখানে ওই ইট-খোলায় যাবে না। এইখানে—। লোকটি স্বর্ণবাবুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল!—আদাব বড়বাবু।

লোকটির আপাদমস্তক ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন স্বর্ণবাবু। এখানকার সালেবেগ মির্জা। জোতজমাসম্পন্ন চাষী গৃহস্থ। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় প'রে, গায়ে একখানা চাদর দিয়ে, একজোড়া খসখসে বহুকালের পুরনো চটি পায়ে দিয়ে, নবগ্রামের দক্ষিণপাড়ায় আসত খাজনা দিতে, খাতকের কাছে ধান টাকা আদায়ের নালিশ নিয়ে, জমি কিনে বিক্রেতার নাম খারিজ ক'রে নিজের নামে দাখিলা নেবার আরজি নিয়ে। তার গায়ে আজ পিরান, পায়ে একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো।

তবিয়ৎ ভাল হুজুরের? কোথায় যাবেন?

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি এখানে সালেবেগ?

হেসে মের্জা বললে, গোপীবাবু অনেক ক'রে বুললেন, কাজ-কাম আমার অনেক হবে, মের্জা, তুমাকে দেখেশুনে দিতে হবে।

হুঁ। অনেক কাজ হবে, না?

আজ্ঞা হাঁ। এলাহি কাণ্ড-কারখানা। ছ-সাত লাখ ইটা হবে। তাও আপনার পগমিল বসিয়ে, মাটি বানিয়ে বাক্স ফর্মায় পাড়াই হবে। ইস্কুল হবে, বোর্ডিং হবে—

পুকুর কাটাই হচ্ছে না?

আজ্ঞা হাঁ।

মজা পুকুরের মধ্যে দিয়ে এই যে নালাটা চ'লে গিয়েছে, এটা থাকবে তো?

আজ্ঞা, তা ঠিক—

সারি সারি চালার ওপাশ থেকে এই মুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন গোপীচন্দ্র, তাঁর সঙ্গে সরকার-বংশীয় লচুকাকা—বংশলোচনবাবু। স্বর্ণবাবু ঘোড়ার পিঠে রাশের আছাড় দিলেন।

গোপীচন্দ্র তাঁকে সম্ভাষণ জানাবার পূর্বেই ঘোড়াটা চলতে আরম্ভ করল। বংশলোচন উচ্চকণ্ঠে বললেন, আরে—আরে স্বর্ণভূষণ যে! দাঁড়াও হে, দাঁড়াও, থাম। বলি, আজকাল কি দৃষ্টি খারাপ হয়েছে, না, দৃষ্টি আজকাল উচ্চমার্গে, মানে আকাশে চোখ তুলে চলছে? মাটির মনুষ্যকে দেখতেই পাও না?

স্বর্ণবাবু টেনে ধরলেন একটা রাশ, ঘোড়াটার মুখ বেঁকে গেল, সে ঘুরল গাড়ি নিয়ে। তিনি হেসে বললেন, তুমি এখানে লচুকাকা? ঘোড়ার রাশ সহিসের হাতে দিয়ে তিনি নামলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, এস এস। লচুকাকা এসেছিলেন এই ইস্কুলের সব ব্যবস্থা দেখতে। তোমরা সকলে না এলে, আমি একা কি করব বল? দশজনের কাজ—

লচুকাকা বললেন, নিশ্চয়। 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। তা আমাদের এ গ্রামে তো দশের সে প্রবৃত্তি নাই। হিংসা—হিংসা—হিংসা—কেবল হিংসা! পুড়ে খাক হয়ে গেল সব।

স্বর্ণবাবু গোঁফের সঙ্গে আবার টিকিতে পাক দিতে শুরু করলেন, হেসে বললেন, তুমি পণ্ডিত লোক লচুকাকা। ঠিক ধরেছ।

বংশলোচন বললেন, বাবু আমাদের চিমটি কাটতে সিদ্ধহস্ত! স্বর্ণ, তুমি ভাল ক'রে নখ কেটো বাবা।

স্বর্ণবাবু বললেন, গুরুর দিব্যি লচুকাকা, এ যদি তোমার চিমটি মনে হয় তো নখ আমার নয়, এ নখ আমাদের রাধাকান্তদাদার। আমি তো এত শাস্ত্র-টাস্ত্রর ধার ধারি না, তুমি জান। রাধাকান্তদাদাই সেদিন বললে—পণ্ডিতের লক্ষণই হ'ল, স্বর্ণ, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু', সমস্ত জগৎকেই তারা নিজের মত দেখে।

বংশলোচন বললেন, তার মানে, হিংসে আমারই! তাই আমি দুনিয়া-জোড়া কেবল হিংসেই দেখছি। তা বেশ, উত্তম কথা। কিন্তু তুমি এমন ক'রে পলায়ন করছিলে কেন? তোমার পালানো দেখে আমার রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা মনে প'ড়ে গেল। রামের বাণে রাবণের মুকুট কাটা গেলে রাবণ অমনই ক'রে পালিয়েছিল।

সেইজন্যেই বুঝি তুমি লাফ দিয়ে আমাকে ধরবার চেষ্টা করছিলে?

বা—বা—বা! বলিহরি—বলিহরি—বলিহরি—! এই না হ'লে আক্কেল! কাকাকে তো হনুমানই বলতে হয়।

গোপীচন্দ্র মনে মনে ব্যাপারটা উপভোগ করছিলেন না এমন নয়, কিন্তু

তবু তিনি অস্বস্তিও অনুভব করছিলেন। এই নবগ্রাম-সমাজের শিক্ষা-সংস্কারের মধ্যেই তাঁর জীবন গণ্ডিবদ্ধ নয়, নবগ্রামের বাইরে সুবিস্তৃত দেশব্যাপী ক্ষেত্রে তিনি ঘোরাফেরা করেন; ব্যবসাসূত্রে দেশ থেকে দেশান্তরে,—ভারতবর্ষ থেকে ব্রহ্মদেশ আফ্রিকা ইংলণ্ড পর্যন্ত তাঁর জীবন-ক্ষেত্র পরোক্ষভাবে প্রসারিত। এই ধারার বক্রোক্তির মধ্যে তাঁর নবগ্রাম-সমাজপীড়িত মন তৃপ্তিলাভ করলেও তাঁর বৃহত্তর জীবন এবং মানসিকতা এতে অস্বস্তি বোধ না ক'রে পারলে না। গোপীচন্দ্র উভয়ের মধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, এস এস ভাই স্বর্ণ। আসুন লচুকাকা, ইস্কুলের জায়গাটা আর প্ল্যানটা স্বর্ণ-ভায়াকে দেখাই। ওসব কথা মজলিসে ব'সে হবে। পথের মধ্যে—দশজন ইতর শুনবে, ওরা আবার গিয়ে এই নিয়ে পাঁচ কথা কইবে।

স্বর্ণবাবু বললেন, আজ থাক্ দাদা। আজ আমার বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে। নেহাত লচুকাকা পেছনে কামড় দিয়ে ডাকলে—

বংশলোচন বললেন, লচুকাকার পেছনে কামড়ানো অভ্যেস নাই হে, লচুকাকা কুকুর নয়। পেছন ফিরে পালাচ্ছিলে, পেছনে হাত দিয়ে ডাকলাম, তা পশ্চাদ্‌ভাগে যে তোমার ঘা আছে, সে আমি কি ক'রে জানব?

স্বর্ণবাবু ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে গোপীচন্দ্রকে বললেন, আচ্ছা, আমি চলি এখন গোপীদা।

বংশলোচন ছাড়লেন না, প্রশ্ন করলেন, যাবে কোথায় শুনি? যাবে তো বাড়ি, তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? এসেছিলে তো কাণ্ডকারখানা দেখতে, তা দেখেই যাও ভাল ক'রে।

নিজেকে সংযত ক'রে স্বর্ণবাবু বললেন, সিদ্ধিলাভ কবে করলে বল দেখি? মানুষের মুখ দেখেই সব ব'লে দিচ্ছ দেখছি! আমি কিন্তু বাড়ি যাচ্ছি না। যাব মামুদপুর স্টেশন।

মামুদপুর স্টেশন? কোথায় যাবে? মালপত্র কই?

এই দেখ। স্টেশনে গেলেই যে আমাকে কোথাও যেতে হবে, তার মানে কি? কেউ আসতেও তো পারে!

সে তো গাড়ি পাঠালেই পারতে, এমন কে লাটসাহেব আসছেন যে, স্বয়ং হুজুর চলেছেন আগু বাড়িয়ে আনতে?

স্বর্ণবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, লাটসাহেবকে আনতে যাচ্ছি না, লাট-সাহেবের কাছে তার করতে যাচ্ছি। এই 'লড়িয়া' পুকুর কাটানো হচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে যে নালা রয়েছে, সে বন্ধ হ'লে অনেক জমির চিরস্থায়ী ক্ষতি হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, ন্যায্য সিচ আমি বজায় রাখব স্বর্ণভূষণ।

স্বর্ণ বললেন, তা ছাড়া, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা এই ভাবে ঘুরিয়ে দেওয়াতে আমাদের আপত্তি আছে, তাও জানাব।

তোমাদের মানে? তুমি আর কে কে হে? রাধাকান্ত?

রাধাকান্তের কথা ব্রজবাসীবা, মানে, বৈষ্ণবেরা জানেন। তার অর্ধেক কথা আমি বুঝতেই পাবি না, বরং তুমি পার; কারণ তোমার বৈষ্ণব মন্ত্র। 'ক' বলতে কেষ্ট মনে প'ড়ে তোমার চোখে জল আসে দেখতে পাই। গ্রামে রাধাকান্ত ছাড়াও লোক আছে লচুকাকা।

স্বর্ণবাবু গাড়িতে উঠে ঘোড়ার পিঠে শিথিল রাশের আছাড় দিয়ে ইঙ্গিত দিলেন। পিছনের সহিসটা লাফিয়ে উঠে বসল। গাড়িটা মসৃণ গতিতে বেরিয়ে গেল।

* * *

পাকা সড়কের ধারেই ইস্কুলের বনিয়াদ কাটা হচ্ছে। গাড়ি থামিয়ে দেখবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু সে ইচ্ছে দমন করলেন স্বর্ণবাবু। চলন্ত গাড়ি থেকেই দেখলেন। বড় ইমারৎ হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে তিনি পারলেন না। মনে মনে নিজের ইষ্টদেবী জগদ্ধাত্রীকে স্মরণ ক'রে বললেন, মা তোমার পূজায় তো এতটুকু অঙ্গহানি আমি করি না। জীবনে তো কোনদিন তোমায় স্মরণ না ক'রে জলগ্রহণ করি না। তবে?

সবই ভাগ্য। মনে হ'ল, রাধাকান্তদা প্রায়ই বলেন, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। বিদ্যা, পুরুষকার—সবাই হার মানে ভাগ্যের কাছে। পুরাণে আছে, শ্রীবৎস রাজার হাতের পোড়া শোলমাছ জীবন্ত হয়ে জলে পালিয়েছিল। শনিপূজার ব্রতকথায় আরও বিচিত্র কথা রয়েছে, কাঠের ময়ূরে সোনার হার গিলে ফেলেছিল, যার জন্যে রাণীকে পেতে হয়েছিল চোর অপবাদ, আশ্রয়চ্যুত হতে হয়েছিল। তাঁর নিজের কোষ্ঠীর কথা মনে হ'ল। পাপগ্রহের দশা চলছে এখন। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা আসবার কথা আছে। ত্রিপাপের বৎসর আসবে। গোপীচন্দ্রের কোষ্ঠীর কথা তিনি শুনেছেন। শনি এবং মঙ্গল তুঙ্গি আছে গোপীচন্দ্রের। পাপগ্রহের সাহায্যে গোপীচন্দ্রের এই বৃদ্ধি। তা হোক। যত পাপ সহায়তা করুক গোপীচন্দ্রের এবং তাঁর নিজের সময় যত খারাপই হোক, তিনি কাপুরুষের মত ঘরে ব'সে বৃথা আক্ষেপ করতে পারবেন না। বাধা তিনি দেবেনই। যে দিক থেকে হোক, যেমন ভাবে হোক, বাধা দিতেই হবে।

ছয়

"ভাগ্যকে মানিলে কোন কথাই থাকে না, শাস্ত্রেই নির্দেশ আছে 'ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্'। ভাগ্য এখানে বিধাতার অভিপ্রায়, মহাবীর কর্ণের সকল পুরুষকার, সকল তপস্যা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। একালে ভাগ্য সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয় জাগিয়াছে। অনেক ইংরাজী-শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির মুখেই এ কথা শুনিতে পাই। আমি সৌভাগ্যহীন, পুরুষকার আমার বলবান নয়, ইংরাজী-বিদ্যাও আমি অধ্যয়ন করি নাই। সুতরাং আমার ভাগ্যে বিশ্বাস না-করিয়া গত্যন্তর কোথায়? স্বর্ণও ভাগ্য মানে, ইংরাজী-বিদ্যা সে আমাপেক্ষাও কম জানে, তাহার পুরুষকারের শক্তি কতখানি তাহা আমি জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাহার পুরুষকারের দম্ভের পরিমাণ অতি প্রবল। সেই কারণেই আমি তাহার জন্য শঙ্কিত হইয়াছি যে, তাহার সংকল্প তো সিদ্ধ হইবেই না, উপরন্তু সে সংসারে উপহাসের পাত্রে পরিণত হইবে। হয়তো কাল তাহার এই বিরোধিতার জন্য তাহার নামে ও জীবনে কালি লেপন করিয়া দিবেন। গোপীচন্দ্রের এই উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগে কোন বাধাই কার্যকরী হইতে পারে না। কারণ ইহা কালের অভিপ্রায় বলিয়া অনুমিত হইতেছে।"

বৈঠকখানার সামনে বাগানের মধ্যে একটি বেদীর উপর ব'সে রাধাকান্ত নিজের ডায়রি লিখছিলেন। কলম থামিয়ে তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। ঠিক এই সময়েই সাজি এবং আঁকশি হাতে এসে বাগানে ঢুকলেন সন্তোষ মুখুজ্জে—স্বর্ণবাবুর ভগ্নীপতি। ছোটখাটো মানুষ, সোনার মত সুগৌর গায়ের রঙ, কাঁচা-পাকা চুল, সৌম্য সুদর্শন ব্যক্তি। রাধাকান্ত মধ্যে মধ্যে বলেন, নামটা আপনার চেহারার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়েছে মুখুজ্জে।

মুখুজ্জে হাসেন, রাধাকান্ত এর পর কি বলবেন, তিনি তা জানেন। রাধাকান্ত বলবেন, সন্তোষ না হয়ে প্রসন্ন হ'লেই নির্ভুল নিখুঁত হ'ত। প্রসন্নবাবু কে?—এ প্রশ্ন কেউ করলে অনায়াসে বলা যেত, চেহারা দেখে বেছে নাও।

সন্তোষ মুখুজ্জে আজ বাগানে ঢুকেই বললেন, জয় রাধাকান্ত!

রাধাকান্ত মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললেন, আসুন আসুন, অন্তরে আসন গ্রহণ করুন।

মুখুজ্জে বললেন, বাঁড়ুজ্জে, ধনকামী যশোকামী প্রতিষ্ঠাকামী সর্ববিধ কামীর অন্তরে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। কারণ আমার প্রকৃতি শীতল, কামীর অন্তর উত্তপ্ত—সেই হেতু ওখানে প্রবেশমাত্র আমার বিলুপ্তি ঘটে।

তারপর একটু হেসে বললেন, রাধাকান্তবাবু, যদি বা কোন কালে আপনার অন্তরে সন্তোষের সংস্থান হয়ও, স্বর্ণের আশা নাই।

রাধাকান্ত এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। সন্তোষ মুখুজ্জে কুলীন-সন্তান, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশধর। স্বর্ণের বাবা কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, কুলীন। মেয়েদের বিবাহ দিয়ে তিনি জামাতাদের ঘরে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, প্রত্যেককে বাড়িতে দুখানি হিসাবে ঘর, কিছু জমি, কিছু জমিদারির মুনাফা, পুকুর প্রভৃতিতে কিছু অংশ দিয়ে ছেলেদের সঙ্গে শরিক ক'রে দিয়ে গেছেন। অন্যথায় এই সব কুলীনসন্তান জামাতারা এখানে থাকবেন কেন? বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কাল—একালে এখনও সমাজে পাত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় কুল-বিচারে। দুষ্কুল হতে কন্যা আনতে দোষ নাই। কিন্তু কৌলীন্যমর্যাদাহীন পুরুষ সম্পদ শিক্ষা স্বাস্থ্য রূপ সমস্ত থাকতেও সুপাত্র ব'লে গণ্য হয় না। প্রতি কালেরই এক-একটি জীবনবোধ বা দর্শন আছে, সেই অনুযায়ীই সাধারণ মানুষ চলে, সমাজপতিরা সেই দর্শনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আদর্শ স্থাপন ক'রে এই কালধর্মকে সনাতন মানবধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সমাজে বরণীয় এবং স্মরণীয় হয়ে থাকবার চেষ্টা করেন। স্বর্ণের বাপও তাই ক'রে গেছেন, লোকে আজও তাঁর নাম স্মরণ ক'রে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে, কিন্তু সম্পত্তির অংশীদার হিসাবে সন্তোষবাবু এবং স্বর্ণবাবু পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন নন। এই কারণেই রাধাকান্ত সন্তোষ মুখুজ্জের এ মন্তব্যের উত্তরে নীরব হয়ে রইলেন। মুখুজ্জে ফুল তুলতে তুলতেই কথা বলছিলেন, কথার কোন জবাব না পাওয়ায় তিনি মুখ তুলে রাধাকান্তের দিকে তাকালেন, তাকিয়েই বুঝতে পারলেন রাধাকান্তের মনোভাব। ফুল তোলা বন্ধ ক'রে তিনি ধীরে ধীরে এসে সাজি আঁকশি নামিয়ে রাধাকান্তের পাশে ব'সে বললেন, ও একটা পাষণ্ড রাধাকান্তবাবু—মহাপাষণ্ড। জান, গোপীচন্দ্রবাবু হাই-স্কুল করছে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাকে খাতির করে শেকহ্যাণ্ড করেছে, সামনে চেয়ারে বসতে বলেছে, এর জন্য লোকটা হিংসায় ফেটে যাচ্ছে! প্রতি

রাত্রে মদ্যপান ক'রে যা চীৎকার আর গালাগাল করছে, সে কি বলব তোমাকে!

কাকে? গোপীচন্দ্রকে?

না। সে সাহস কোথায়? বাড়ির লোককে, চাকর-বাকরকে, আমাকে তোমাকে। কাল নাসের শেখ চাপরাসীর টুঁটি টিপে ধ'রে সে এক কাণ্ড!

নাসের শেখ চাপরাসীর গলা টিপে ধরেছিল? কেন?

মদ্যপান ক'রে অক্ষম হিংসায় মানুষ দেওয়ালে মাথা ঠোকে রাধাকান্তবাবু।

আপনি বলছেন—শুধু শুধু; কোন কথাবার্তা নাই—স্বর্ণ মদ খেয়ে হঠাৎ নাসেরেব গলা টিপে ধরলে?

না, ঠিক তা নয়। একটু কথা ছিল। স্বর্ণভূষণ হুকুম দিয়েছিল নাসের শেখকে যে, মজুর লাগিয়ে গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকে যে রাস্তাটা ইস্কুলডাঙার দিকে গেছে, ওই রাস্তার পাশে স্বর্ণবাবুর যে জমি রয়েছে সেই সব জমির পাশে কোঁঙাকাঁটার গাছের বেড়া লাগাতে। মানে বুঝেছ? ওই কোঁঙার গাছগুলি ঝাড় বাঁধলে রাস্তাটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। নাসের হুকুম তামিল করতে গিয়েছিল, কিন্তু—। হাসলেন সন্তোষ মুখুজ্জে।

কিন্তু কি? গোপীচন্দ্র উঠিয়ে দিয়েছেন?

উঠিয়ে দিতে চাইলেও নাসের কোথাও থেকে ওঠে না, ওকে জখম অবস্থায় উঠিয়ে আনতে হয়। গোপীচন্দ্র এখানে নেই। তিনি কাল রাত্রে কলকাতা গেছেন। তিনি থাকলে হয়তো তাই হ'ত।

তবে?

বেচারা নাসের নিজে থেকেই উঠে এসেছে। কতকগুলি ছেলে গিয়েছিল ইস্কুলের আয়োজন দেখতে। ইট পুড়ছে, পুকুর কাটানো হচ্ছে—ছেলেরা এখন ওখানেই যায় সকালে বিকেলে। ছেলেরা রাস্তার ধারে কোঁঙাগাছ লাগাতে দেখে নাসেরকে বলে, এ কি হচ্ছে শেখজী?

* * *

দশ-বারোটি বারো-তেরো বছরের বয়সের ছেলে। তিন-চারটি আরও অল্পবয়সী ছেলেও ছিল। রাধাকান্তের ছেলে গৌরীও এদের মধ্যে একজন। গ্রাম থেকে বেরিয়েই হাত চারেক চওড়া একটি গোপথ। এক পাশে পর-পর তিনটি পুকুর, অন্য পাশে জমি। এই গোপথটিকে প্রশস্ত এবং উঁচু ক'রে তৈরি করবার কল্পনা করেছেন গোপীচন্দ্র। এ দিক দিয়ে ইস্কুল গ্রামের খুব কাছেই হবে। অন্যথায় গোটা গ্রাম ঘুরে যাওয়া-আসা করতে

হবে। তা ছাড়া তাঁর নিজের সমস্যা আরও জটিল। গ্রামের প্রায় সকলেই এখানে পদাতিক। যে কয়েক ঘর অবস্থাপন্ন আছেন, তাঁর বিশেষ উপলক্ষে কোথাও যেতে হ'লে যান পালকিতে। এবং পূর্বকাল থেকে তাঁরা গ্রামের মধ্যবর্তী প্রধান রাস্তাটির সম্মুখ ভাগ দখল ক'রে ব'সে আছেন। সদর রাস্তা থেকে গোপীচন্দ্রের বসতবাড়িতে আসতে হ'লে আসতে হয় একটি দীর্ঘ গলিপথ ধ'রে। এই গোপথটি কিন্তু একেবারে গোপীচন্দ্রের অন্দরের পশ্চিম দিকের দরজায় এসে পৌঁচেছে। সেই হিসাবে এ পথটি তৈরি হ'লে তাঁর জুড়ি, কি টমটম, একেবারে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতে পারবে। গোপীচন্দ্রের মনে কোন্ হিসাবের গুরুত্ব বেশি সে তথ্য তিনিও হয়তো সঠিক বলতে পারবেন না, কিন্তু এ রাস্তাটি ভাল ক'রে তৈরি করবার অভিপ্রায়ের প্রেরণার মূলে যে দুটি উদ্দেশ্যই আছে—এ কথা নিঃসন্দেহ। স্বর্ণবাবু দুই উদ্দেশ্যেরই বিরোধী। নাসের শেখ এটুকু জানত না। সে জানত, গোপথের পাশের জমির ধান গরুতে খায়, অপচয় করে, সেই হেতু গরু ছাগল আটকাবার জন্য বেড়া দেওয়ার হুকুম হয়েছে। কোঁড়াকাঁটার গাছ গরু ছাগল খায় না, কেরাফুলের পাতার মত গড়ন, অথচ কেয়াপাতার চেয়ে অনেক বেশি চওড়া ও মোটা পাতা এবং গাছগুলির তেমনি কি জীবনশক্তি! মাটিতে ফেলে রাখলেও সেই অবস্থাতেই সে মাটির মধ্যে শিকড় চালিয়ে দিয়ে বাঁচে এবং বাড়ে। এ ছাড়া কোঁড়াগাছের সঙ্গে সাপের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ; কেয়াগাছের তলায় সাপ বাসা বাঁধে, সেটা কেয়াফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে নয়, এই জাতীয় গাছের মূলের আশে-পাশে মাটি এমনি ফোঁপরা হয় যে, সাপ পায় তৈরি-করা ঘর, মাঠের সাপ এখান ওখান থেকে এসে কোঁড়াগাছের বনের মধ্যে প্রায় উপনিবেশ স্থাপন ক'রে ফেলে। জন্তু জানোয়ার জন্মগত বোধ দিয়ে এ তথ্য জানে, তাই কোঁড়া দেখলে সে পথে তারা হাঁটে না। নাসের ভেবেছিল, কোঁড়াগাছ লাগিয়ে বাবু গোপথের খানিকটা অংশ এই ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ আত্মসাতের সুযোগ নেবেন। সে কোঁড়ার গাছ লাগানো শুরু করিয়ে পরমানন্দে গাছতলায় ব'সে একখানা পাকা বাঁশের মোটা কঞ্চি ছুরি দিয়ে কেটে ছড়ি তৈরির কাজে নিমগ্ন ছিল। ছেলেদের দলটি ইস্কুল-ডাঙা অভিমুখে বেরিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তাটি ইতিমধ্যে সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তার উপর কাঁটাগাছ স্তূপীকৃত হয়ে রাস্তার উপর প'ড়ে রয়েছে, শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করবার মত আয়োজনও রয়েছে। লোকজন, কীট-পতঙ্গ, পতঙ্গভুক পাখির দল উড়ে বেড়াচ্ছে। তারা দাঁড়িয়ে গেল।

একজন বললেন, এ কি হচ্ছে শেখজী?

নাসের মুখ না তুলেই বললে, দেখতে পাছ না কি হছে? বেড়া—বেড়া হছে।

কেন? বেড়া দেবে কেন?

বুড়ো নাসের ছেলেদের বড় ভালবাসে, সে হেসে বললে, ছড়া জানছ না? অ্যাঁ? কি রকম তোমরা?

কি ছড়া?

আমার গল্প ফুরাল, নটেগাছটি মুড়াল। হাঁ নটে, তুই মুড়ালি ক্যানে? তোর গুরুতে খায় কেনে? নাসের হেসে বললে, গরুতে ধান খায় ক্যানে? নাসের গম্ভীর রসিক ব্যক্তির মত আত মৃদু হেসে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মুখুজ্জেদের খোকা—কিশোরের খুড়তুত ভাই, সে খুব আইনজ্ঞ এবং তার্কিক। সে বললে, বারে বাঃ। গরুতে ধান খায় তো আমরা কি করব?

নাসের বললে, তোমরা খুদি পিঁপড়া মার গিয়া। পিঁপড়াতে না কামড়ালি পরেই আর ছাওয়ালে কাঁদবে না। ছাওয়াল না কাঁদলি পরেই বউয়েরা ভাত রাঁধবে। রাখালকে ভাত দিবে। ভাত পালি পরেই রাখালে গরু আগুলি রাখবে। তা হ'লেই আর গরুতে ধান খাবে না। তা হ'লেই আমরা বেড়া কেটে দিব।

খোকা বললে, ওসব আমরা শুনব না। আমরা যাব কোন্ দিকে?

যাবা কোন্ দিকে? ভালা বিপদ, এ গোনে তুমরা যাবা কোথা? এ পথে তো গরুতে যায় ঘাস খেতে!

আমরা ওই ডাঙায় যাব। ইস্কুলের ইট-পোড়া দেখতে।

হুঁ। তা পথ থেকে এখন সরায়ে দিছি কাঁটা।

এখন সরিয়ে দিলেই তো হবে না শেখজী। এই পথেই তো এর পর ছেলেরা দিন দুবেলা হাঁটবে, ইস্কুলে যাবে পড়তে।

নাসের মুখ তুলে তাকালে, প্রসন্ন হাসি হেসে সেলাম ক'রে বললে, কিশোরবাবু! সালাম গো!

কিশোর কখন এর মধ্যে ছেলেদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সেও যাচ্ছিল ওই ইস্কুলডাঙার দিকে। ওখানে আজ বড় ছেলের দল একটা ফুটবল ক্লাবের পত্তন করবে।

কিশোর বললে, বেড়া দেবে দাও। গরুতে ধান খায়, বেড়া দিতে কে বারণ করবে? কিন্তু কোঁঙার বেড়া দিলে যে দু বছরের মধ্যেই রাস্তাটা নষ্ট

হয়ে যাবে শেখজী। তার উপর হবে সাপের উপদ্রব। ছোট ছেলেরা ইস্কুলে যাবে, যদি কাউকে কামড়ায়, তবে কি হবে বল তো?

নাসের হাতের কলকেটা ফেলে দিয়ে শিউরে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইটা তো বাবু খেয়াল করে নাই কিশোরবাবু। ঠিক বুলেছেন আপনি। হাঁ, ঠিক বুলেছেন। তা—। সে খানিকটা ভাবলে, বাবুর কাছে গিয়ে কথাটা ব'লে হুকুম নিয়ে আসবে? কিন্তু নাসের তো জানে, কথাটা শুনে বাবু কি বলবেন! বলবেন, বুড়ো হ'লে নাসের, ভুল না হয় আমার হয়েছিল, কথাটা না হয় আমার খেয়ালে আসে নি; কিন্তু তুমি কি ব'লে ছেলেদের কাছে কথাটা শুনেও বুঝেও সেই কোঁঙার বেড়াই লাগিয়ে এলে? আরে, আমার ছাওয়ালও তো যাবে ইস্কুল। ছি-ছি-ছি! যাও এখন, যা হয়েছে হয়েছে, আবার ওগুলো তুলে ফেলে অন্য বেড়া লাগিয়ে দাও গিয়ে। কি, হয়তো বলবেন, না, কোন বেড়া লাগিয়েই কাজ নাই। যে কোন গাছের বেড়া হোক না কেন, খানিকটা রাস্তা তো মরবেই তাতে, দল বেঁধে হৈ-হৈ ক'রে ছেলেদের যেতে অসুবিধে হবে।

নাসের তাকালে ইস্কুলডাঙার দিকে। খাঁ-খাঁ করছে পাঁচ সাত শো বিঘা রুক্ষ লালচে বালি-কাঁকর-মেশানো মাটির পতিত প্রান্তর। ওদিকে মানুষ বড়-একটা যায় না। কি জন্য যাবে? গোপীচন্দ্রবাবু কয়লার কুঠির মালিক হয়ে লাখে লাখে টাকা রোজগার ক'রে আবাদী জমি কিনতে না পেয়ে ওই পতিত ডাঙাই কিনেছেন। ভেবেছিলেন, ওই ডাঙা ভেঙেই জমি তৈরি করবেন। কিন্তু সে হবে কেন? প'ড়েই আছে? ওই যে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সড়কের ধারে, ওই গাছটাকে বলে 'মড়া-গাছানের গাছ'। নবগ্রামের পশ্চিম অঞ্চল থেকে যে সব হিন্দুর মড়া গঙ্গায় উদ্ধারনপুরের ঘাটে যায়, তারা নবগ্রাম পর্যন্ত এসে বিশ্রাম করে, গাছের ডালে মড়া বেঁধে রাখে, নিচে রেঁধে-বেড়ে খায়। তারপর গ্রামের বাইরে বাইরে চ'লে গিয়ে আবার সড়ক ধ'রে চ'লে যায় উদ্ধারনপুর। ওই গাছটা থেকে খানিকটা পশ্চিমে মুসলমানদের কবরস্থান। ব্যাপারীপাড়া, ছোট গোগা প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদের ওইখানে কবর দেওয়া হয়। ওই খাঁ-খাঁ-করা শ্মশান কবরস্থান পাকা ইমারতে সেজে হেসে উঠবে, কত ছেলে আসবে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে, তাদের কলকলিতে মনে হবে আশেপাশেই কোনখানে বর্ষার ভরা দরিয়া ব'য়ে যাচ্ছে —কলকল খলখল শব্দ ক'রে। নাসেরের মনে পড়ল, স্বর্ণবাবুর বাবা যখন মাইনর ইস্কুল করেন তখনকার কথা। গ্রামের শেষ সীমানায় আবাদী জমির উপর কাঁচা ইমারত বানিয়ে ইস্কুল হ'ল। তখন নবগ্রাম থেকে দক্ষিণ দিকে

একটা সরু খালপথ ছিল, পথটা দক্ষিণের গ্রাম মস্তলী কাদপুর, সেখান থেকে নদী পেরিয়ে মেলানপুর শাওড়াপুর মৌটর চ'লে গিয়েছিল। দিনে দু-চার জনের বেশি লোক হাঁটত না। কি জন্য হাঁটবে? নেহাত বাজারে আসবার না হ'লে কেউ নবগ্রাম আসে না। কিন্তু যেই মাইনর স্কুলটা হ'ল, অমনি কাদপুর মস্তলী থেকে ছেলে স্কুলে আসতে শুরু করলে। প্রথম দু জন, তিন জন; তারপর পাঁচ-সাত জন; তারপর দশ-বারো-পনেরো জন। পনেরো জনের ত্রিশখানা পা দু বেলায় ষাটখানা হয়ে সরু খালপথের ঘাস কাঁটা ঘুচিয়ে চমৎকার চোখ-জুড়ানো চওড়া খালপথে পরিণত করছে। এই যে গোপথ, যে পথের অবস্থা এখন খানা-খন্দকে ভরা, এই পথ ওই ছাওয়ালদের পায়ে পায়ে পাকা সড়কে পরিণত হবে। চোখে যেন দেখতে পাচ্ছে নাসের। পথের উপর ছাওয়ালদের কচি পায়ের ছাপ আলপনার মত ফুটে উঠছে। স্বর্ণবাবুর ছেলে—একমাত্র সন্তান—সে নাসেরের খুব প্রিয়। তাকে নিয়ে নাসের অনেক কল্পনা করে। স্বর্ণবাবু নাসেরের চেয়ে বয়সে ছোট। স্বর্ণবাবুর বাপের আমলের লোক নাসের, স্বর্ণবাবুকে সে অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করে। স্বর্ণবাবুর বাপের আমলে নাসেরের মনিব-বাড়িই ছিল এ গ্রামের প্রধান বাড়ি, নাসের বলত—বড় বাড়ি। সে বাড়ির অহঙ্কারের সেও ছিল অংশীদার। এখন গোপীবাবু তার মনিব-বাড়ির সে প্রাধান্য খর্ব করেছে, তাতে নাসেরও মনে মনে বেদনা অনুভব করে। একলা ব'সে থাকে যখন, তখন সে এই সব কথা ভাবে,—ভাবে, কেমন ক'রে আবার তার মনিব-বাড়ি প্রধান হয়ে উঠবে। গোপীচন্দ্রের বিপুল সম্পদের প্রত্যক্ষ পরিচয়—হাটে বাজারে শোনা গল্প তার কল্পনাকে উপহাস করে, মধ্যে মধ্যে সে চমকে ওঠে, মনে হয়, গোপীচন্দ্রের বড় ছেলে রাজার পোশাক প'রে মাথায় তাজ প'রে হা-হা ক'রে হাসছে। নাসেরের মনের কথা বুঝতে পেরেই তার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে। কোন ক্রমেই সে স্বর্ণবাবুর ছেলে—তার পরম আদরের খোকাবাবু সম্পর্কে এমন কল্পনা করতে পারে নি, যাতে গোপীচন্দ্রের ছেলের ওই হাসি থেমে যায়। সম্প্রতি সে গিয়েছিল সদরে একটা ফৌজদারী মামলায় ডেপুটি-আদালতে সাক্ষী দিতে। স্বর্ণবাবু এবং গোপীবাবুর মধ্যেই মামলা। আদালতে গিয়ে ডেপুটিকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণবাবুর পুরোনো উকিলের ছেলে ডেপুটি হয়ে এজলাসে ব'সে আছে। উকিলবাবু নিতান্ত ছোট উকিল। তার ছেলে কত খাতির করত স্বর্ণবাবুকে। স্বর্ণবাবু যখন তাদের বাসায় যেতেন, তখন ওই ছাওয়ালটি টেনে চেয়ার এগিয়ে দিত, বাড়ির ভিতর বাপকে খবর দিতে ছুটত, চাকর হাজির না

থাকলে ঘটিতে গাড়ুতে জল এনে দিত। সেই ছেলে ডেপুটি হয়ে ব'সে আছে, গোপীবাবুর বড় ছেলে তাকে সেলাম করলে, 'হুজুর' ব'লে কথা বললে। অবাক হয়ে গেল নাসের। কি গুণে এত বড়ঘর্না ছেলে থাকতে ওই ছেঁড়া-চাপকান উকিলবাবুর ছেলে ডিপুটি হ'ল তার কারণ সন্ধান ক'রে জানতে পারলে, ছাওয়ালটা লিখাপড়াতে বড় তেজী ছিল। সব পরীক্ষায় নাকি ফাষ্টো হয়েছে। পাঁচ-পাঁচটা পরীক্ষা দিয়েছে। তাই আংরেজ সরকার তরফে লাটসাহেব তাকে ডেকে তার পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে ডিপটি হাকিম করিয়ে দিয়েছে। সেই থেকে নাসেরের হতাশ কল্পনার মাটিতে লুটিয়ে পড়া লতা একটা শক্ত আশ্রয় পেয়েছে, সেই আশ্রয় জড়িয়ে ওপরে ওঠে। স্বর্ণবাবুর ছাওয়াল খুব লিখাপড়া শিখবে, ডিপটি হাকিম হবে।

সেও তো যাবে এই পথে ওই ইস্কুলে।

নাসের আর দ্বিধা করলে না। মজুরদের হুকুম দিলে, উঠায়ে দে বাবা, কোঁঙাকাঁটার গাছ উঠায়ে দে।

উঠায়ে দিব ?

হাঁ হাঁ হাঁ। খোকাবাবুরা ইস্কুলে যাবে এই পথে। এই পথের ধারে কোঁঙা পুঁতলে রাস্তা মেরে দিবে, রাক্ষুসে গাছে সাপ হবে। দে, তুলে দে।

স্বর্ণবাবু রাত্রে এই কথা শুনে পাগল হয়ে গেলেন ক্রোধে। মদ্যপান করেছিলেন, নেশায় এবং ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হয়ে নাসেরের গলা টিপে ধরলেন।

নাসেরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে তো স্বর্ণবাবুকে ছেলে-বেলা থেকে জানে। সে জানে, স্বর্ণবাবু মদ্যপান করেন ; সে জানে, স্বর্ণবাবুর আরও অনেক দোষ আছে, কিন্তু স্বর্ণবাবু তো কখনও এমন কোন ছোট কাম করেন না, যাতে লোকের কাছে মাথা হেঁট হয়। এমন কোন কাম করেন না, যাতে দশজনের অনিষ্ট হয়,অসুবিধা হয়।

শ্বাস রোধ হয়ে আসছিল তার। মনিবের হাত জোর ক'রে ছাড়িয়ে দেওয়া বেআদপি, তবু না ছাড়লে মরতে হবে তাকে, জ্ঞানহীন স্বর্ণবাবু তাকে খুন ক'রে ফেলবেন। নাসের তার লোহার মত শক্ত হাতের মুঠো দিয়ে স্বর্ণবাবুর দুই হাতের কব্জীতে চেপে ধ'রে টেনে ছাড়িয়ে দিলে। তারপর সেলাম ক'রে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

* * *

সন্তোষবাবু বললেন, বল তো রাধাকান্তবাবু, এর পরও কি মনে কোনও সন্দেহ থাকে যে, স্বর্ণের অন্তরে সন্তোষ কোনকালে আসবে ?

রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

সন্তোষবাবু একটু হাসলেন। বললেন, তুমি হয়তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'লে রাধাকান্ত। কিন্তু বিশ্বাস কর, এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা কথা আমি বলি নি।

রাধাকান্ত এবার বললেন, মুখুজ্জে, আমি আপনার উপর রাগ করি নি ভাই। আমি অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি ঠিক নয়, মনে মনে অনুভব করছি।

সন্তোষবাবুও একটু ভাবুক লোক, রাধাকান্তের ভাবপ্রবণতা তাঁর ভাল লাগে। তবুও রাধাকান্ত যতখানি আবেগ প্রকাশ করেন তাঁর ভাবুকতা প্রকাশের মধ্যে, ততখানি তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে ভগ্নীপতি হিসাবে রহস্যও ক'রে থাকেন এজন্য। আজও রহস্য ক'রে বললেন, কি? বল তো শুনি।

রাধাকান্ত বললেন, স্পষ্ট অনুভব করছি মুখুজ্জে, কাল আমরা গণনা করি দিনরাত্রির হিসাবে। সে কালের একটা রূপ বটে। গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে শীতে বসন্তে—এ কাল পৃথিবীর কাল, জড় প্রকৃতির কাল। মানুষের মধ্যে কালের আর একটা রূপ আছে, আর একটা প্রকাশ আছে। কালের অভিপ্রায়ই বল আর নূতন রূপই বল, সেটা মানুষের মনের রূপের মধ্যেই নব নব ভাবে কালান্তরে প্রকাশ পায়; তাতে বাধা দেওয়া যায় না। এই ইস্কুল হওয়াটার মধ্যেই সে সত্যটা বুঝতে পারছি ভাই। নাসেরও চায় ইস্কুল হোক। নাসেরও ভাবছে, ওই ইস্কুলে পড়েই স্বর্ণের সন্তান করবে লুপ্ত প্রতিষ্ঠার পুনরুদ্ধার। মানুষের ভাবনাই হচ্ছে কালের নূতন রূপ। কিন্তু—

কিন্তু কি?

পরে বলব। এখন নয়। এখন সুরভিরা ডাকছে। রাধাকান্ত উঠলেন।

কতকগুলি গরু আহ্বানের সুরে ডাকছে।

এই সময় তিনি নিজে হাতে কিছু ভূষি এবং খোল খাইয়ে থাকেন। গরু বলদ তাঁকেই ডাকছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বাংলা দেশ সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। মানুষের অর্থের অভাব থাকলেও, গোলায় শস্যের অভাব ছিল না, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাইয়ের অভাব ছিল না, জীবন-ধারণের ধারাধরন ছিল অন্য ধরনের। ভূসম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের অবসর ছিল প্রচুর; সাধারণ শ্রমিক চাষীরা তাঁদের জমি চাষ ক'রে ফসল ফলিয়ে

মাথায় ব'য়ে তুলে দিত মালিকের বাড়িতে ; দেশাচারপ্রচলিত তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে যেত নিজেদের প্রাপ্য হিসাবে, সকৃতজ্ঞ চিত্তে। শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ, একমাত্র চাষের কাজেই আবদ্ধ বললে ভুল হবে না। কাজের খোঁজে বাইরে যাওয়ার অর্থই ছিল, আসামের চা-বাগানের কুলী হিসাবে চালান যাওয়া। তার অর্থ কালান্তক জ্বরে অথবা সাহেবের বুটের লাথিতে পিলে ফেটে অবধারিত মৃত্যু। তাই কর্মান্তরহীন শ্রমিকদেব শ্রমের কল্যাণে জমির মালিক গৃহস্থেব ঘরে পল্লীলক্ষ্মী ছিলেন বাঁধা। শ্রমিকদের মধ্যে যারা দুর্বল এবং যাদের চাষের বয়স হয় নাই, তারা এদের ঘরেই করত গো-সেবা। মালিকদেরও মূল জীবিকা চাষের তত্ত্বাবধানের অল্পসল্প কাজের মধ্যে নিশ্চিন্ত গৃহস্থের অবসর-যাপনের বিলাস ছিল এটি। অন্য দিকে গো-সেবা শাস্ত্রানুমোদিত পুণ্যকর্মও বটে। রাধা-কান্ত তাই নিজে হাতে এদের দুবেলা কিছু কিছু খাওয়াতেন। ঘরের এক কোণেই বস্তায় খোল এবং ভূষি থাকে, একটা ডালায় তাই ভর্তি ক'রে নিয়ে রাধাকান্ত বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের খড়মের শব্দ বেজে উঠবামাত্র গরুগুলি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলে। তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল রাধাকান্তের মুখে।

গরুগুলির প্রত্যেকটির নাম আছে। সবচেয়ে যেটি তাঁর প্রিয়, সেটি আকারে সবচেয়ে বড় এবং সকলের চেয়ে বেশী দুগ্ধবতী ; প্রকৃতিতে গাইটি সবচেয়ে উগ্র। রাধাকান্ত গাইটির নাম দিয়েছিলেন 'নন্দিনী' অর্থাৎ গোমাতা সুরভির কন্যা 'নন্দিনী' কিন্তু রাধাকান্তের পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র গরুটির উগ্র প্রকৃতির জন্য নামকরণ করেছে 'মাবহাট্টানী' অর্থাৎ মারহস্তানী। রাধাকান্তের দেওয়া নাম ছেলেব দেওয়া নামের কাছে চাপা প'ড়ে গিয়েছে। রাধাকান্ত হেসে নন্দিনীকে বলেন, কি করব বল্? গৌরীর দেওয়া নামটা তুই যে শিঙ নেড়ে মাথায় তুলে নিলি। তিনি সস্নেহে তার গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেন, মারহাট্টানী আরামে চোখ বুজে ঘাড় তুলে নির্বোধ বড় চোখ মেলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে স্নেহবিগলিতা নন্দিনীর মত। মারহাট্টানীর পরেই তাঁর প্রিয় হ'ল রঙ্গিণী ব'লে গাইটি। রঙ্গিণীর গায়ের রঙটি বড় সুন্দর, তাই তার নাম রঙ্গিণী, প্রকৃতিতে রঙ্গিণী মার-হাট্টানীর বিপরীত। রাধাকান্তের রাখাল প্রহ্লাদ বাউরী বলে, প্যাটের তলায় ছেলে শুইয়ে দাও ক্যানে, রাঙ্গী নড়বে না। এ ছাড়া শ্যামলী আছে, কাজী আছে মঙ্গলা বুধি সোমেশ্বরী আছে—এদের নাম হয়েছে জন্ম-বার থেকে।

প্রহ্লাদের বড় শখ, মারহাট্টানীর গলায় ঘুঙুরের মালা পরিয়ে দেয়। মারহাট্টানী পথে চলে ঘাড় তুলে বেশ একটু প্রখর গতিতে, তাতে সে কল্পনা করে, ঘুঙুরগুলো বেশ ঝমঝম ক'রে বাজবে। প্রহ্লাদ আজও মাথা চুলকে সবিনয়ে তার আরজি পেশ করলে, মারহাট্টানীর গলায় ঘুঙুর দোব বলেছিলেন!

রাধাকান্ত হেসে বললেন, দোব।

ওদিক থেকে সন্তোষবাবু হাঁকছেন, রাধাকান্ত! ওহে রাধাকান্ত!

কি ব্যাপার?

ও মশাই!

রাধাকান্ত খোল-ভূষির ডালাটি প্রহ্লাদের হাতে দিয়ে ফিরলেন। প্রহ্লাদ পিছন থেকে বললে, আজ্ঞে বাবু, আজ নন্দ ছোঁড়া আসে নাই।

নন্দলাল গরুর রাখাল। প্রহ্লাদেরই স্বজাতি অর্থাৎ বাউরীর ছেলে।

আসে নি? কেন?

প্রহ্লাদ অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললে, আজ্ঞে—

কি?

আজ্ঞে, ইস্কুলডাঙায় নগদ পয়সার কাজ। বাবু মজুরি বাড়িয়েছেন। সেইখানেই খাটতে গিয়েছে, কাজ আর করবে না।

রাধাকান্ত কোনও উত্তর দিলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চ'লে এলেন। এ হ'ল আর একদিক। ভগবান মালিক! মনে প'ড়ে গেল মহাভারতের কথা। ভীষ্ম দ্রোণ শল্য সকলেই বলেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে। যুধিষ্ঠির যখন তাঁদের কাছে গেলেন যুদ্ধের অনুমতির জন্য, তখন তাঁরা বলেছিলেন, ধর্মরাজ, এ সংসারে অর্থ কারও অধীন নয়। সংসারই অর্থের অধীন। দুর্যোধনের অর্থের দ্বারা আমরা ক্রীত। ভীষ্ম দ্রোণ অর্থের দ্বারা ক্রীত হয়েছিলেন।

*　　*　　*

সন্তোষবাবু বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে গোপীচন্দ্রের চাকর। সাহেব অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন; ফুলদানিতে সাজাবার জন্য কিছু ফুলের প্রয়োজন। রাধাকান্তের বাগানে গোলাপফুল আছে, সেই গোলাপফুলের জন্য গোপীচন্দ্র লোক পাঠিয়েছেন। সাহেব মাত্রেই গোলাপফুল ভালবাসে।

রাধাকান্তের বাগানে ফুল প্রচুর হয়—বেল টগর জবা স্থলপদ্ম ইত্যাদি। সে সব তুলতে কারও কোন বাধা নাই। বাগানে একটি মাত্র গোলাপফুলের গাছ আছে। ওই ফুলটি রাধাকান্ত তুলতে নিষেধ করেন। বিনয় করেই

নিষেধ করেন। সে নিষেধ সকলে মেনেই চ'লে থাকে। মধ্যে মধ্যে শুধু সন্তোষবাবু ব্যঙ্গ ক'রে বলেন, একেই বলে নাকছাবি-মায়া।

হেসে রাধাকান্ত বলেন, অর্থাৎ?

সে একটা মায়াবাদ। পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে গল্প বলতে হয়। ব'লেই তিনি আরম্ভ করেন।

সে একটা চিরসত্য গল্প, বুঝেছ না রাধাকান্তবাবু, একেবারে চিরকালের সত্য। একটি মেয়ে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে মরেছে, মহাপুণ্যবতী; সমারোহ ক'রে তাকে শ্মশানে নিয়ে গেছে। অবস্থায় যাকে বলে রাজরাণী, কাজেই সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিয়েই নিয়ে গেছে। ওদিকে স্বর্গ থেকে বিষ্ণুদূত রথ এনেছে—বিষ্ণুলোকে নিয়ে যাবে। রাণী রথে উঠলেন, কিন্তু রথ আর আকাশে ওঠে না। কি হ'ল? এ কি অঘটন? এমন সময় দৈববাণী হ'ল—স্বর্ণ হ'ল পার্থিব সম্পদ, ওর ভারে রথ ভারী হয়েছে, ও না পরিত্যাগ করলে রথ শূন্যে উঠবে না। রাণী বললেন, বেশ তো। এ আর বেশি কথা কি? খুলে ফেললেন অলঙ্কার। ফেলে দিলেন ধুলোয়, গঙ্গার গর্ভে। কঙ্কণ খুললেন, চূড় খুললেন, কণ্ঠহার খুললেন, বাজুবন্ধ খুললেন, কানের আভরণ খুললেন, কণ্ঠহার খুললেন, খুলে ফেলে উঠে বসলেন রথে। তবু রথ ওঠে না। আবার কি হ'ল? দৈববাণী হ'ল—নাকে নাকছাবি খুলতে ভুলেছ। রাণী চমকে উঠলেন। নাকে হাত দিলেন। সত্যিই তো, ওটা খোলা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় দেখা মুখের ছবি মনে পড়ল। সারথি বললেন, দেবী ওটা খুলে ফেলুন। রাণী বললেন, বাবা, ওটার ওজন এক আনার চেয়েও কম। আমি বরং ওর ডবল ওজনের একটা অঙ্গ কেটে ভার কমিয়ে দিচ্ছি। ওটা থাক্। সারথি বললে, তা তো হয় না মা, দেবতাদের আদেশ তো স্বকর্ণেই শুনেছেন, যত সামান্য ওজন হোক, ও থাকলে—। রাণী তাকে আর কথা শেষ করতে দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন, বললেন, তবে থাক্ বাবা, নাকছাবি ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পারব না। মা গো, মুখের চেহারা হবে কি বিশ্রী! ব'লেই তালগাছের মত লম্বা ঠ্যাঙ বের ক'রে একেবারে এক শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ ক'রে নীচে একটা ডোবার পাঁকাল জলে নিজের মুখ দেখতে গেলেন আর ফিক্‌ফিক্ ক'রে হাসতে লাগলেন।

আজ সন্তোষবাবু হেসে বললেন, নাও। দেবতাকে দাও না ফুল। এইবারে দাও—ম্লেচ্ছ রাজার প্রতিনিধিকে দাও।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গোপীচন্দ্রের চাকর মনিবের অনুরোধ নিবেদন করলে আবার, সাহেব গোলাপ ফুল ভালবাসেন।

সন্তোষবাবু নিজেই ফুলগুলি তুলে গোপীচন্দ্রের চাকরের হাতে দিয়ে বললেন, যা বাবা। ফুল তো পেয়েছিস, এইবার চ'লে যা।

সন্তোষবাবু যাবার সময় মৃদু হেসে ব'লে গেলেন, দুঃখ ক'রো না ভাই। তোমার সমস্যা আমি সহজ ক'রে দিয়েছি।

সন্তোষবাবু চ'লে যেতেই রাধাকান্তবাবু ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

সাত

পরের দিন সকালবেলা রাধাকান্ত ওই ফুল কয়টির জন্য অভিনন্দন পেলেন। গোপীচন্দ্রের ছেলে কার্তিচন্দ্র নিজে এসে জানিয়ে গেলেন। রাধাকান্ত গ্রাম-সম্পর্কে গোপীচন্দ্রের মামা, সেই হিসাবে কীর্তিচন্দ্র তাঁর নাতি। গোপীচন্দ্রের জন্ম নিঃস্ব পিতার গৃহে, বাল্যে তিনি এখানকার প্রাচীন প্রতিষ্ঠাবান বংশগুলিকে সম্ভ্রম করতে শিখেছিলেন, এঁদের কাছে বাপকে অনুগ্রহ নিতে দেখেছেন ও অনেক ক্ষেত্রে সে অনুগ্রহ তিনিই নিজে হাত পেতে নিয়ে এসেছেন, তা ছাড়া তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমন মষ্টতা আছে যা এ সংসারে সুদুর্লভ, কাজেই তিনি অবস্থায় আজ সর্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম্য প্রধানদের সঙ্গে সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার ক'রে থাকেন। কিন্তু কীর্তিচন্দ্র ধনী পিতার সন্তান। তিনি জন্মেছেন ঐশ্বর্যের মধ্যে। গোপীচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কয়লা-কুঠিতে এবং কলকাতার ব্যবসায়ী-মহলে তিনি বাল্যকাল থেকেই সম্ভ্রম এবং সমাদর পেয়ে আসছেন,—কয়লা-কুঠির কর্মচারী শ্রমিক তাঁকে সেলাম দিয়েছে, ব্যবসায়ী ধনীদের কাছে নমস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর প্রকৃতিও গোপীচন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র। কীর্তিমান গোপীচন্দ্রের প্রকৃতির সুদুর্লভ মাধুর্য পৃথিবীতে বোধ করি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়াও যায় না, কীর্তিচন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই দাম্ভিক এবং প্রকৃতিতে তিনি নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। এই দম্ভ এবং নিষ্ঠুরতা এই নবগ্রামের পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রচণ্ড উগ্রতায় উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরের বিপুলপরিসর কর্মক্ষেত্রে কীর্তিচন্দ্রের দম্ভ নিষ্ঠুরতা প্রতিহিংসাপরায়ণতা সংযত রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত, নবগ্রামে পা দিলেই কীর্তিচন্দ্র ক্ষোভে জ্ব'লে

ওঠেন, হয়ে ওঠেন অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয়গিরি। ক্ষোভ তাঁর স্বাভাবিক এবং পৃথিবীর রীতি অনুযায়ী সঙ্গত। গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী তাঁর পিতা, গুণেও তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু তিনি এ গ্রামে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে স্বীকৃত নন কেন? কোন্ অধিকারে চটকের সঙ্গে তুলনীয় এই গ্রাম্য প্রধানেরা গরুড়ের মত অমিতবীর্য এবং ভাগ্যবান তাঁর পিতার ঊর্ধ্বে পক্ষবিস্তার ক'রে আকাশলোকের অধিকার চায়? তাঁর ইচ্ছা হয়, এই নবগ্রামের আকাশে একবার পক্ষ আস্ফালনে এমন ঝড় তোলেন যে, ঝড়ের বেগে এই চটকগুলি মাটিতে আছাড় খেয়ে ধূলিস্তূপের মধ্যে সমাধি লাভ করে, কিন্তু গোপীচন্দ্র তা কখনও হতে দেন না। তবুও কীর্তিচন্দ্র পদক্ষেপে ব্যবহারে বাক্যালাপে নিজেকে প্রকাশ করেন। গ্রামের প্রধানেরা গোপীচন্দ্রকে ঈর্ষা করেন, অবজ্ঞা করতে চেষ্টা কবেন, তবুও অন্তরে অন্তরে শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু কীর্তিচন্দ্রকে তাঁরা ভয় করেন। সেই কীর্তিচন্দ্র অভিনন্দন জানাতে এলেন। রাধাকান্তের বৈঠকখানায় তখন চায়ের আসর বসেছে—স্বর্ণবাবুও আছেন, আরও অনেকে আছেন, আলাচনা চলছে ওই নূতন ইস্কুলের। কীর্তিচন্দ্র এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আসব ঠাকুরদা?

রাধাকান্ত সমাদরের সঙ্গেই তাঁকে আহ্বান জানালেন, এস, এস ভাই, এস।

এলাম। কিন্তু আলোচনায় বাধা দিলাম যে!

রাধাকান্ত হেসে বললেন, আলোচনা তো ষড়যন্ত্র নয় ভাই যে, তোমার সামনে সেটা চলতে পারবে না। তবে হয়তো একটু সংযত হয়ে করতে হবে। আর কোন অন্যায় বা নিন্দামূলক আলোচনাও হয় নি আমাদের। ব'স তুমি।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, অন্যায় করলে সমাজ তার প্রতিবাদ করবে, নিন্দার কাজ হ'লে লোকে নিন্দা করবে, সে মুখের সামনেই করবে। রাজার মাকে হাত জোড় ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বাড়ি ফিরে এসে যারা ঘরের কোণে 'ডাইনী' ব'লে গাল দেয়, তাদের দলে আমাদের ফেলছ কেন?

রাধাকান্ত বললেন, আমাদের আলোচনা হচ্ছিল ভাই, এই ইস্কুল স্থাপনের ফলাফল নিয়ে। ভবিষ্যতে কেউ আর কারুকে মানবে না, সিকি-পাদ ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাবে, কলির ফল পরিপূর্ণ হবে—এই আলোচনা হচ্ছিল। তোমার বাবা ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছেন, কালধর্ম অনুযায়ী পুণ্য কর্মই করছেন। তিনি করছেন বিদ্যাদানের কল্পতরু প্রতিষ্ঠা। কিন্তু

কালের ধর্মে বিদ্যা যদি অবিদ্যায় পরিণত হয়, তবে সে দায়িত্ব তাঁর নয়, সেটা হ'ল কালের অভিপ্রায়। কালের অভিপ্রায়ে এ হবেই। আজ তোমার বাবা যদি এই সব কথা ভেবে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বিরতও হন, তবুও কি সমাজ-সংসারের এই গতি রোধ হবে? হবে না। এই গ্রামে যারা ইংরিজী লেখাপড়া ইতিমধ্যেই শিখেছে—বেশি-কম যেমনই হোক তারা শিখেছে যে কালধর্মে, সেই কালধর্মে দিন দিন বেশি সংখ্যায় লোক ছেলেপিলেদের বাইরে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবে। ক্রমে এইখানেও ইস্কুল হবে। তোমার বাবা না করেন, তুমি করবে; তুমি না কর, তোমার ছেলে করবে।

কীর্তিচন্দ্র আভিজাত্যসম্মত ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে একটু হাসলেন, হেসে বললেন, আমাদের ছেলেদের আমলে ইস্কুল কলেজে পরিণত হবে ঠাকুরদা বাবা যখন সংকল্প করেছেন, তখন ইস্কুল হবেই। ম্লেচ্ছাচারে দেশ ভ'রে যাবে, সিকি-পাওয়ালা ধর্মের ষাঁড়টার ওই সিকিখানা পাও ক্ষ'য়ে যাবে—এ সব তত্ত্ব আমরা পাপীতাপী মানুষ আমরা তো বুঝিই নে, বাবাও বোঝেন না। পাপী-তাপীদের সঙ্গেই তো তাঁর কারবার। সায়েব-সুবো ইংরিজী লেখাপড়াজানা অনেক লোকের সঙ্গে মেলমেশ ক'রে তাঁর এ ধর্মভয়টা লোপ পেয়েছে। বুঝলেন না, ও ধর্মভয়ই বলুন আর পথ বন্ধের ভয়ই বলুন, কোন ভয়েই তাঁকে কাবু করা যাবে না। কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুর এসেছিলেন, তিনি তো শুনে হেসেই আকুল। হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, ঘোস্টের ভয় দেখায় নি লোকে—মানে ভূতের ভয়? বলে নি, ভূতের ঈশ্বর মহাদেব কি গডেস কালী তাঁদের চেলা-চামুণ্ডা পাঠিয়ে তোমাকে ছেলেপুলে সমেত ঘাড় মটকে দেবে?

কথা শেষ ক'রে কীর্তিচন্দ্র নিজেই হেসে উঠলেন। কীর্তিচন্দ্র হো-হো ক'রে উচ্চ হাসি হাসতে পারেন না। ওটা তাঁর উপর নূতন যুগের সভ্যতার প্রভাব নয়, ওটা তাঁর স্বভাব। এ ক্ষেত্রে তাঁর হো-হো শব্দে হাসতে না পারাটা ভালই হ'ল, কারণ তাঁর হাসিতে আর কেউ হাসল না; সমস্ত মজলিসটি স্তব্ধ হয়ে রইল। কীর্তিচন্দ্রের হাসি, সায়েবের এই মন্তব্য মজলিসের প্রতিটি জনকেই ক্রূর আঘাতে ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত ক'রে তুলেছিল; কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার সাহস আছে কার? রাধাকান্ত মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলেন। স্বর্ণবাবুর মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল, অবরুদ্ধ ক্ষোভ এবং ক্রোধের উত্তেজনায় রক্তের চাপে মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, রাগের শিরা দুটো ফুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে দড়ির মত; ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট দেখা যায়—শিরা দুটো লাফাচ্ছে।

কীর্তিচন্দ্র আবার মৃদু হেসে বললেন, হাসি-তামাসা ছেড়ে সায়েব শেষে বললেন, একটা কথা—তুমি তোমার গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা ক'রো দেখি গোপীচন্দ্রবাবু। জিজ্ঞাসা ক'রো, ইস্কুল তুমি যদি নাই প্রতিষ্ঠা কর, তবে কি তোমার গ্রামের বাবুরা ছেলেদের ইংরিজী লেখাপড়া শেখাবেন না? কে কে চান না তাঁদের ছেলে মুনসেফ কি ডেপুটি কি সব-রেজিস্ট্রার কি সব-ইন্সপেক্টার হয়? তাঁদের নামগুলো আমাকে জানালে আমি কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট লিখে রেখে যাব। গভর্মেণ্টকে জানাব—

স্বর্ণবাবু আর সহ্য করতে পারলেন না, তিনি অত্যন্ত অকস্মাৎ মজলিস থেকে উঠে পড়লেন, বললেন, চললাম রাধাকান্তদা!

উঠছ?—মৃদুস্বরে নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্যই রাধাকান্ত কথাটা বললেন।

হ্যাঁ। কানের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

কীর্তিচন্দ্র গম্ভীর হয়ে উঠলেন। মুখের হাসি তাঁর মিলিয়ে গেল।

ফট ফট শব্দে চটি টেনে স্বর্ণবাবু বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজলিসটা আসন্ন কালবৈশাখীর মুহূর্তের মত অসহনীয় স্তব্ধতায় ভ'রে উঠল। এর পরই একটা বিসদৃশ কিছু ঘটবে, এমনই আশঙ্কায় সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু এই নাটকীয় মুহূর্তটিতেই রাধাকান্তের চাকর বিষ্ণু গৌরীকান্তকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ছেলেটির হাতখানি রক্তাক্ত—বিড়াল কুকুর জাতীয় কোন জন্তুর ধারালো নখের আঁচড়ের মত চিহ্ন কনুই থেকে হাতের তালু পর্যন্ত লম্বা হয়ে ফুটে উঠেছে। বিষ্ণু গৌরীকান্তকে রাধাকান্তবাবুর কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, গোলাপের ডালে চিরে গিয়েছে। ও বাড়ির খোকাবাবু—

সন্তোষ মুখুজ্জে ব'লে উঠলেন, সর্বরক্ষে, আমি ভাবলাম বেড়াল কি বেঁজী কি বাঁদর কি কুকুর আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছে। গোলাপের ডালে ছ'ড়ে গিয়েছে—তবু ভাল।

বিষ্ণু বললে, ওদের বাড়ির খোকাবাবুর সঙ্গে গোলাপের ডাল নিয়ে—

বাধা দিয়ে রাধাকান্ত বললেন, তুই যা। ছেলেকে তিনি পাশে বসিয়ে কাটা দাগগুলো দেখলেন। গৌরীকান্ত কাঁদে নি, সে চুপ ক'রেই হাতখানা বাড়িয়ে দিলে। কীর্তিচন্দ্র বললেন, গোলাপের ওই এক জ্বালা—কাঁটা আছে। নইলে এমন ফুল আর হয় না। আপনার বাগানের গোলাপ পেয়ে সাহেব খুব খুশি, দশবার বললেন—সো বিউটিফুল রোজ গোপীচন্দ্রবাবু, ওঃ, সো বিউটিফুল! এ তোমার বাগানের ফুল? বাবা তখন

বললেন—না ইওর অনার, এ ফুল আমাদের গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—রাধাকান্তবাবু, ভাল লোক, ধার্মিক, ন্যায়বান আবার শৌখিন লোকও বটেন, তাঁর বাগানের খুব শখ—এ ফুল তাঁর বাগানের। ·জুর আসবেন জেনে এ ফুল তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। সায়েব বললেন—চমৎকার ফুল! রাধাকান্তবাবুকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো। ব'লো, আমি খুব খুশি হয়েছি।

সন্তোষ মুখুজ্জে রাধাকান্তের মুখের দিকে তাকালেন, তাঁর মুখে কৌতুক-হাস্যরেখা ফুটে উঠেছে। রাধাকান্ত মুখ নামিয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে কিছু ভাবছেন। সম্ভবত কি বলবেন তাই ভাবছেন। রাধাকান্তকে কিছু বলার দায় থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই তিনি বললেন, তা ফুলের জন্যে রাধাকান্তবাবুর হাত দুখানি অনেক পুণ্য অর্জন করেছে। সায়েব ধন্যবাদ দিয়েছেন—এটা একটা জবর খবর, নতুন খবরও বটে। তবে আমার ইষ্টদেবতা তো নিত্য আশীর্বাদ করেন রাধাকান্তবাবুকে। শুধু আমার ইষ্টদেবতা কেন, এ গ্রামের দেবদেবী যতগুলি আছেন সকলেই পূজা নেন রাধাকান্তের বাগানের ফুলে।

কীর্তিচন্দ্র সন্তোষ মুখুজ্জের কথায় কান দেন নি। বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনদের সম্মান নূতন যুগে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসছে। কীর্তিচন্দ্র উঠে গৌরীকান্তের কাছে এসে তাঁর হাতখানি ভাল ক'রে দেখে আত্মীয়তা প্রকাশ ক'রে হেসে বললেন, গাছ থেকে ফুল পাড়তে গিয়েছিলে বুঝি?

গৌরীকান্ত ঘাড় নেড়ে বললে, না। বাবা গাছটা কেটে ফেলে দিয়েছেন যে। ওদের খোকা—

গাছ কেটে ফেলে দিয়েছেন?

সন্তোষবাবু মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। রাধাকান্তকে তিনি চেনেন। কিন্তু সে কথা প্রকাশ পেলে রাধাকান্তের কল্যাণ হবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন, ভাল করেছ। কতদিন থেকে তোমাকে বলছি—ডালগুলো বুড়ো হয়েছে, ছেঁটে দাও। তা দাও নি। এবার যা হোক কথাটা যেন শুনেছ; ভাল করেছ। দেখবে, এবার কেমন ফুল দেয়!

গৌরীকান্ত ব'লে উঠল, না পিসেমশাই, বাবা গাছটা গোড়া থেকে কেটে ফেলে দিয়েছেন।

গোড়া থেকেই কাটতে হয় বাবা। অনেক দিনের বুড়ো ডাল কিনা। এর পর শেকড়ের মাটি খুলে দিলে একেবারে গোড়া থেকে মোটা হয়ে সতেজ ডাল বের হবে।

রাধাকান্ত দীর্ঘক্ষণ মনে মনে ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। যে ফুল তিনি দেবতার পূজার জন্যও তুলতে দিতেন না, সেই ফুল ম্লেচ্ছরাজার প্রতিনিধি মুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটের তুষ্টির জন্য দিতে বাধ্য হয়েছেন, সাহস ক'রে 'না' বলতে পারেন নাই, নিজের সেই দুর্বলতার অনুশোচনায় গাছটাকে তিনি সমূলে তুলে ফেলে দিয়েছেন। এ কথাটা কীর্তিচন্দ্রের কাছে প্রকাশ পেলে ম্যাজিস্ট্রেটের কানে উঠবার সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিত। এবং প্রবল-প্রতাপ ইংরেজের প্রতিনিধির কানে উঠলে তার ফল হবে মর্মান্তিক। তবু আর তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বৈষয়িক বুদ্ধি অপেক্ষা তাঁর হৃদয়াবেগ প্রবল, বাস্তবতা-বোধের যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা ভাব-বোধের নির্দেশ তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি। সত্য গোপনের আত্মপীড়া তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, না সন্তোষবাবু, মিথ্যা কথা ব'লে আর পাপ বাড়াতে চাই না। তা ছাড়া ছেলেকেও মিথ্যাচার শিখিয়ে বংশকে পাপগ্রস্ত করতে চাই না। গাছটা আমি কেটে ফেলেছি—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য।

তারপর কীর্তিচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ওই গোলাপগাছের ফুল আমি কাউকে তুলতে দিই নে। প্রথম যে ফুলটি হয়েছিল সেই ফুলটি কেবল তুলে নিজে ইষ্টপূজা করেছিলাম। তারপর থেকে ও গাছের ফুল গাছেই শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে।

একটু হেসে বললেন, সন্তোষবাবু কতদিন আমাকে কত রহস্য করেছেন। গোলাপফুলের মায়াকে বলতেন—নারীর নাকছাবি-মায়া। মনে মনে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হ'ত যে ফুল দেবতার পূজায় লাগবে তাব জন্য মায়া করা আমার অন্যায় হচ্ছে। মনকে প্রবোধ দিতাম, ব্রহ্মাণ্ড-অধীশ্বরের পূজা—ও কি তুলে মন্ত্র প'ড়ে পূজা করলাম বললেই হয়. আর গাছের ফুল গাছে ফুটে থাকলে হয় না? এও তো এক ধরনের পূজা। কিন্তু সায়েবের অভ্যর্থনার আসর সাজাবার জন্য তোমার বাবা ফুল চেয়ে পাঠালেন—সায়েব নাকি গোলাপফুল ভালবা'সেন, তখন সঙ্কটে পড়লাম। 'না' বলতে সাহস পেলাম না। 'তুলে নাও' এও বলতে পারলাম না! সন্তোষবাবু একটু হেসে ফুল-গুলি তুলে তোমাদের চাকরের হাতে দিয়ে বললেন—তোমার সমস্যা সহজ ক'রে দিলাম রাধাকান্তবাবু। সন্তোষবাবু চ'লে গেলেন, আমি একখানা ধারালো দা নিয়ে গাছটাকে কেটে ফেললাম। তাতেও মন তুষ্ট হ'ল না, মাটি খুঁড়ে শেষে নির্মূল করেছিলাম। প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

মজলিসটায় প্রত্যেকটি লোক অভিভূত হয়ে পড়েছিল, রাধাকান্তের

গাঢ় কণ্ঠস্বর তাঁর অসহায় অবস্থার হৃদয়বেদনার কাহিনী সকলকেই স্পর্শ করেছিল, কীর্তিচন্দ্রও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি কলকাতা থেকে এবার ভাল গোলাপের কলম আপনাকে এনে দেব ঠাকুরদা।

রাধাকান্ত বললেন—তোমার মঙ্গল হোক ভাই। কিন্তু গোলাপগাছ আর লাগাতে ইচ্ছা নাই।

এবারের কণ্ঠস্বর তাঁর আরও সকরুণ। কীর্তিচন্দ্রও এবার স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সমস্ত মজলিসটা নীরব। দু-একজন কেবল গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিলেন, সম্ভবত সকরুণ হৃদয়াবেগের প্রভাবে গলার ভিতরটা ভারী হয়ে উঠেছিল। এই স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে গৌরীকান্ত বললে, ওই গোলাপের ডাল কি আবার লাগাতে আছে বাবা?

ম্লান হেসে ঘাড় নেড়ে রাধাকান্ত জানালেন, না।

গৌরীকান্ত বললে, সারের গাদায় ডালগুলো প'ড়ে ছিল, ও-বাড়ির খোকা এসে ডালগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, লাগাবে বলছিল, তাই আমি বারণ করলাম—না, ও গাছের ডাল আর লাগাতে নেই, ও-গাছটায় পাপ লেগেছে। ডালটা আমি ধ'রে আটকাতে গেলাম তো খোকা জোরে আচমকা টেনে নিলে। আমার হাতটা ছ'ড়ে গেল।

রাধাকান্তবাবু সস্নেহে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, যাও, বাড়ির মধ্যে যাও। মাকে গিয়ে বল, তিনি একটু তেল-টেল লাগিয়ে দেবেন, কাঁটা ফুটে থাকলে বের ক'রে দেবেন।

গৌরীকান্ত চ'লে গেল। কীর্তিচন্দ্রও উঠে দাঁড়ালেন।—আমিও উঠলাম ঠাকুরদা।

উঠবে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, এস ভাই।

রাধাকান্তও উঠে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা যেন দুঃখিত হয়ো না। কারণ দেবতার *জন্যও* ফুল তুলতে দিতাম না—এ কথা তোমরা জানতে না। জানলে, সায়েবের টেবিল সাজাবার জন্য ফুল চেয়ে পাঠাতে না।

কীর্তিচন্দ্র হেসে বললেন, না না ঠাকুরদা, এতে আমাদের মনে করবার কি আছে?

* * *

মনে করবার নাই? কীর্তিচন্দ্র মুখে ব'লে এলেন বটে—এতে তাঁদের

কিছু মনে করবার নাই। হয়তো যুক্তিতে তর্কে মনে করবারও কিছু নাই, কারণ দেবতার পূজার জন্য যে ফুল তুলতে দিতেন না, রাজরোষের ভয়ে রাজ-প্রতিনিধির পরিতুষ্টির জন্য সেই ফুল তিনি দিতে বাধ্য হয়েছেন, এর জন্য আত্মগ্লানি-তাড়নায় যা করেছেন তার সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নাই। এতে যদি কারও ক্ষোভের কারণ থাকে তবে সে আছে ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবটির। ক্ষোভ তাঁর নিশ্চয়ই হতে পারে। দেবতাকে না দিয়ে মানুষকে দেওয়ার জন্যই তো রাধাকান্তের এতখানি আত্মগ্লানি নয়, এতখানি আত্মগ্লানির কারণ বিধর্মী রাজার—যে ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ বলা হয়, সেই রাজার প্রতিনিধি এবং সেই প্রতিনিধিটিও ধর্মে মুসলমান, সেই মানুষকে দেবতাকেও অদেয় মমতার বস্তু দিয়েছেন তিনি ভয়ের অনুবর্তী হয়ে। বিধর্মী ব'লে এই যে ঘৃণা, এর জ্বালা বড় মর্মান্তিক। ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কানে উঠবা মাত্র তিনি বিষাক্ত সরীসৃপেব দংশনের জ্বালার মত জ্বালায় অধীর হয়ে উঠবেন। শুনবা মাত্র তাঁর মনে হবে, তিনি মুসলমান ব'লেই ওই হিন্দু রাধাকান্তের এতখানি আত্মগ্লানি হয়েছে।

গোপীচন্দ্র বা তাঁর সন্তানেবা এই ঘটনাটির মধ্যে নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জ্বালা অনুভব না ক'রে যেন উপায় নাই। কীর্তিচন্দ্র অনুভব না ক'রে পারলেন না।

ঘটনাটি শুনে গোপীচন্দ্র বেদনা এবং লজ্জা দুই-ই অনুভব করলেন। গোপীচন্দ্র সংসারে শুধু কৃতী পুরুষই নন, তাঁর মন হৃদয় সত্য সত্যই উদার এবং প্রসন্ন। সংসারে নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে তিনি ধনী হয়েছেন, জীবনে বহু বেদনা তিনি সহ্য করেছেন, বেদনার দুঃখের সমুদ্র তিনি ভেলা বেঁধে উত্তীর্ণ হয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখ-বেদনার অনুভূতির স্মৃতি তাঁর মনে আছে, সে সব তিনি ভুলে যান নি। তাঁর নিজের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে প'ড়ে গেল, অনেকটা মিল আছে, এই ঘটনার সঙ্গে। সায়েবদের কয়লা-কুঠিতে তখন তিনি সামান্য বেতনের কর্মচারী, কুলী সংগ্রহের জন্য সাঁওতাল-বাউরীদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ফিরবার সময় খুব ভাল এক ছড়া মর্তমান কলা সংগ্রহ করেছিলেন। ছেলেরা মেয়েরা অবোধ, তিনি বাড়ি ফিরলেই ছুটে আসত তাঁর কাছে, প্রশ্ন করত—কি এনেছ বাবা ? কখনও কখনও ময়ূরের পাখা বা সজারুর কাঁটা আনতেন, তাই তাদের দিতেন। এবার এমন সুন্দর কলাছড়াটি পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু কুঠি ঢুকবার মুখেই দেখা হয়ে গেল সাহেব এবং মেম সাহেবের সঙ্গে, তাঁরা ঘোড়ায় চ'ড়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। গোপীচন্দ্র সসম্ভ্রমে

সেলাম জানালেন। সাহেব গ্রাহ্য করলেন না, তাঁর ঘোড়া বেরিয়ে গেল কিন্তু মেম সাহেবের ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেল, মেম সাহেব ঘোড়ার রাশ টেনে ধ'রে গোপীচন্দ্রের দিকে চেয়ে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? তুমি ওই সুন্দর কেলা কোথায় পেলে?

মেম সায়েবকে দাঁড়াতে দেখে সায়েবও ঘোড়া ফিরিয়ে কাছে এলেন। গোপীচন্দ্রকে দেখে প্রশ্ন করলেন, ওয়েল গোপীচন্দর ফিরেছ তুমি? কুলী পেয়েছ?

গোপীচন্দ্র উত্তর দেবার পূর্বেই মেম সাহেব বললেন, তোমার কুঠির লোক? চমৎকার কলা সংগ্রহ করেছে দেখ। কি দাম নিয়েছে জিজ্ঞাসা কর।

গোপীচন্দ্রকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়েছিল, এ কলা-ছড়াটা আমি হুজুরের জন্যেই নিয়ে এসেছি। গ্রামে কুলদেব বাড়িতে পেলাম। অন্তরের বেদনা সযত্নে গোপন ক'রে তাঁকে বিনীত মিষ্ট হাসি হাসতে হয়েছিল। মনে প'ড়ে গেল কথাটা।

গোপীচন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সংসারে পৃথিবীতে এই মর্মবেদনার বোধ হয় প্রতিকার নাই। সংসারে যারা বড়, যারা প্রতিষ্ঠাবান, তাদের পরিতৃপ্তির জন্য সাধারণ মানুষ এমনি ক'রেই নিজেদের বঞ্চিত ক'রে আসছে, ভয়ে ক'রে আসছে--প্রলোভনে প'ড়ে ক'রে আসছে।

কীর্তিচন্দ্র বললেন, কথাটা শুনে প্রথমটায় আমার দুঃখ হয়েছিল। আমি বললাম--এবার কলকাতা থেকে আমি আপনার জন্য ভাল গোলাপের কলম নিয়ে আসব। তা—। তা উত্তর হ'ল—গোলাপগাছ আর লাগাব না।

গোপীচন্দ্র ছেলের মুখের দিকে চাইলেন, বললেন, দেখ, একটা কথা তোমায় বলি কীর্তি, কথাটা যেন অমান্য ক'রো না। আমি তাতে দুঃখ পাব।

বলুন।

এই কথা তুমি আর তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ ক'রো না। সায়েবের কানে উঠলে রাধাকান্তবাবু বিপদে পড়বেন। রাজরোষ বড় ভয়ঙ্কর, কীর্তি। তা ছাড়া রাধাকান্তবাবুর দুঃখ তোমরা ঠিক বুঝবে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে কীর্তিচন্দ্র বললেন, উনি যদি স্বর্ণবাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন—আমাদের ভাল কাজেও বাধা দেন—

বাধা দিয়ে গোপীচন্দ্র বললেন, ভাল কাজে বাধা দেওয়া যায় না কীর্তি। তা ছাড়া রাধাকান্তবাবু স্বর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইস্কুল প্রতিষ্ঠায় বাধা দেবেন —এ অনুমান তোমার ভুল।'

তিনি উঠে পড়লেন। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তিনি ইস্কুলডাঙায় যাবেন ওখানকার কাজকর্ম তদারকের জন্য। কীর্তিচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। বিচিত্র মানুষ কীর্তিচন্দ্র। সম্ভবত ধনী-সন্তানদের প্রকৃতি জেদের দিক দিয়ে এই রকমই হয়। ঘটনাটাব জন্য প্রথমে তাঁর ক্ষোভ ছিল না, তারপর ক্রমে ক্রমে অল্প খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গোপীচন্দ্র যে মুহূর্তে তাঁকে এই ঘটনা নিয়ে বাধাকান্তের বিরুদ্ধতা করতে নিষেধ কবলেন — আদেশের সুরে নিষেধ কবলেন, সেই মুহূর্তে রাধাকান্তের বিরুদ্ধে বিপুল ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এ গ্রামের প্রধানদের বিরুদ্ধে তাঁর আবাল্য-পোষিত আক্রোশ গোপীচন্দ্রের নিষেধের অজুহাত পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল গল্পের সাপের মত। যে সাপ নিরপরাধকে দংশন করতে এসে ভাবে, কোন্ অপরাধে একে দংশন কবব ? তারপর ঘুমন্ত হতভাগ্যের পায়ের স্পর্শ গায়ে ঠেকতেই সেই অজুহাতে চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী রেখে দংশন করে।

* * * *

গোপীচন্দ্রের গাড়ি চলল বাজারের মধ্য দিয়ে। টমটম চ'ড়ে চলেছিলেন। গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ দীর্ঘকায় মানুষটির ভাগ্যও যেমন সুদুর্লভ, কান্তিও তেমনই অপরূপ। বাজারেব লোকেরা সসম্ভ্রমে তাঁকে অভিবাদন জানালে। যারা দোকানে ব'সে ছিল তারা উঠে দাঁড়াল, নমস্কার জানালে। যারা পথ চলেছিল তারা পাশে স'রে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। শুধু তাই নয়, তাদেব মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভ'রে উঠল। এই হাসিটুকুর প্রত্যাশাই করেছিলেন গোপীচন্দ্র। সাধারণ মানুষ, নগণ্য মানুষ, দবিদ্র মানুষ, এদের গ্রাহ্য কেউ কবে না, কিন্তু এদেব মুখেব এই হাসিটুকুকে অগ্রাহ্য কবতেও কেউ পারে না—রাজা প্রজাব মুখে এই হাসি প্রত্যাশা কবে, গুরু শিষ্যের মুখে এই হাসি প্রত্যাশা করে, কবি পাঠক মণ্ডলীর মুখে এই হাসি দেখতে চায়। মানুষ দূরের কথা, দেবতা ভক্তের মুখে এই হাসি দেখে তাঁর দেবত্বকে সার্থক জ্ঞান করেন। গোপীচন্দ্র এই হাসি দেখে শুধু খুশিই হলেন না, মনেব মধ্যে বল পেলেন। করুক গ্রাম্য-প্রধানেরা তাঁর বিবোধিতা। সে বিরোধিতার কোন মূল্য নাই। যেটুকু মূল্য আছে, সেটুকু নিতান্তই এই প্রধানদের কূটবুদ্ধি এবং আর্থিক সঙ্গতির মূল্য। গোপীচন্দ্রের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। বুদ্ধি আর অর্থ ? তাঁর বুদ্ধিবল, তাঁর অর্থবলের পরিমাণ ওই নিতান্ত গ্রাম্য-প্রধানেরা জানে না, অনুমান করতে পারে না। কূপমণ্ডুক সাগরের পরিধি, সাগরের গভীরতা অনুমান করবে কি ক'রে ?

গোপীচন্দ্র সোজা হয়ে বসলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে ভগবানকে

প্রণাম জানালেন। জয় তাঁর অবশ্যম্ভাবী। রাজকুল তাঁর প্রতি প্রসন্ন, তাঁর সহায়। সাধারণ মানুষের মুখ তাঁকে দেখে প্রসন্ন হাসিতে ভ'রে ওঠে, আর তাঁর কি চাই। নইলে প্রণাম নমস্কার—ওকে তিনি মূল্য দেন না। উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলার পল্লী। তাঁর কালকে গোপীচন্দ্র জানেন চেনেন। শূদ্র ব্রাহ্মণকে দেখলেই প্রণাম করে, প্রজা জমিদার হ'লেই প্রণাম জানায়, হোক না কেন ব্রাহ্মণ কদাচারী মূর্খ, হোক না কেন জমিদার সর্বস্বান্ত অধঃপতিত অত্যাচারী। স্বর্ণবাবুকেও এরা ঠিক এমনি ভাবেই জানায়। শ্যামাকান্ত রাধাকান্ত বংশলোচন এদেরও জানায়। কিন্তু প্রণাম করার পর মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়। ঠোঁট বেঁকিয়ে অথবা মাটিতে থুথু ফেলে, যাদের মুহূর্তপূর্বে প্রণাম করেছে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে।

হুজুর !—গাড়ি থামিয়ে ঘোড়াটার লাগাম ধ'রে কোচম্যান ডাকলে, হুজুর !

গোপীচন্দ্র আজিকার এই আবিষ্কারের আনন্দে পুলকিত, চিন্তায় একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি ইস্কুলডাঙায় এসে থামল; তাঁর খেয়াল ছিল না।

ঈষৎ চকিত হয়ে গোপীচন্দ্র বললেন, অ্যাঁ! তারপরই তাঁর সমস্ত খেয়াল হ'ল, তিনি একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ।

নেমে পড়লেন তিনি গাড়ি থেকে।

ইস্কুলডাঙায় কর্মোদ্যমের সমারোহ চলছে। মানুষের কলরব উঠছে। নতুন নবগ্রাম গড়বেন গোপীচন্দ্র, তার আয়োজন চলছে। ইট পুড়ছে, ইট পাড়াই হচ্ছে, চুন পুড়ছে, গাড়ির সারি আসছে ঘুটিং বোঝাই নিয়ে। ওদিকে একটা লম্বা খড়ের চালার মধ্যে কাঠের কাজ চলছে। কাঠের চালাটার সামনে প্রায় বিশ-পঁচিশখানা গাড়ি নামানো রয়েছে, বড় বড় কাঠের গাদি বোঝাই নিয়ে এসেছে, পাটকিলে রঙের মোটা কাঠের গুঁড়ি—শালকাঠ মনে হচ্ছে। গোপীচন্দ্র এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, শালকাঠই বটে। তুমকা থেকে সাঁওতালেরা কাঠ এনেছে। ভাল কাঠ। যেমন সোজা, তেমনই পাকা।

একজন সাঁওতাল তাঁকে নমস্কার ক'রে বললে, পনম গো বাবু মশয়। লাগছে আপুনি বাবু মশয়, মালিকবাবু বট।

গোপীচন্দ্র হেসে চমৎকার সাঁওতালী ভাষায় বললেন, কেমন ক'রে বুঝলে গো তুমি মাঝি মহাশয়?

সবিস্ময়ে মাঝি ব'লে উঠল, আমাদের ভাষা আপুনি জানেন গো বাবু মশয়?

জানি বইকি। ভারি ভাল লাগে তোমাদের ভাষা আমার। ভারি মিষ্টি।

ভারি মিষ্টি?

ভারি মিষ্টি। তেমনই মিষ্টি কি তোমাদের মেয়েদের নাচ, পুরুষদের বাঁশি।

পঁচিশখানা গাড়ির গাড়োয়ান তাঁকে চাবি পাশে ঘিরে দাঁড়াল। বিশাল কর্মজীবনের পটভূমি গোপীচন্দ্রের। সাঁওতালদেব জীবন তাঁর যেন নখাগ্রে। তাদের ক্ষেত-খামার পালা-পার্বণ দেবতা-অপদেবতা সম্পর্কে সংবাদ নিলেন তিনি। সাঁওতাল-পরগনাব অরণ্যসম্পদ, ভূমিসম্পদ্ সম্পর্কে নূতন তথ্য সংগ্রহ করলেন। তাবপব প্রশ্ন কবলেন, তোমারা কোথায় এসেছ—কাঠ বিক্রি কবতে?

সাঁওতালদের প্রধান হাতজোড় ক'রে বললে, আমবা কুথা যাব গো বাবু মশয়, আপনকার নামটি শুনলম তুই সিহুড়ি বাজাবে, শুনলম, আপুনি রাজা হয়েছিস—হেই বাড়ি কবছিস, পাঠশালা কবিবি, দেবতা বাবাদের মন্দির করবি, তাথেই বুলি আপোনাব তুয়াব-জাংলা করবাব লেগে ভাল ভাল শালকাঠ নিয়ে এলম গো।

গোপীচন্দ্র কাঠ এ ভাবে কেনেন না। সাঁওতাল পবগনায় লোক পাঠিয়ে সেখানে কাঠ কেনেন প্রচুর পবিমাণে। ইমারত তাঁর একটাব পব একটা হয়ে চলেছে। কাঠ তাঁকে মজুত রাখতে হয়। কিন্তু এই সাঁওতাল-গুলিকে ফিরিয়ে দিতে কেমন যেন বাধল, করুণাও হ'ল, আবার খানিকটা যেন লজ্জাও অনুভব করলেন তিনি। এত দূব থেকে বেচাবীরা এসেছে, তিনি ফিরিয়ে দিলে বেচারীদের কায়দায় পেয়ে স্থানীয় অবস্থাপন্নেরা এবং ব্যবসাদারেরা অত্যন্ত কম দামে কাঠগুলি কিনবে। দীর্ঘ চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল পথ ওরা বোঝাই গাড়ি নিয়ে এসেছে—এতখানি পথ আবার বোঝাই নিয়ে ফিয়ে যাওয়া ওদের পক্ষে অসম্ভব। গরুগুলির অত্যন্ত কষ্ট হবে। গরুকে কষ্ট ওরা দেবে না, তার চেয়ে ওরা লোকসান ক'রেই বিক্রি করবে। তা ছাড়া পঞ্চাশ মাইল দূবের অরণ্যভূমে এই সরল শিক্ষা-সভ্যতাবঞ্চিত বন্য মানুষগুলি তাঁর কথা শুনেছে—তিনি রাজা হয়েছেন, তারা প্রত্যাশা ক'রে এখানে এসেছে তাঁর কাছে তারা ন্যায্য মূল্য পাবে, তাদের তিনি ফেরাবেন কি ব'লে? ফিরে গিয়ে সেখানে কি বলবে তারা?

একটু ভেবে তিনি বললেন, তাই তো মাঝি, আমি তো এমন ভাবে কাঠ কিনি না রে। আমি একেবারে তোদের দেশে জঙ্গলে লোক

পাঠিয়ে কাঠ কিনি। তা তোরা এনেছিস যখন, তখন দেখি। ব'স্ তোরা, ব'স্।

তিনি এগিয়ে গিয়ে কাঠের কাজের চালার মধ্যে ঢুকলেন। বিস্তীর্ণ খড়ে-ছাওয়া চালা, চারিপাশে কাঠ প'ড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে। এক দিকে কতকগুলি দরজা-জানলার ফ্রেম, তার পাশে কতকগুলি অর্ধসমাপ্ত দরজা-জানলার পাল্লা। চালার মধ্যে ঢুকে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। গোটা চালাটা খাঁ-খাঁ করছে, কেউ কোথাও নাই। ছুটির সময় হয়েছে, ছুতোর মিস্ত্রীরা যারা আশপাশের গ্রাম থেকে কাজ করতে আসে তারা না হয় চ'লে গিয়েছে ; কিন্তু তাঁর স্থায়ী মাইনে-করা মিস্ত্রী বুড়ো বৈষ্ণবচরণ গেল কোথায় ? তার থাকা উচিত ছিল। বুড়ো পাকা মিস্ত্রী, সূক্ষ্ম কাজে নৈপুণ্য অসাধারণ, কাজ বুঝতেও পারে ভাল, কিন্তু কর্মক্ষমতা ক'মে এসেছে ; তার জন্য তিনি অভিযোগ করেন না, অন্যান্য মিস্ত্রীদের কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য, কাজ বুঝে নেবার জন্য তিনি বৈষ্ণবকে স্থায়ীভাবে রেখেছেন। সমস্ত কাঠ-কাঠরার দায়িত্ব বৈষ্ণবের, পাশেই তার জন্য টিন দিয়ে একখানা ঘর তৈরি ক'রে দিয়েছেন ; ঘরে শিকল দেওয়া, চালা জনশূন্য ; বুড়ো নিশ্চয় কোথাও বেরিয়েছে। বিরক্ত হলেন গোপীচন্দ্রবাবু। সম্ভবত বেশ একটু বেশি বিরক্ত হলেন, যার জন্য স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে তিনি সেই শূন্য চালায় দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন, নাঃ, এ বুড়ো অত্যন্ত ফাঁকি-বাজ হয়েছে। চারটে বাজতে না-বাজতে পালিয়েছে। এর একটা ব্যবস্থা—

তাঁর কথার মধ্যেই মূর্তিমান বাধার মত শীর্ণকায় কালো একটি মানুষ কাঠের গুঁড়ির আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল, হাত জোড় ক'রে বললে, আজ্ঞে কর্তাবাবু, আমি পালাই নাই হুজুর, এইখানে আছি।

গোপীচন্দ্র চমকে উঠলেন, লজ্জায় চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এত সামান্য কারণে লজ্জিত হন না। কিন্তু গোপীচন্দ্র স্বতন্ত্র ধরনের মানুষ। লজ্জায় চমকে উঠে তিনি স্মিত হাসি হেসে বৈষ্ণবের কথায় বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, আমি তোমাকে দেখি নি বৈষ্ণব, আমি তোমাকে দেখতে পাই নি বাবা—আমি তোমাকে দেখতে পাই নি। তুমি যে ওখানে ব'সে আছ তা আমি দেখি নি, ওদিকে আমি তাকাই নি।

আজ্ঞে, বাটালির ধার পড়েছে, ব'সে ব'সে শান দিচ্ছিলাম বাবা।

বেশ করছিলে বাবা, বেশ করছিলে, আমি তোমাকে দেখতে পাই নি।

বৈষ্ণব একটু হাসলে, বললে, পাহাড়ের মত কাঠ জ'মে আছে—

কাল থেকে তুমি একটু উঁচু জায়গায় বসবে বৈষ্ণব। কাঠের একটা মাচা ক'রে নিয়ে তার উপর বসবে তুমি। ব'সেই সব দেখতে পাবে, তোমাকেও সবাই দেখতে পাবে।

হেসেই বৈষ্ণব বললে, তাই বসব আজ্ঞে। তারপর এক মুহূর্ত থেমে সে আবার বললে, আমাকে কি বলছিলেন?

এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন গোপীচন্দ্র। বললেন, সাঁওতালেরা শালকাঠ নিয়ে এসেছে, বলছে—একটু হাসলেন গোপীবাবু—বলছে, ওরা নাকি ওদের দেশে শুনেছে আমি এখানে অনেক ইমারত করছি, আমি নাকি রাজা হয়েছি! ফড়িংয়ের কাছে চড়াইপাখিই মস্ত পাখি বৈষ্ণব, গরিব সাঁওতালদের চোখে আমি রাজা। তা রাজার নাম শুনে যখন কাঠ এনেছে, তখন কাঠ না নিলে মান থাকে কি ক'রে বল? কাঠগুলো একবার দেখে নাও। দাম-দর একটা ঠিক কর।

যে আজ্ঞে। কাঠ আমি আগেই দেখেছি। খুব সরেস না হ'লেও খারাপ নয়। মধ্যম রকমের বেশ ভাল কাঠ।

গুড় ছেকেন কেলাস—কি বল? হাসলেন গোপীবাবু।

এবার মুখ নিচু ক'রে খুক্‌খুক্ ক'রে হেসে উঠল বৈষ্ণবচরণ। মনিবের সামনে এমনভাবে হাসা বেয়াদপি, কিন্তু আত্মসম্বরণ করতে পারলে না বৈষ্ণব। কথাটাব পিছনে বৈষ্ণবচরণের নিজেরই একটি কৌতুককর ইতিহাস লুকানো আছে। গোপীবাবুর প্রয়োজনেই তাকে কিছুদিনের জন্য কয়লা, কুঠিতে যেতে হয়েছিল, সেখানে সে অনেক ইংরেজী কথা শিখে আসে। কয়লা-কুঠির ইংরিজী। ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, গুড সেকেণ্ড ক্লাস, হোল্ডিংনাট বোল্ড, স্ট্রাক্‌চার প্রভৃতি অনেক। সেগুলি সে শিখেছিল ফাস্‌টো কেলাস, ছেকেন কেলাস, হরিনারান বল্টু, ইষ্টিরাক্‌চার ইত্যাদি। একদিন সে কর্তাবাবুর সামনেই ওই গুড় ছেকেন কেলাস কথাটা ব'লে ফেলেছিল। একজন মিস্ত্রী সম্পর্কে বলেছিল, খুব ভাল নয়, তবে ভাল বটে—বেশ ভাল। গুড় ছেকেন কেলাস বটে।

বাবু লিখছিলেন, কলম ফেলে বৈষ্ণবের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, কি কেলাস বললে? তখনও বুঝতে পারে নি বৈষ্ণব, সে বলেছিল—আজ্ঞে, গুড় ছেকেন কেলাস।

হো-হো ক'রে গোপীবাবু হেসে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, তোমার মত মধু ফাস্‌টো কেলাস কি সবাই হয় বৈষ্ণব! তা দাও, ওকে

লাগিয়ে দাও, সংসার মধুর অভাবে গুড়েই চলে, তুমিও গুড় ছেকেনেই কাজ চালিয়ে নাও।

মধ্যে মধ্যে গোপীচন্দ্রবাবুও সাধারণ চাকরবাকরের সঙ্গেও এমনি মিষ্ট রসিকতা ক'রে থাকেন। চাকরেরাও এই উদার এবং মধুর-প্রকৃতি মনিবটির সামনে নির্ভয়ে এই ভাবে হেসে থাকে। বৈষ্ণব মধ্যে মধ্যে বলে, আমার কর্তাবাবু আষাঢ়ের মেঘ, যেমন রূপ তেমনই শেতল, ও মেঘে জল আছে—বাজ নেই। গাঁয়ের আর-বাবুদের মত কালবোশেখীর মেঘ নয়, দোষে বিনাদোষে চড়াম্ ক'রে ডেকে উঠে মাথায় পড়ে না।

গোপীচন্দ্র বললেন, যাও তা হ'লে কাঠগুলো ন্যায্য দর ক'রে কিনে নাও। ওদের লোকসান ক'রে দিও না যেন। বহুদূর থেকে এসেছে, গরিব লোক, ওদের একটা পয়সা আমাদের এক টাকার চেয়ে বেশি। আর দস্তুরি আমার কাছে নিও। ওদের কাছে নিও না। আচ্ছা, ওটা বরং নিয়েই যাও।

ব'লে দুটি টাকা পকেট থেকে বের ক'রে বৈষ্ণবের হাতে দিলেন।

*　　　　*　　　　*

এসে দাঁড়ালেন সেই মড়াগাছানো বটগাছটার ধারে। এইখানেই ইস্কুল হবে। পশ্চিমে দক্ষিণে অবারিত প্রান্তর। লাল মাটি এবং কাঁকর-ভরা অনুর্বর বন্ধ্যা জমি। তাঁর উন্নতির প্রথম সময়ে তিনি চাষের জমির জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সেদিন তিনিও কল্পনা করতে পারেন নাই এই ভবিষ্যৎ। এ গ্রাম থেকে ষোল বছর বয়সে তিনি সামান্য চার টাকা মাইনে এবং খোরাকির চাকরি পেয়ে বেরিয়েছিলেন। সেদিন সামান্য এক টুকরো বাস্তুভিটে ছাড়া আর কিছু তাঁর ছিল না। ভিটের ঘরখানাও ছিল 'ভাঙা-ভগ্ন'।

তারপর—! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন গোপীচন্দ্র। গোটা জীবনের সুখ-দুঃখ মুহূর্তে যেন তাঁর চোখের উপর দিয়ে ভেসে চ'লে গেল।

মধ্যে মধ্যে তাঁর ক্ষোভ হয়, ক্রোধ হয়। রক্তমাংসের শরীর তাঁর, তিনিও তো মানুষ! কি প্রতারণাই না তাঁকে করেছে এখানকার প্রধানেরা! চাকরি-জীবনে উন্নতির প্রথম সময়ে তিনি চাষের জমি সংগ্রহ ক'রে অবস্থাপন্ন চাষী গৃহস্থ হয়ে শেষ-জীবনটা কাটিয়ে দেবেন, ভগবানকে ডাকবেন—এই ছিল কল্পনা। সেদিন তিনি এই গ্রামের প্রধানদের সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন—তাঁর বেশ মনে আছে, তিনি লিখেছিলেন—"আপনি গ্রামের প্রধান জমিদার, আমার পিতৃতুল্য। আমি আপনার আশ্রিত স্নেহের পাত্র, আপনার কাছে আমার নিবেদন—আমাকে কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

চাকুরি মানুষের স্থায়ী নয়, কথায় আছে—চাকুরির আশ্রয় আর তালপত্রের ছত্রাশ্রয় ইহাতে কোন প্রভেদ নাই। শরীর অপটু হইলে চাকরি থাকিবে না। অর্থও স্থায়ী নয়। সুতরাং শেষ-কালের দিন কয়টা যাহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিতে পারি, এই জন্য কিছু চাষের জমি কিনিতে চাই। বিদেশে থাকি, ইহা ছাড়াও আমার অগ্রসর হইয়া কেনায় এবং আপনার অগ্রসর হইয়া কেনায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আপনি যে জমিতে হাত দিবেন তাহা ক্রয় করিতে অন্য কেহ অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। আমি আপনার উপর ভরসা রাখি, আপনি পিতৃতুল্য পূজনীয়, আপনি আমাকে কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া দিন। যখন যে মুহূর্তে লিখিবেন, আমি টাকা পাঠাইয়া দিব। অথবা যদি অনুমতি করেন তবে কিছু টাকা আপনাকে এখনই পাঠাইয়া দিই, আপনার নিকট মজুত থাক, জমি পাইলে ক্রয় করিবেন।"

টাকা তিনি পাঠিয়েছিলেন, অগাধ বিশ্বাস করেছিলেন। তার ফলে এই বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা ভূমিখণ্ডের অধিকারী হয়েছেন তিনি। বহু অর্থ তিনি এর উপর খরচও করেছেন।

এই মরুভূমির মত বালি আর কাঁকরে ভরা ডাঙা কেটে, পাহাড়ের মত উঁচু মাটি কেটে, তিনি চাষের জমি তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন। আকারে জমি হয়েছে, নামে জমি হয়েছে, কিন্তু সে জমিতে ফসল হয় না। এই প্রান্তরে তিনি পুকুর কাটিয়েছেন, সে পুকুরে জল থাকে না। বহু টাকা খরচ ক'রে শুধু একটি বাগান তৈরি করেছেন, একটি ছোট পুকুর কাটিয়েছেন। সেই দুটি শুধু সার্থক হয়েছে। পুকুরের নামে কিনে দিয়েছিলেন একটা মজা দীঘি—লড়িয়া পুকুর, তার ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে একটা জল-নিকাশী নালা, পাশের একাংশ জুড়ে চ'লে গিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা। ভিতরে থাকে এক হাঁটু জল, সে জল দেখা যায় না। মজা দীঘির পাঁকের উপর জন্মায় এক বুক উঁচু ঘাস।

এতে যদি তাঁর ক্ষোভ হয়, তবে কি সে ক্ষোভের অপরাধ আছে?

নারায়ণ! নারায়ণ!

অকস্মাৎ চকিত হয়ে উঠলেন গোপীচন্দ্র, নারায়ণ স্মরণ করলেন। এ কি করছেন তিনি? বার বার নারায়ণ স্মরণ করে তিনি অন্তরের ক্ষোভকে প্রশমিত করবার চেষ্টা করলেন।

দূরে ছেলেরা এসে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ইস্কুলের আয়োজন-উদ্যোগ দেখতে আসে। ওই ওরাই হ'ল নিষ্পাপ মানুষ, ওরাই হ'ল দেবতার

প্রতিনিধি, ওরাই বলবে তাঁর জীবন তাঁর কীর্তি কি ভাবে কোন্ মূল্যে গৃহীত হবে বিশ্বনাথের দরবারে, মহাকালের হিসাব-নিকাশের খাতায়। গোপীচন্দ্র এগিয়ে এলেন ছেলেদের কাছে।

ছেলেরা সসম্ভ্রমে স'রে গেল, পথ ছেড়ে দিলে। ভাবলে, গোপীচন্দ্র ওইখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে যাবেন। গোপীচন্দ্র দাঁড়ালেন। বললেন, কোথায় এসেছ গো তোমরা?

ছেলেরা চুপ ক'রে রইল, উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল যেন। গোপীচন্দ্র বললেন, কোথায় এসেছ গো? বল? ভয় কি?

মুখুজ্জেদের খোকা বললে, ইস্কুল হবে, দেখতে এসেছি।

ইস্কুল হ'লে তোমরা খুশি হবে? পড়বে এ ইস্কুলে?

হ্যাঁ।

তোমার নাম কি? অতুল নয়?

হ্যাঁ, অতুলচন্দ্র মুখার্জি।

তোমার? তুমি তো জগদীশের ছেলে পঞ্চানন?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভটচাজ্জি মশায়ের নৈবিদ্যির কলা বাতাসা চুরি ক'রে খাও তুমি। আমি শুনেছি। আর তুমি? তুমি কে গো—সব চেয়ে ছোট, আমাকে এমন ক'রে একদৃষ্টে দেখছ?

আমার নাম শ্রীগৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়? রাধাকান্তমামার ছেলে তুমি?

গৌরা ছোট পায়ে দ্রুত এসে গোপীচন্দ্রের পা দুটি স্পর্শ ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। গোপীচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, এমন ক'রে আমাকে কি দেখছিলে বল তো?

গৌরীকান্ত লজ্জিত ভাবে মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইল।

বল? চুপ ক'রে রইলে কেন? কি দেখছিলে এমন ক'রে? আমার পাকা চুল?

ঘাড় নাড়লে গৌরীকান্ত—না।

তবে? আমি খুব লম্বা?

আবারও ঘাড় নাড়লে গৌরীকান্ত—না।

তবে? তবে কি দেখছিলে? আমি খুব দুষ্টু লোক?

গৌরীকান্তের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। শিশুর চোখের সে বিস্ময় দেখে গোপীকান্ত অপ্রতিভ হলেন, বললেন, তবে?

এবার গৌরীকান্ত বললে, আপনি মহাপুরুষ, তাই আপনাকে দেখছিলাম।

মহাপুরুষ? চমকে উঠলেন গোপীচন্দ্র। কে বললে? আমি মহাপুরুষ, কে বললে তোমাকে?

মা বলছিলেন। বাবা বলছিলেন। আপনি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইস্কুল করেছেন, দীঘি কাটাচ্ছেন, আরও কত করবেন আপনি! আমাদের গ্রাম কত বড় হবে। আপনি নিজে বড়লোক হয়েছেন। আর—

গৌরীকান্তের শ্যামবর্ণ মুখখানি লাল হয়ে উঠল, অকস্মাৎ চুপ ক'রে গেল।

গোপীচন্দ্র মোহগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, আর? বল, আর কি?

আপনার কপালে চাঁদ আছে।

দীর্ঘক্ষণ গোপীচন্দ্র অভিভূত হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, এস, তোমরা আমার সঙ্গে এস। চল, মিছু ময়রার দোকানে যাব।

গৌরীকান্তকে নামিয়ে দিলেন তিনি।

বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন গোপীচন্দ্র। ভাবতে ভাবতেই চলেছিলেন। ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন ভাগ্যকে, প্রণাম জানাচ্ছিলেন ভাগ্য-বিধাতাকে, সার্থক মানছিলেন নিজের জীবনকে। এত দানে তাঁর জীবন ভ'রে উঠল, এত পাওয়া তিনি পেলেন! বাস্তব পারিপার্শ্বিককে আবরিত ক'রে ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে বাজারের লোকের মুখের সেই প্রসন্ন হাসি; কানের পাশে নূতন ক'রে ধ্বনিত হয়ে উঠল সাঁওতালদের কথা—আপুনি রাজা হয়েছিস; ধ্বনিত হয়ে উঠল ওই ছেলেটির কথা, রাধাকান্তের ছেলে গৌরীকান্ত বললে —আপনি মহাপুরুষ, আপনি নিজে বড় হয়েছেন, কত কীর্তি করেছেন, ইস্কুল করছেন, আরও কত করবেন।

করবেন, গোপীচন্দ্র আরও অনেক করবেন। যেতে যেতে তিনি আবার থমকে দাঁড়ালেন। প্রান্তরটার দিকে আবার দৃষ্টি ফেরালেন। সমস্ত প্রান্তরটায় তিনি কীর্তির মালা গেঁথে নবগ্রামের গলায় কণ্ঠহার ক'রে পরিয়ে দেবেন। সারি সারি সুন্দর সুদৃশ্য বাড়ি তৈরি করবেন, মধ্যে মধ্যে চ'লে যাবে লাল মাটির পাকা রাস্তা—লাল সুতোয় সাদা স্ফটিকের হার। বাড়িগুলি হবে ধবধবে সাদা। ইস্কুল হবে, বোর্ডিং হবে, দাতব্য চিকিৎসালয় হবে, টোল হবে, বালিকা-বিদ্যালয় হবে, অনাথ আশ্রম হবে, আরও অনেক —অনেক কিছু হবে এই আদিকাল থেকে বন্ধ্যা পতিত প্রান্তরটা জুড়ে। ওই প্রান্তরটা বোধ করি এতকাল ধ'রে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল।

অবারিত পশ্চিম দিগন্তের দিগ্‌বলয়ে সূর্য তখন পাটে বসেছে, রক্তাভ সূর্য

যেন চাকার মত প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। অস্তায়মান সূর্যের রক্তচ্ছটা গোপীচন্দ্রের সুগৌর মসৃণ ললাটের উপর এসে পড়েছে, তাঁর পলকহীন স্বপ্নবিভোর চোখের শুভ্রচ্ছদে তার প্রতিবিম্ব যেন রাঙিয়ে তুলেছে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন। যুগ চ'লে যাবে, যুগান্তর হবে। তিনি থাকবেন না, তাঁর কীর্তি থাকবে, তাঁর নাম থাকবে, লোকে তাঁকে স্মরণ করবে। ভাবতে ভাবতে চোখ তাঁর জলে ভ'রে উঠল। এই তো সার্থক জীবন, এই তো অমৃত। নবগ্রামের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে থাকবে গণেশ-জননীর কোলের গণেশের মত। কোনও আক্ষেপ নাই তাঁর—বর্তমানে সমাজের প্রধানেরা তাঁকে স্বীকার না করুক, ভবিষ্যৎ তাঁকে স্বীকার করেছে। রাধাকান্ত স্বীকার না করুন, তাঁর ছেলে গৌরীকান্ত তাঁকে স্বীকার করেছে। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে ছেলেদের দিকে চাইলেন, খুঁজলেন গৌরীকান্তকে।—কই? ছেলেটি কই? সবিস্ময়ে গোপীচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কই, সে কোথায় গেল? রাধাকান্তমামার ছেলে?

মুখুজ্জেদের খোকা বললে, সে চ'লে গেল।

চ'লে গেল? কোথায় গেল?

বাড়ি চ'লে গেল।

বাড়ি চ'লে গেল? কেন?

সে সন্দেশ খাবে না। আপনি ওই দিকে কি দেখছিলেন, তখন সে বললে—আমি সন্দেশ খাব না ভাই, আমি বাড়ি যাই, দেরি হ'লে মা রাগ করবে।

গোপীচন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পঞ্চানন বললে, ওরা বাবু কিনা। ওরা পরের কাছে সন্দেশ খাবে কেন?

গোপীচন্দ্র বললেন, চল, তোমরা চল। তোমরা খাবে চল।

আট

গোপীচন্দ্রের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীকে লোকে বলে—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। দেহের গঠনের মধ্যে নাকি লক্ষ্মী-আশ্রিতা নারীর সকল লক্ষণ পরিস্ফুট, বিশেষ ক'রে তাঁর পায়ের পাতায়। এমন সুলক্ষণযুক্ত পায়ের পাতা দেখা যায় না। গোটা পাতাটি মাটির উপর সমান হয়ে পড়ে, এতটুকু ফাঁকা কোথাও থাকে

না। তেমনই কি সুন্দর কপালের গড়ন তাঁর। অন্নপূর্ণা দেবীকে ঘরে এনেই গোপীচন্দ্রের ভাগ্যের এত উন্নতি।

ভাগ্য, লক্ষণ, জন্মান্তরের পুণ্যফল এ সমস্তের উপর একালের মানুষের অগাধ বিশ্বাস। এ ছাড়া আর কোন কিছু দিয়েই যে—রাজার ফকির হওয়া, কি ফকিরের রাজা হওয়ার রহস্যের অর্থ করা যায় না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত এ বিশ্বাসের ভিত্তি পাহাড়ের মত শক্ত। সে কথা বাদ দিয়ে, অর্থাৎ ভাগ্য লক্ষণ জন্মান্তরের পুণ্যফল গুণে এবং পরিমাণে যতই এবং যেমনই হোক সে কথা বাদ দিয়ে, অন্নপূর্ণা দেবীর সাংসারিক গুণপনা বিচার ক'রে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, লক্ষ্মী-আশ্রিতা কথাটা তাঁর সম্পর্কে এক বিন্দু অতিরঞ্জন নয়। যেমন তাঁর স্বাস্থ্য, তেমনই তাঁর কর্মক্ষমতা, তেমনই তিনি মিতব্যয়ী। ভোরবেলা উঠে তিনি এই বিশাল সংসারের দশ দিকে দশভুজার মত হস্ত বিস্তার ক'রে দেন। গোটা তিন-মহলা বাড়িটার প্রতিটি কোণ সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে, যেখানে যে ময়লাটুকু ঝি-চাকরের মার্জনা এড়িয়ে থেকে গেছে, সেটুকু পরিষ্কার ক'রে বাড়ির বাসন গুনে নেন। ছেলে বউ মেয়ে জামাই কর্মচারী চাকরবাকরে বাড়িতে নিত্য প্রতি বেলায় পাতা পড়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশখানা। গোপীচন্দ্রের মত ধনীর বাড়িতে বাসনের ব্যবস্থা একখানা থালা একটা বাটি, একটি গেলাসে চলে না, অনেক বেশি লাগে। ডালের, ঝোলের, দুধের তিনটে বাটি, অম্বলের একটা পাথর বাটি, ঘিয়ের জন্য একটা ছোট বাটি, নুনের জন্য একটা ছোট চাকতি—এ লাগে নিত্য। খাওয়াদাওয়ার বিশেষ আয়োজন হ'লে তার জন্য বের হয় পৃথক বাসন। বিশিষ্ট অতিথি এলে বের হয় রূপোর বাসন। সেই সব বাসনের হিসাব তিনি নিত্যনিয়মিত ক'রে থাকেন, একটি একটি গুনে দেখে নেন। তারপর বসেন তরকারির ডালা এবং বঁটি নিয়ে—ভাতে দেবার আলু, ভাজবার পটল বেগুন উচ্ছে, ঝোলের আলু ছেলেমেয়েদের জন্য গুনে হিসাব ক'রে পাত্রে সাজিয়ে ঠাকুর রামতারণকে বুঝিয়ে দেন। তারপর ঝি শঙ্করীকে সঙ্গে নিয়ে যান ঠাকুরবাড়ি, সেখানকার পূজা-ভোগের আয়োজন দেখেন, সেখানকার বাসনপত্রও মিলিয়ে দেখেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেই এক দিকে গোপীচন্দ্রের জমিদারির কাছারি এবং বিশাল কয়লার ব্যবসায়ের ছোট আপিস একটি। সেখানেও অন্নপূর্ণা দেবী গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে তবে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফিরে মন্ত্র স্মরণ ক'রে জল খেয়ে বসেন গোবরের তাল নিয়ে। বাড়ির পাকা পাঁচিলে নিজে গোবর মেখে ঘুঁটে দেন। ঘুঁটের পয়সার জন্য যে তিনি ঘুঁটে দেন তা নয়, তিনি বলেন—স্বামীর সংসারে যখন

আসি তখন ঘুঁটে দিয়েছি, আজ অবস্থা ভাল হয়েছে, মা-লক্ষ্মী দয়া করেছেন ব'লে ঘুঁটে দেওয়া ছেড়ে দেব? মা যদি আমার ঘুঁটে দেওয়ার পুণ্যেই এসে থাকেন, তবে সে পুণ্যের অভাবে যে মা ছেড়ে যাবেন। মধ্যে মধ্যে ভাজুনীর সঙ্গেও ব'সে যান মুড়ি ভাজতে। এব পব স্নান-আহার, স্বল্প বিশ্রাম, তারপর আবাব বিকেলে সকালবেলাব কাজের প্রায় পুনরাবৃত্তি; এব মধ্যে নূতন আছে—দুধ ভাগ করা। বলতে ভুলেছি, সকালের দিকে আর একটা কাজ আছে দুধ দেখে নেওয়া। গোপীচন্দ্রের গোশাল প্রকাণ্ড। সেখানে তিনি দেশী গাই বড় একটা রাখেন না। বড় বড় পাঞ্জাবের গাই, এক-একটায় দুধ দেয় পাঁচ সের সাত সের; এমন গাই আছে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা। এর মধ্যে একসঙ্গে দুধ দেয় তিন-চারটে। পনরো সের আধ মণ দুধ নিত্য হয় গোপীবাবুর বাড়িতে। সেই দুধ দেখে নেওয়া একটা বড় কাজ। মাপ দেখে নিতে হয়, দুধের ঘনত্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিতে হয়। পরিমাণে না কমিয়ে জল মিশিয়ে দুধ চুরি করলে ধরা মুশকিল, কিন্তু অন্নপূর্ণা দেবী ঠিক বুঝতে পারেন। মধ্যে মধ্যে তিনি দু-একদিন হুট্ করে গিয়ে গোশালায় হাজির হন ঠিক গাই দুইবার সময়টিতেই। ওই দুধ আবার জ্বাল দেওয়ার ব্যবস্থা দু-তিন রকমে। আধা জল, সিকি জল মিশিয়ে, জল ঠেকিয়ে, খাঁটি দুধ জ্বাল দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি দাঁড়িয়ে থেকে ক'রে থাকেন। বিকেলবেলা গেলাসে বাটিতে সেই সব দুধ ভাগ ক'রে সাজিয়ে রেখে দেন। রাত্রে তিনি গিয়ে বসেন ঠাকুববাড়ির নাটমন্দিবে। আরতির পর কাছারির নায়েব জমা-খরচের খাতা নিয়ে তাঁর সামনে বসে। সমস্ত দিনের জমা-খরচেব হিসাব তাঁকে শুনিয়ে দেয়। অন্নপূর্ণা দেবীর বয়স পঞ্চাশের উপর, অর্থাৎ তাঁব জন্মকাল গিয়ে পড়ে ইংরেজী পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালে; সেকালে বাংলার পল্লীগ্রামে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ তো ছিলই না, উপরন্তু বিশ্বাস ছিল—লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের ভাগ্যদেবতা বিরূপ হন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকালবৈধব্য ঘটে ব'লে প্রবাদ ছিল। সভ্য বর্ধিষ্ণু-সমাজসম্পন্ন দু-চারখানা গ্রামে বড় বড় ঘরে দু-চারটি মেয়ে লেখাপড়া শিখত। তাও সে লেখাপড়া আঁকাবাঁকা হরফে, ভুল বানানে ভরা লেখা, এবং কোন রকমে রামায়ণ মহাভারত পড়া—কৃত্তিবাসের ও কাশীরাম দাসের পয়ারের রামায়ণ-মহাভারত, সংস্কৃত-ঘেঁষা গদ্য রামায়ণ-মহাভারত নয়। অন্নপূর্ণা দেবীও লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু স্বামীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু সম্পত্তি যখন তাঁর নামে হতে লাগল, দলিলে দস্তাবেজে সই করবার প্রয়োজনে তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সে সংসারের অবসরে লেখাপড়া শিখলেন। লেখা-

পড়া যৎসামান্য হ'লেও এই মেয়েটির হিসাবজ্ঞান এবং বৈষয়িক বুদ্ধি অসামান্য প্রখর ছিল। নায়েবের হিসাব-নিকাশ শুনে তিনি সে হিসাব বুঝে এং বৈষয়িক ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাঁর নিজের একটা স্বতন্ত্র সুদি কারবার আছে। সামান্য টাকার কারবার নয়, অন্তত দশ-পনরো হাজার টাকা নিয়ে তিনি তাঁর এই নিজস্ব কারবারটি চালিয়ে থাকেন তাঁর নামে গোপীচন্দ্রের লাখ লাখ টাকা খাটে, সে টাকা বাদ দিয়ে এ টাকা তাঁর নিজস্ব।

ভাগ্যবতী অন্নপূর্ণা দেবী ভাগ্যের অহঙ্কারে স্বাভাবিক ভাবেই অহঙ্কৃতা, তার উপর ভাষা তাঁর কর্কশ এবং বাক্য অত্যন্ত রূঢ়। গোপীচন্দ্রের বিনীত প্রকৃতি এবং মধুর ভাষার ঠিক বিপরীত। ছেলে মেয়ে বউ অন্নপূর্ণা দেবীর ভয়ে অস্থির, গোপীচন্দ্রও অন্নপূর্ণা দেবীকে ভয় ক'রে চলেন।

খেতে ব'সে গোপীচন্দ্র স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাঁব মেজাজটা বুঝে নিলেন। অন্নপূর্ণা দেবীর মুখ গম্ভীর। গোপীচন্দ্র নীরবেই আহারে মনোনিবেশ করলেন। ভেবে পেলেন না, কোন্ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা শুরু করলে স্ত্রীর মেজাজ নরম হয়ে আসবে!

দুটি প্রস্তাব আছে তাঁর।

প্রথম প্রস্তাব, অন্নপূর্ণা দেবীর নামে তিনি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। এর জন্য অন্নপূর্ণা দেবীকে একটি কাজ করতে হবে। এবার সাহেব আসবেন হাই ইংলিশ ইস্কুলের ভিত্তি স্থাপন করতে, তখন অন্দরের বাইরের দিকে উঠানে ছোট একটি মণ্ডপে অন্নপূর্ণা দেবীকে উপস্থিত হয়ে একটা রূপার থালায় এক হাজার টাকা সাহেবের টেবিলের উপর নামিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে—অবশ্য গোপীচন্দ্রই তাঁর হয়ে ব'লে দেবেন—এই টাকা আমি আপনার হাতে দিচ্ছি একটি বালিকা-বিদ্যালয় যাতে স্থাপিত হয়, তাই করতে হবে হুজুর বাহাদুরকে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব, তিনি অন্নপূর্ণা দেবীকে রাধাকান্তের স্ত্রীর কাছে পাঠাতে চান। গৌরীকান্তের জন্য কিছু মিষ্টি পাঠাবেন তিনি।

প্রথম প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর খুব আশঙ্কা নাই। অন্নপূর্ণা দেবী রাজী হবেন। প্রথমে হয়তো 'না' বলবেন, কিন্তু রাজী হবেন, নিজে রাজী না হলেও ছেলেমেয়েরা তাঁকে রাজী করাবেই। আশঙ্কা তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে। হয়তো জ্ব'লে উঠবেন অন্নপূর্ণা দেবী। হয়তো বলবেন—কি বললে? আমি যাব থালা হাতে নিয়ে?

দাদা!

গোপীচন্দ্র মুখ তুললেন। তাঁর বোন জ্ঞানদা এসে ঘরে ঢুকল।

অন্নপূর্ণা দেবী মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন। গোপীচন্দ্র মিষ্টি হেসে সম্ভাষণ জানালেন, জ্ঞানো! আয়, ব'স।

জ্ঞানদা বসলেন, হাঁটুতে হাত দিয়ে একটু কষ্ট ক'রে বসতে হ'ল তাঁকে, বললেন, বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি দাদা। একবার বেলেগাঁয়ে ধরমবাবার কাছে না গেলে আর চলছে না। এই রবিবারে পাড়ার এক দল যাবে, তা তোমার মত না নিয়ে তো—। একটু হাসলেন জ্ঞানদা, তারপর বললেন, বউকে শুধালাম তো বউ বললে—আমি জানি না, তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কব। কি করব বল? যাব?

গোপীচন্দ্র স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। অন্নপূর্ণা দেবী বললেন, আমি কি বলব? যা বলবার তুমি বল। ওরা সব যাবে হেঁটে। ঠাকুর-ঝিকে হেঁটে পাঠাতে চাও, পাঠাও। লোকে যখন শুনবে—অমুক গাঁয়ের অমুক বাবুব ভগ্নী হেঁটে এসেছে, তখন তারা বলবে কি!

গোপীচন্দ্র বললেন, ওঁদেব সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হয় যাও, বারণ করব না। কিন্তু গিন্নী ঠিক বলেছে, হেঁটে যাওয়া হবে না তোমার, গাড়ি ক'রে যাও। গাড়িব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

হাঁটুতে হাত বুলিয়ে জ্ঞানদা বললেন, তাতে কথা হবে না? সকলে হেঁটে যাবে, আর—। থেমে গেলেন জ্ঞানদা। একটু থেমে আবার বললেন, বলবে—বড়লোকের—

বাধা দিয়ে অন্নপূর্ণা বললেন, তা বলুক।

গম্ভীব ভাবে গোপীবাবু বললেন, তা হ'লে তুমি আলাদা যাও জ্ঞানদা।

জ্ঞানদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। সঙ্গী-সাথী নিয়ে দল বেঁধে দেবস্থলে যাওয়া মেয়েদের একটা বড় আনন্দ। বললেন, তাই যাব। তোমার মান খাটো হয় এমন কাজ করব কেন?

ঠাকুর এসে গোপীচন্দ্রের থালার পাশে অম্বলের পাথরবাটি নামিয়ে দিলে। জ্ঞানদা পাথরবাটির দিকে তাকিয়ে গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ে যেন অবাক হয়ে গেলেন, তারপর লম্বা টানা সুরে বললেন, হ্যাঁ বউ, আমার দাদার পাতে ভাঙা পাথরবাটিতে অম্বল! কি ব'লে তুমি ওই ভাঙা পাথর-বাটি দিতে বললে ঠাকুরকে?

অন্নপূর্ণা দেবী অপ্রস্তুত হলেন। কথাটা অন্যায় বলেন নি জ্ঞানদা। জ্ঞানদা গলা চড়িয়ে ডাকলেন, তারণ—রামতারণ!

গোপীচন্দ্র পাথরবাটিটা তুলে নিয়ে ভাঙা মুখে অম্বলের ঝোল গড়িয়ে

নিয়ে, হেসে বললেন, তুমি জান না জ্ঞানদা, ভাঙা পাথরবাটিটায় অম্বল খেতে আমি ভালবাসি, দেখ না—অম্বলের ঝোল গড়িয়ে নিতে কত সুবিধে!

অন্নপূর্ণা হেসে ফেললেন। জ্ঞানদাও হাসলেন। গোপীচন্দ্র বললেন, বগি থালার চেয়ে কানা-উঁচু থালায় ভাত খেতে আমি ভালবাসি। বাটিতে ডাল খাওয়ার চেয়ে ভাতের মাথায় গর্ত ক'রে ডাল নিয়ে খাওয়া আমার পছন্দ বেশি। কিন্তু করব কি? বাইরে হবার তো জো-ই নেই, ঘরেও তোমরা সব হাঁ-হাঁ করবে।

জ্ঞানদা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তর এনে ফেললেন, তিনি বোধ হয় এমনই একটি মিষ্ট আবহাওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন। বললেন, আর একটি কথা বলছিলাম আমি দাদা।

কি? কলকাতায় একবার বাতের চিকিৎসা করাবে?

সে পরে হবে দাদা। আগে বাবার দয়া দেখি। তারপর না সারে তো তখন তুমি আছ, ভাইপোরা রয়েছে, সে কি আর না-দেখানো হবে! পবিত্র তো বলছিল—চল না কেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। সে কথা নয়।

তবে?

পবিত্র বলছিল, ওরা সব ছেলেপিলেরা মিলে একটা থিয়েটার করবে। কলকাতার মত।

থিয়েটার করবে?

হ্যাঁ। তোমার দৌলতে আমরা কলকাতা যাই আসি, আমরা কলকাতায় না হয় থিয়েটার দেখেছি। গাঁয়ের লোকে তো দেখে নাই। গাঁয়ের সব ছেলেদেরও খুব সাধ। তা আমাকে এসে ধরেছিল—তুমি বাবাকে ব'লে দাও পিসীমা।

গোপীচন্দ্রের কপালে সারি সারি চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি চিন্তিত হলেন। থিয়েটার! তাঁর আমলেই এ গ্রামে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ওই রাধাকান্ত-স্বর্ণকমল—এঁরা এক সময় যাত্রার দল গড়েছিলেন। দীনবন্ধুবাবু উকিল ছিলেন, রাধাকান্ত তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সন্তান; আদর পেয়ে লেখাপড়া করেন নি, কিন্তু শখ ছিল প্রচুর, তিনি উদ্যোগী হয়ে যাত্রার দল করেছিলেন। পবিত্র—!

অন্নপূর্ণা বললেন, আমাকে বলেছিল। আমি বলেছি—বাবু মত করেন তো আমার অমত নেই। আমাকে টাকার জন্যে ধরেছিল। তাতেও ওই কথা আমার, বাবু বললে দোব।

ছোট ছেলে পবিত্র সম্পর্কে তিনি অনেক আশা করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কল্পনা করতেন, এই ছেলেটির বিদ্যাগৌরবে তাঁর এই সম্পদগৌরব ধন্য হবে, সোনার কলসের চূড়া-বসানো মন্দিরের মত সমগ্র দেশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। ছেলেটিকে ভালও বাসতেন প্রাণের তুল্য। সে যা যখন চেয়েছে, তাই তখনই দিয়েছেন। পবিত্রের রুচি এবং ব্যবহার দেখে এ আশা তাঁর আরও উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। পবিত্রের ভাষা তাঁর মত মধুর, প্রকৃতিও তাঁর মত মিষ্ট, সে ইস্কুলে পড়তে পড়তেই পদ্য রচনা করে, গান-বাজনায় গাঢ় অনুরাগ, প্রচুর বই কেনে এবং পড়ে। বেশভূষায় এমন সুন্দর বৈশিষ্ট্য তার ফুটে ওঠে যে গোপীচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে যান। সেই পবিত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল। তিনি এমন আশঙ্কা স্বপ্নেও করেন নি। তবুও ছেলেকে ডেকে তিনি তিরস্কার করলেন না, সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, ভাল ক'রে পড় এবার।

পবিত্র আবার এক বৎসর পড়লে। ভাল ক'রে পড়লে, তাতে সন্দেহ রইল না কারুর। বই পড়ার বিরাম ছিল না তার। লেখারও বিরাম ছিল না। বৎসর শেষ হতে না হতে ছোট একখানি উপন্যাসও ছাপিয়ে ফেললে। কিন্তু পরীক্ষাতে আবারও ফেল ক'রে বসল।

পবিত্রের জীবনে তখন বাংলা দেশের অন্য হাওয়া লেগেছে। গোপীবাবু তাকে পণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীভূষিত দেখতে চেয়েছিলেন। পবিত্র তাঁর প্রেরণা গ্রহণ করেছে নিজের মত ক'রে ; সে হতে চেয়েছে সাহিত্যিক কবি। বাংলা দেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে নূতন জাগরণ হয়েছে সেই জাগরণের স্পর্শ তার মর্মকে উতলা করেছে। এদিক দিয়ে তার আর একজন সহযাত্রী এবং বন্ধু আছে এই নবগ্রামেই। মুখুজ্জেদের কিশোর তার সমবয়সী, সহপাঠী এবং সহযাত্রী। কিশোরের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা আজীবন। কিশোর কিন্তু বুদ্ধিতে এবং স্মৃতিশক্তিতে পবিত্র অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। সে প্রথম বারেই এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলেজে পড়ছে। দ্বিতীয় বার ফেল করার সঙ্গে সঙ্গে গোপীচন্দ্র সচেতন হলেন। পবিত্রের লেখা উপন্যাসখানি গোপনে কিনে মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। একটি প্রেমের কাহিনী। ছেলেকে ডেকে বললেন, আর ইস্কুলে পড়তে হবে না। ঘরে মাস্টার থাকুন, ইংরিজী পড়। আর আপিসে বের হও।

কলকাতার আপিসে ভর্তি হ'ল পবিত্র। হঠাৎ আজ শুনলেন, সে গ্রামে থিয়েটার করতে চায়।

অন্নপূর্ণা দেবী পবিত্র সম্পর্কে স্বামীর মনোবেদনার কথা জানেন, তাই কথাটা নিজে না ব'লে জ্ঞানদাকে দিয়ে বলালেন। ঠিক সেই কারণেই এতখানি বিনয় এবং ভক্তির আতিশয্য।

গোপীচন্দ্র হাসলেন এবার। হাসলেন অন্নপূর্ণার বিনয় এবং তাঁর প্রতি ভক্তির আতিশয্য দেখে। পবিত্র লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার জন্য গোপীবাবুর মনে আক্ষেপ আছে। মনে মনে তাঁর এই দিক দিয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি নিজে দরিদ্রের সন্তান, লেখাপড়া শেখবার অবকাশ পান নাই, তাঁদের কালে লেখাপড়া শেখার সুযোগও ছিল না। তাঁর বাল্যকালে ফারসী মক্তব উঠি-উঠি করছে, দেশে ফারসীর বদলে ইংরেজী ভাষার প্রচলন সবে শুরু হয়েছে। বাংলাছাত্রবৃত্তি ইস্কুল সদ্য সদ্য দেশে দু-চারটে হচ্ছে, সংস্কৃত টোলেব পণ্ডিতদের তখন দুরবস্থার একশেষ বললেই হয়, জমিদার-রাজাদের বাড়িতে টোল আছে বটে, ছাত্র বিশেষ হয় না। অনেক পণ্ডিত নিজেদের বাড়িতে টোল রাখেন, সেখানে ছাত্র দুটি একটি। সংস্কৃত শিখে পুরোহিতপূজক হওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। পণ্ডিতদের খ্যাতি ও সম্মান তখন এক রকম বিলুপ্ত হয়েছে বললেই হয়, বরং বিপরীত খ্যাতি রটেছে। সভ্যসমাজ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শুনলেই ঠোঁট ওলটায়, অন্তরালে বলে—গোঁড়া। লোভী স্বার্থপব ব'লে অবজ্ঞা করে। নইলে হয়তো গোপীচন্দ্র সংস্কৃত পড়তেন। ওই বিদ্যাটি বিনামূল্যে পাওয়া যেত। ছাত্রবৃত্তি প'ড়ে চাকরি-বাকরি পাওয়া যেত ; কিন্তু বেতনের জন্য পড়া তাঁর হয় নি। তাই তাঁর জীবনে যখন প্রতিষ্ঠা এল, যখন তিনি ব্যবসায়ী ধনকুবেরদের সমাজে ঘোরাফেরা শুরু করলেন, তখন তাঁর এই আক্ষেপ জাগল। বড় বড় পণ্ডিতদের নাম এবং সম্মান তিনি প্রত্যক্ষ করলেন। দেশে তখন ইংরেজী শিক্ষার হাওয়াও জোর বইতে শুরু করেছে।

বড় ছেলে কীর্তিচন্দ্র জেদী। অত্যন্ত জেদী। তা ছাড়া বাল্যকাল থেকেই তার ব্যবসায় প্রবল অনুরাগ। প্রচুর সযত্ন ব্যবস্থা সত্ত্বেও সে অল্প দূর প'ড়েই ইস্কুল ছেড়ে দিলে, গোপীচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে সে শুরু ক'রে দিলে কয়লা-কেনা-বেচা ব্যবসা। অগত্যা গোপীচন্দ্র তাকে ব্যবসায়ের গদিতে বসিয়ে দিলেন। প্রয়োজনও ছিল। তাঁর ব্যবসা তখন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ; শুধু ভারতবর্ষ কেন, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, এডেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ইংলণ্ড পর্যন্ত কারবার চলছে ; বাংলা দেশের ঝরিয়া ও বরাকর কয়লা-এলাকায় তাঁদের খনির সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি। ভারতবর্ষে ইংরেজ কয়লা-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত তাঁদের ব্যবসায়কে ঈর্ষার চক্ষে দেখে।

এই ব্যবসায়ে তিনি কীর্তিচন্দ্রকে বসিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন, অন্যান্য অংশীদারদের সঙ্গে ব্যবসায়বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় কীর্তিচন্দ্র হার মানবে না।

অন্নপূর্ণা দেবী ভ্রূকুটি ক'রে বললেন, হাসলে যে! গোপীচন্দ্রের হাসিটুকু তাঁর গায়ে স্বাভাবিক ভাবেই বেজেছে।

হাসি হ'ল আনন্দের লক্ষণ গিন্নী, আনন্দ হ'ল ব'লে হাসলাম। ভারি মিষ্টি লাগল তোমার কথাগুলি। তা ছাড়া আরও একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। ছেলেবেলায় যাত্রা দেখে আমার ভারি শখ হয়েছিল—যাত্রার দলে যাবার। টুকটুকে চেহারা ছিল—অধিকারী মহাখুশি। বলে—রাধা সাজাব তোমাকে। গেলে কি হ'ত বল দেখি?

ভালই হ'ত। চন্দ্রলগ্নে পুরুষ তুমি, শেষ পর্যন্ত যাত্রার দলের অধিকারী হতে। পাটি-পাড়া চুল মাথায় দিয়ে দূতী সেজে আসর আলো ক'রে বসতে। বুদ্ধিমতী অন্নপূর্ণা রসিকতাটুকু শেষ ক'রে স্বামীর আসল বক্তব্যের জবাব দিলেন, বললেন, তা পবিত্র তো পেশাদারী থিয়েটারে চাকরি করতে যাচ্ছে না। শখ ক'রে দু-চার বার থিয়েটার করবে।

আলোচনায় বাধা পড়ল। নায়েব প্রসন্ন মিত্র এসে বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলে, কর্তাবাবু!

প্রসন্ন!—ঈষৎ চকিত হলেন গোপীচন্দ্র। এই কিছুক্ষণ আগে তিনি কাছারি থেকে উঠে এসেছেন। কাজকর্ম শেষ ক'রে এসেছেন। আবার কি কাজ পড়ল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু কাজ ছিল।

এস, ভেতরে এস।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কেরানী এসেছেন। সাহেবের চিঠি এনেছেন।

কি চিঠি? কি লিখেছেন? চিঠি কই?

বিশেষ জরুরী চিঠি না হ'লে কেরানীকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা নয়। সাধারণত চিঠি ডাকেই আসে। সরকারী হুকুম, আদালতের নির্দেশ এ আসে পিওন মারফৎ, তারা জারি ক'রে যায় নোটিশ এবং সমন।

প্রসন্ন মিত্র বললেন, অমরবাবু চিঠি পড়ছেন, কীর্তিবাবু আছেন, পবিত্রবাবু—

অমরবাবু? আমাদের অমর?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সে কোথা থেকে এল? কখন এল? গোপীচন্দ্রের মুখের শুভ্র বর্ণে

রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। উত্তেজনার স্পর্শ লেগেছে তাঁকে। অমরচন্দ্র অন্নপূর্ণা দেবীর বোনপো। বাল্যে পিতৃহীন অবস্থায় দরিদ্র ছিলেন। গোপীচন্দ্রই তাঁকে মানুষ ক'রে তুলেছেন। ছেলেরা তাঁর লেখাপড়া শিখলে না, কিন্তু অমরচন্দ্র তাঁর মর্যাদা রেখেছে। কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ ক'রে এলাহাবাদে কলেজে প্রফেসারি করছে। অমর এমন হঠাৎ চ'লে এল? তবে এসেছে ভালই হয়েছে, আজ তাকেই যেন প্রয়োজন তাঁর সব চেয়ে বেশি। তিনি প্রসন্নকে বললেন, চল, যাই।

দুধের বাটিটা তিনি টেনে নিলেন।

ভালই হয়েছে। অমরকে তিনি এখন ছেড়ে দেবেন না। ইস্কুলের কাজকর্মের সকল ভার তার উপরেই তুলে দেবেন। সায়েব আসবেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে, তার উদ্যোগ অমরই করুক। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে অন্নপূর্ণাকে রাজী সে-ই করাবে।

পবিত্র থিয়েটার খুলবে। তার ভাল-মন্দও অমরের কাছেই ভাল ক'রে বুঝবেন তিনি।

আহম্মদ সাহেব কেরানী পাঠিয়েছেন।

কমিশনার সাহেবের আপিস থেকে জরুরী পত্র এসেছে—"নবগ্রামে জনৈক গোপীচন্দ্র লড়িয়া নামক সিচের পুকুর কাটিয়া ওখানকার উত্তরাংশের জমির জলনিকাশী নালা এবং দক্ষিণাংশের জল সেচের নালা বন্ধ করছে। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ারের আপিসের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগে এই ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে ব'লে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। স্থানীয় লোক প্রতিবাদ ক'রে তারযোগে আবেদন জানিয়েছে। অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য জেলার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি যেন স্বয়ং এর তদন্ত ক'রে যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কেরানীকে পাঠিয়েছেন। যথারীতি নোটিশ হাতে দিয়ে নোটিশে জানিয়েছেন—"এতদ্দ্বারা গোপীচন্দ্র ব্যানার্জি, তোমাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তদন্তসাপেক্ষ তুমি লড়িয়া নামক পুষ্করিণী কাটানো বন্ধ রাখিবে। আগামী মাসের দোসরা তারিখে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গিয়া তদন্ত করিয়া সত্যাসত্য নির্ধারণপূর্বক আদেশ দিবেন।"

আরও একখানি পত্র পাঠিয়েছেন সাহেব। ডি. ও. অর্থাৎ আধাসরকারী আধা-ব্যক্তিগত পত্র। নিজ হাতে লিখেছেন। আগামী দোসরা স্কুলে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন স্থির করা হ'ল। এখান থেকে সরকারী কর্মচারীরা

এই অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগ দেবেন। প্রত্যেককে যেন নিমন্ত্রণ করা হয়। এস. ডি. ও., এস. পি., সিভিল সার্জন, দুজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্‌, পাশের সাব-ডিবিশনের এস. ডি. ও., নবগ্রামের চৌকির মুন্সেফ, সার্কেল পুলিশ ইন্সপেক্টর—এঁরা প্রত্যেকেই গোপীচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে বিশেষ আনন্দিত হবেন।

কেরানীটি বিনীত হাসি হেসে বললে, পুকুর নিয়ে ওই নোটিশটার জন্য ভাববেন না। সাহেব খুব চ'টে গিয়েছেন। বেনামী ব্যাপার হ'লেও তিনি বুঝতে পেরেছেন—কে করেছে দরখাস্ত। তবু আইন মেনে তো চলতে হবে। একটা তদন্ত তিনি করবেন।

পকেট থেকে দুখানি পত্র বার ক'রে দেখিয়ে আবার বললে, স্বর্ণবাবুকেও পত্র দিয়েছেন। একখানা নোটিশ, একখানা পত্র। নোটিশে লিখেছেন—এই তদন্তের সময় মতামত জানাবার তোমার প্রয়োজন হবে ব'লে মনে করি। তুমি দোসরা তারিখে বেলা দশটার সময় পুকুরের ওখানে উপস্থিত থাকবে।

অপর পত্রখানি পত্রই, নোটিশ নয়। কিন্তু গোপীচন্দ্রের পত্রের মত সাহেবের নিজের হাতে লেখা ডি. ও. অর্থাৎ আধা-সরকারীও নয়, রীতিমত সরকারী ভঙ্গিতে কেরানীর হাতে লেখা পত্র—প্রতিটি শব্দ ও ছত্র হাকিমী সুরে গাঁথা। পত্রখানি বন্ধ ছিল, কেরানীবাবুটি মুখেই গড়গড় ক'রে ব'লে গেলেন ভিতরের পত্রমর্ম, তিনিই নিজে হাতে লিখেছেন। পত্রে জেলার রাজপ্রতিনিধি লিখেছেন—নবগ্রাম শিবচন্দ্র এম. ই. স্কুল পরিদর্শন ক'রে স্কুলের অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে ওই স্কুলের সেক্রেটারি হিসাবে কতকগুলি মারাত্মক ক্রটির কথা জানাতে চাই। স্কুলের বাড়ির যে রকম শোচনীয় অবস্থা, তাতে ওই বাড়িতে স্কুল থাকা উচিত নয়। ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং তাদের মন এমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কখনই স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না। স্কুলের প্রতিটি আসবাবও অনুরূপ ভাবে জীর্ণ। আরও দুঃখের কথা, স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ নিয়মিত ভাবে বেতন পান না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি প্রতিনিধিমূলক নয়, কমিটির মনোভাব স্কুল সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে উদাসীন, সেক্রেটারি হিসাবে তোমার পরিচালনা অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। এই সব বিবেচনা ক'রে তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি অবহিত হয়ে তিন মাসের মধ্যে স্কুলের যাবতীয় সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ ক'রে ফেল, নূতন ক'রে ম্যানেজিং কমিটি গঠন কর। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, গ্রাম্য বিবাদ হেতু যোগ্যতম ব্যক্তিদের সযত্নে কমিটি থেকে বাদ

দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অবিলম্বে বর্তমান মাসের মধ্যেই হাল-ফিল পরিশোধ করা চাই। অন্যথায় স্কুলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হবে। প্রয়োজন হ'লে সরকার হস্তক্ষেপ ক'রে সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

নিচে লেখা আছে—জেলা স্কুল ইন্সপেক্টারের কাছে পত্রের নকল পাঠানো হ'ল।

কীর্তিচন্দ্রের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। অমরচন্দ্র চুপ ক'রেই ব'সে ছিলেন। পবিত্র যেন একটু লজ্জিত হয়েছে। তার মনে হয়েছে, এ যেন গোপনে পরচর্চা হচ্ছে।

গোপীচন্দ্র গম্ভীর স্তব্ধ। নীল চোখের দৃষ্টিতে এতক্ষণ পর্যন্ত একটি পলক পড়ে নাই। এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষীণ এক টুকরো বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। কেরানী-বাবুর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, আপনি তা হ'লে বিশ্রাম করুন আজ। কাল সকালে সাহেবকে পত্র লিখে দেব।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আবার বললেন, তাই হবে। সাহেব যা হুকুম করেছেন, তাই করব আমি। পুকুর কাটানো বন্ধই রইল। আব দোসরা তারিখেই ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন লেইংয়ের আয়োজন করছি আমি।

কেরানীবাবু বললেন, আমি একবার স্বর্ণবাবুর ওখান হয়ে আসি। সকালে দেখা ক'রে ফিরতে আমার দেরি হবে।

বেশি দেরি করবেন না। এখানে আহার প্রস্তুত হয়ে গেছে বোধ হয়। মিত্রের দিকে ফিরে বললেন, ওঁর বিছানা তৈরি করিয়ে রাখ মিত্তির।

গোপীচন্দ্র বাড়ি ফিরে খাটের উপর স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন। ফুরসীতে তামাক পুড়ে যাচ্ছে, কল্কের মাথা থেকে সরু সাপের মত এঁকে-বেঁকে নীলচে ধোঁয়া উঠছে, মিষ্ট গন্ধে ঘরখানা ভ'রে গেছে, নলটা বিছানার উপরেই প'ড়ে আছে, গোপীচন্দ্র নলটা স্পর্শও করেন নাই। অমরচন্দ্র কীর্তি পবিত্র—এরা খেতে বসেছে দরদালানে। অমরচন্দ্রের সঙ্গে দু-তিনটি কথা বলেছেন মাত্র। প্রশ্ন করেছেন—ভাল আছ?

হ্যাঁ। আপনার শরীর—

শারীরিক ভালই আছি। তুমি হঠাৎ—। আচ্ছা থাক্, কথাবার্তা পরে হবে। খাওয়া-দাওয়া ক'রে উপরে এস। হাত মুখ ধোও।

ব'লেই তিনি উপরে এসে বসেছেন। মনের মধ্যে যেন একটা ঝড় বইছে। দুরন্ত ক্ষোভে তাঁর সারা অন্তরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কি কদর্য

এই সব মানুষ! আর এরাই হ'ল সমাজের প্রধান, এরাই হ'ল গ্রামে দেশে সম্মানিত; এদেরই প্রশংসায় লোকে পঞ্চমুখ! তিনি সিচ বন্ধ করতে চান না, জল-নিকাশী নালার মুখও বন্ধ করবেন না, সে কথা তিনি নিজে সবিনয়ে সেদিন স্বর্ণকে বলেছেন। কিন্তু অকারণে শুধুমাত্র গভর্মেণ্টের ঘরে তাঁকে নিন্দাভাজন করবার জন্মই এই টেলিগ্রাম স্বর্ণ করেছে।

একা স্বর্ণকেই বা দোষ কেন? এই নবগ্রামের সমস্ত ভদ্র সমাজ আজ তাঁর বিরোধী। তাঁর অপরাধ—তিনি জন্মেছিলেন দরিদ্রের ঘরে। কুলগৌরবে তিনি কারুর চেয়ে খাটো নন, উচ্চ কুলীন ব্রাহ্মণ-বংশের সন্তান, ওই স্বর্ণকমলেরই জ্ঞাতি। দরিদ্র হয়ে জন্মেছিলেন; কিন্তু নিজের কর্মবলে, ভাগ্যফলে তিনি আজ ধনের অধীশ্বর বললেও অত্যুক্তি হয় না, তবুও ওই এক অপরাধে তাঁকে নবগ্রামের এই ক্ষুদ্র জমিদার-বংশধর-সম্প্রদায় অস্বীকার করতে চায়, তাঁর সকল কর্মে বাধা দিতে তারা বদ্ধপরিকর। ঈর্ষাতুর কুটিলচিত্ত চরিত্রভ্রষ্ট এই গ্রাম্য অভিজাতগুলি অন্তরে যত ক্ষুদ্র, প্রকৃতিতে তেমন জটিল। এই হাই ইংলিশ স্কুল হ'লে সর্বাপেক্ষা উপকৃত হবে এরাই। এদের সন্তান-সন্ততিদেরই লেখাপড়া শেখার সুবিধা হবে সব চেয়ে বেশি। তিনি খুব ভাল ক'রেই জানেন যে, বাইরের স্কুলে বোর্ডিংয়ে রেখে ছেলে পড়াবার সাধ্য এদের নাই। দেশের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে লেখাপড়া হোক বা না-হোক—ছেলেদের পড়াতে হয়। গোপনে দেনা করে, জমি বিক্রি করে। বিক্রি করে না, প্রজাদের জমি বন্দোবস্ত করে, তুদিন পরে কোন একটা কূটবুদ্ধির আশ্রয়ে ওই জমিতে গোলমাল বাধিয়ে আবার টাকা আদায় করে। ছেলেরা বোর্ডিংয়ে থেকে শহরের ফ্যাশান এবং চাল ও বুকনি শিখে কয়েক বৎসর এক ক্লাসে থেকে বাড়ি ফিরে এসে বসে। গ্রামে স্কুল হ'লেও লেখাপড়ার দিক দিয়ে হয়তো তাইই হবে—বেশি কিছু হবে না, কিন্তু দেনার দায় থেকে তো অব্যাহতি পাবে। আর লেখাপড়ার দিক থেকেই বা হবে না কেন? বাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করলে তু-চারটি ছেলে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেও পারে। গোপীচন্দ্রের ক্ষুব্ধ মন ঝ'ড়ো মেঘে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর মত সমস্ত কিছুকে ভেঙে চুরে দিতে চাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, থাক্‌, স্কুল প্রতিষ্ঠার সংকল্প থাক্‌, এই নবগ্রামের জন্ম তিনি কিছু করবেন না। চ'লে যাবেন তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে। কলকাতায় বাড়ি করবেন, সেইখানেই থাকবেন তিনি। এই অকৃতজ্ঞ মানুষেরা, এই কুটিলচিত্ত ঈর্ষাতুরেরা পচুক এইখানে থেকে। তিনি জানেন, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন—স্বর্ণকমলের ওই মাইনর ইস্কুল,

ও আর বেশিদিন চলবে না। উঠে যাবে। অন্ধকার নবগ্রামে আরণ্য জন্তুর মত এরা পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধ'রে ছেঁড়াছিঁড়ি করুক। গোপীচন্দ্রের নীল চোখের দৃষ্টি রোদের ছটায় প্রদীপ্ত দুটি নীলা পাথরের মত প্রখর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু গোপীচন্দ্রের মনের পরিধি এত ছোট নয়, আকাশের যেটুকু উচ্চতায় পৃথিবীর মৃত্তিকার উত্তাপের ফলে মেঘ জ'মে ঝড় ঘনিয়ে ওঠে, ততটুকুর মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ নয়; কোন মানুষেরই তা নয়। মনের আরও একটা অংশ আছে, মাটির উত্তাপ মাটির ধূলা উত্তপ্ত করে না, মলিন করে না —এমন একটা ঊর্ধ্বলোক আছে। গোপীচন্দ্র কৃতী মানুষ, বিশাল কর্মজগতে তাঁর ঘোরাফেরা, তাঁর মনের সে ঊর্ধ্বলোক সাধারণের চেয়ে অনেক বিস্তৃত, অনেক উচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রসারিত, দিনে সেখানে সূর্যোদয় হয়, রাত্রে সেখানে ওঠে চাঁদ; মাটির উত্তাপে যখন ঝড় ওঠে, নিচের আকাশে তখনও সেখানে সূর্য চন্দ্র পাশাপাশি ক'রে জাগে; তখনও সে অংশ থাকে আলোকোজ্জ্বল প্রসন্ন স্থির। সেখানকার আলো মেঘের আবরণকে ছিন্নভিন্ন ক'রে সরিয়ে দিয়ে প্রসারিত হতে চায় মাটির বুক পর্যন্ত। মেঘের ফাঁক দিয়ে মধ্যে মধ্যে আলো এসে পড়ে ওই মাটির বুকের উপরের স্তরের মত মনের অংশে। মধ্যে মধ্যে মেঘস্তর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আলোর প্রভার প্রসন্নতায়।

ওই মনে গোপীচন্দ্র এই ক্ষোভ এই ঘৃণার ঊর্ধ্বে, তিনি বার বার এই ক্ষোভ এই ঘৃণাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, মুছে ফেলতে চান। ওখানে ক্ষমাপ্রসন্ন মনে বার বার এই কথাই বলেন—না না না। কার উপর ক্রোধ! কার উপর বিদ্বেষ! মানুষ হয়ে সংসারে এসেছি, আমার কর্তব্য —দশের সেবা, সমাজের কল্যাণ; মানুষের সংসারে মানুষের চেয়ে দুঃখী আর নাই। দুঃখের অবধি নাই, প্রতিটি জন দুঃখে জর্জ্জরিত অহরহ। হায় রে, তবু মানুষ মানুষকে দুঃখ ছাড়া আর কিছু দেয় না! দুঃখের বিনিময়ে দুঃখ দিয়ে এ পৃথিবীতে দুঃখের বোঝা মানুষ বাড়িয়েই চলেছে। পূর্বজন্মের পুণ্যফলে সংসারে এক-আধজন সুখের অধিকারী হয়! দুঃখী মানুষের দুঃখ দেওয়ার প্রতিশোধে সেও যদি মানুষকে দুঃখ দেয়, তবে আর মানুষের পরিত্রাণ কোথায়? দুর্যোগ-ভরা অন্ধকারে মানুষ যখন অধীর অস্থির হয়ে পরস্পরকে আঘাত করে, তখন যে দু-চারজন ভাগ্যবশে আলো পেয়েছে হাতে—তারা যদি আলোর বদলে অন্ধকারই দিতে চায় মানুষকে, তবে সে আলো নিবিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু তাতে তো শুধু অন্ধকারের ভাগ্য নিয়ে যারা এসেছে তারাই অন্ধকারের দুঃখ ভোগ করে না, যারা হাতের

আলো নিবিয়ে দেয় তাদেরও ভোগ করতে হয় অন্ধকারের দুর্যোগের দুর্ভোগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম গোপীচন্দ্রের, তিনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন; এ জন্মের সৎকর্মের পুণ্যফল জন্মান্তরে মহত্তর বৃহত্তর সুখ এবং সৌভাগ্যের অধিকারের কল্পনা তাঁর এই ভাবনাকে প্রেরণা দেয়, এই প্রবৃত্তিকে শক্তিশালী ক'রে তোলে। তাঁর বিক্ষোভের মেঘকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ক্ষণে ক্ষণে এসে পড়ে মনের ঊর্ধ্বলোকের প্রসন্ন আলোর ধারা। আলোক এবং অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকেন, খাটের উপর সামনে ফুরসিতে তামাক পুড়ে যায়, নলটা প'ড়েই থাকে, তিনি তা স্পর্শ করেন না।

অমরচন্দ্র এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর পিছনে কীর্তিচন্দ্র। অমরচন্দ্র গলা পরিষ্কার করার অজুহাতে শব্দ ক'রে সাড়া দিলেন। গোপীচন্দ্র ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে অমরচন্দ্রকে দেখে স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হেসে বললেন, এস। ব'স।

কীর্তিচন্দ্র বিনা ভূমিকায় সোজা ব'লে দিলেন, আপনি কাদের জন্যে ওসব করতে যাচ্ছেন? এ সব বন্ধ ক'রে দিন।

হাসলেন গোপীচন্দ্র, নলটা তুলে নিলেন—দু-একটা টান দিয়ে বললেন, কারও জন্যেই তো আমি কিছু করতে যাচ্ছি না। আমি যা করতে যাচ্ছি সব নিজের জন্যে।

তামাকে আরও দু-একটা টান দিয়ে বললেন, নিজের জন্যে ছাড়া যদি কারও কিছু হয় এ থেকে, সে হবে তোমাদের—মানে, আমার বংশের।

অমরচন্দ্র কোন প্রশ্ন করলেন না, তবে অনুমান করতে পারলেন সবই। এমন ক্ষেত্রে কথা বলা তাঁর স্বভাব নয়। তাঁকে প্রশ্ন করার অপেক্ষা ক'রে রইলেন।

গোপীচন্দ্র আবার বললেন, শুধু ইস্কুল আমি করব না, আরও অনেক কিছু করব।

হঠাৎ তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অপরূপ প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তাঁর নীল চোখের দৃষ্টি। কানের পাশে ভেসে উঠল বাল-কণ্ঠস্বরের মাধুর্য, তিনি শুনতে পেলেন—আপনি মহাপুরুষ, আপনি আরও অনেক করবেন।

গাঢ়স্বরে বললেন, গার্ল্‌স্ স্কুল করব, চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি করব, টোল করব, হাই স্কুলের ছেলেদের জন্যে বোর্ডিং করব।

তারপর অমরচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, মনে মনে কয়েক দিন থেকেই তোমার কথা ভাবছিলাম অমর। এ কাজে আমাকে সাহায্য করতে পার একমাত্র তুমি। তুমি এ সবের মূল্য বোঝ, তুমি এ সবের

পদ্ধতি জান, তোমাকেই ভার নিয়ে সব করতে হবে। পবিত্রকে বরং তুমি সঙ্গে নাও।

অমরচন্দ্র বললেন, এলাহাবাদ থেকে এসেছিলাম কলকাতায়, সেখানে বাসায় শুনলাম ইস্কুলের কথা। আমার কি যে আনন্দ হ'ল! প্রথমে ভাবলাম, চিঠি লিখি আপনাকে। কিন্তু চিঠি লিখে মন খুশি হ'ল না। চলে এলাম। তা আমাকে ভার দিতে চাচ্ছেন, নিচ্ছি আমি, এর চেয়ে ভাল কাজ কি হতে পারে! আমি কালই এলাহাবাদ গিয়ে ছুটি নিয়ে এখানে চ'লে আসছি। আগামী মাসের দোসরা ভিতপত্তন হবে—আজ মাসের সাত তারিখ, আমার যেতে-আসতে সেখানকার কাজ সারতে সাত দিন। চোদ্দই-পনরোই আমি এসে পড়ব। এ কয়েক দিন যা করতে হবে, সে পবিত্রকে বুঝিয়ে দেব।

গোপীচন্দ্র বললেন, পবিত্র আবার কি ঝোঁক ধরেছে—থিয়েটারের দল খুলবে। ওটা সম্পর্কে—

অমরচন্দ্র বললেন, খুব ভাল আইডিয়া। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অনেক উপকার, অনেক শিক্ষা হয় দেশের। তা ছাড়া এই সব বেকার ছেলের দল সন্ধ্যের সময় কত বদ খেয়ালে কাটায়, তার চেয়ে থিয়েটারের আসরের মধ্যে সব আসবে, বসবে, আলোচনা করবে—খুব উপকার হবে। গুড আইডিয়া। ওর সঙ্গে একটা লাইব্রেরি করুক। পড়াশুনাও করবে কিছু কিছু।

তুমি বলছ—ভাল?

নিশ্চয়। সে আমলে অবশ্য অনেকে খারাপ ভাবতেন, এখনও অনেকে ভাবেন; কিন্তু—কিন্তু আমি তা ভাবি না। কই, পবিত্র কই?

পবিত্র এসে দাঁড়াল। গোপীচন্দ্র বললেন, তা বেশ, থিয়েটার কর, অমর বলছে—ভাল হবে। লাইব্রেরিও কর, তবে ইস্কুলের এই ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িংয়ের সময় একটা কিছু পালা-টালা করতে পার না?

অমরচন্দ্র উত্তর দিলেন, জিজ্ঞাসা করছেন কেন? বলুন, করতেই হবে। মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? বেশি খাটতে হবে একটু। সে খাটবে ওরা। দিন দশ ঘণ্টা খেটে দশ দিনে যেটা করা যায়, পনেরো ঘণ্টা খেটে সেটা ছদিন-সাতদিনে হয়, আরও বেশি খাটলে আরও কমে হয়। খাটার মধ্যে আন্তরিকতা থাকলে আরও কম সময়ে হয়, কারণ খাটুনির মধ্যে মানুষের খানিকটা ফাঁকি থাকেই। খাটবার লোক বুদ্ধিমান হ'লে আরও কম হয়। ইট মাস্ট্ বি ডান।

পবিত্রের দিকে চেয়ে বললেন, ইউ মাস্ট্ ডু ইট। কি পালা করবে?

পবিত্র উজ্জ্বল দৃষ্টিতে অমরচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বিল্বমঙ্গল আর হরিশ্চন্দ্র।

অমরচন্দ্র বললেন, গুড। এস, কাজ আরম্ভ ক'রে ফেলা যাক। পার্ট ডিস্ট্রিবিউশন ক'রে ফেলবে চল। তোমার ঘরে চল।

কীর্তিচন্দ্র গেলেন না।

গোপীচন্দ্র হেসে বললেন, যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। অমর যখন বলেছে—ভাল হবে, তখন ওতে আপত্তি ক'রো না।

কীর্তিচন্দ্র বললেন, ও নিয়ে আমি কোন কথা বলছি না। আমি অন্য কথা বলছি। স্বর্ণবাবুর সঙ্গে যে সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনি মামলা করতে দেন নি, সে মামলা কালই দায়ের করব আমি। খাজনা, দেনা, পাওনা—সব বন্ধ করতে হবে।

কর। আর আমি আপত্তি করব না।

রাধাকান্তবাবু, শ্যামাকান্তবাবু—

বাধা দিলেন গোপীচন্দ্র, না।

কিন্তু—

আমি আরও দেখতে চাই কীর্তি। যাও, শুয়ে পড় গে। কাল অনেক কাজ আছে।

অনেক কাজ আছে। কাজের কি শেষ আছে? শুধু কি কালই অনেক কাজ? কাজের আর অন্ত নাই। কাজ ক'রে কুলিয়ে উঠবে কি না সেই সন্দেহ মধ্যে মধ্যে গোপীচন্দ্রকে বিষণ্ণ ক'রে তোলে। অনেক কাজ। ঝরিয়া অঞ্চলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লীজ নিয়েছেন। কয়লাভরা পতিত প্রান্তর, উপরে পলাশবন আর পাথর। ওগুলিতে খনি গ'ড়ে তুলতে হবে। অংশীদার নিয়ে তাঁর সমৃদ্ধ ব্যবসা আজ খুব সমারোহে চলছে, কিন্তু তবুও তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন,—মনে হচ্ছে সমৃদ্ধির আড়ম্বর এবং সমারোহের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বোধ হয় ভিতরের মাটি স'রে যাচ্ছে। তিনি নিজে এই সময় থেকে স্বতন্ত্র একটি ব্যবসায়ের পত্তন করতে চান। আয়োজনও সব করেছেন। এখন তাকে শক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে।

কীর্তিচন্দ্র ব্যবসাবুদ্ধিতে কৃতী এবং কুশলী, তার উপরে এসব বিষয়ের ভার দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত; কিন্তু তাঁর এই শেষ জীবনের কাজ, কীর্তির সাধনা—এ তাঁকে নিজে করতে হবে। দেবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, নাটমন্দির গড়েছেন, জলাশয়প্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা তাও করেছেন। একসময় ভেবেছিলেন এই সমস্ত হ'ল তাঁর এদিকের কর্তব্য। হঠাৎ আরম্ভ হ'ল নূতন অধ্যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উপলক্ষ; তিনি দীর্ঘজীবী হোন তাঁর পদোন্নতি হোক, মঙ্গল হোক। নবগ্রামের গ্রামদেবতা তাঁর পূজা নিতে নিজে হাত বাড়িয়েছেন। তিনি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অনেক করতে হবে। স্কুল, বোর্ডিং, গার্লস স্কুল, টোল, চ্যারিটেব্‌ল ডিস্পেন্সারি, লাইব্রেরি, থিয়েটার, আরও অনেক—অনেক কিছু। পুত্রগৌরবে বংশ ধন্য হয়, জননী কৃতার্থ হন, তেমনই কীর্তিমানের কীর্তিতে গ্রাম ধন্য হয, সমৃদ্ধ হয়, কীর্তিমানের পরিচয়ে গ্রাম বিখ্যাত হয়। তাঁর মনে আছে এক সময়ে এই জেলার মধ্যে নিবাস বলতে যখন বলতেন—নবগ্রাম, তখন লোকে আরও প্রশ্ন করত—কোন্ নবগ্রাম? সরকার নবগ্রাম? মুসলমান আমলে সরকারেরা এখানে খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁরই এই ষাট বৎসর বয়সের মধ্যে সরকার-বংশের খ্যাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। নবগ্রামেব নাম লোকে একরকম ভুলেই গিয়েছে। মধ্যে উকিল দীনবন্ধুবাবুদেব পবিচয়ে কিছু লোক নবগ্রামকে চিনত, স্বর্ণবাবুর বাপের পরিচয়েও কিছু লোক চিনত। এখন সে পরিচয়ও বিগত। এখন তাঁর পরিচয় দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁব পরিচয় তো শুধু জিলার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সমগ্র বাংলা দেশে প্রসারিত, শহরে শহরে ব্যবসায়ীরা তাঁকে চিনতে শুরু করেছে। শুধু বাংলা দেশ নয়—সমগ্র ভারতবর্ষ। যেখানে আছে কয়লার ব্যবসায়ী, যেখানে আছে কয়লাব ব্যবসায়ের সঙ্গে সংস্রব, সেইখানেই গোপীচন্দ্র ব্যানার্জিকে তাবা জানে। এই পরিচয় উজ্জ্বল থেকে যত উজ্জ্বলতর হবে, ততই লোকে গোপীচন্দ্রের সঙ্গে নবগ্রামকে বেশি ক'রে চিনবে। চিনতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু তারপর? তাঁব জীবনের একদিন অন্ত হবে। তারপর? তারপবের জন্য তিনি আজ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অন্নের সমস্যায়, বস্ত্রের সমস্যায় একদা তিনি দেশান্তবী হয়েছিলেন। সেদিন এমন কথা কোনদিন চিন্তাও করেন নি। কিন্তু আজ সে চিন্তা স্বাভাবিক ভাবেই মনে জেগেছে।

নূতন নবগ্রাম তিনি গঠন করবেন। গোপীচন্দ্রের নবগ্রাম। পুরুষ থেকে পুরুষান্তর হবে, কাল থেকে কালান্তর হবে, তাঁর নাম নবগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

কল্পনার উত্তেজনায় গোপীচন্দ্র সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ষাট বৎসর বয়সে তাঁর দীর্ঘ দেহ ঈষৎ নমিত হয়ে পড়েছে। জীবনে পরিশ্রমও করেছেন প্রচুর। প্রথম জীবনে সাহেব-কোম্পানির কুঠিতে মাসিক সাত টাকা বেতনে কাজ করতেন—কুলিদের কাজ তদারক করা ছিল কর্তব্য, তখন উদয়াস্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন রোদ-বৃষ্টির মধ্যে, রাত্রে জ্বলন্ত কয়লার গাদার সামনে

দাঁড়িয়ে থাকতেন। তারপর কুলি-সংগ্রহের কাজে মানভূম-বাঁকুড়ার বন-জঙ্গল-পাথর-সমাকীর্ণ প্রান্তরে প্রান্তরে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করেছেন সাঁওতাল-বাউরীদের পল্লীতে পল্লীতে। তারপর কোম্পানির দপ্তরে কাজ করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রমে; ক্রমে নায়েব হলেন, তখনও রাত্রি বারোটা পর্যন্ত অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে দিনের সমস্ত হিসাবনিকাশ শেষ ক'রে তবে আসন পরিত্যাগ করেছেন। নিজের জীবন সম্বন্ধে যখনই ভাবেন গোপীচন্দ্র, তখনই মনে হয়, তিনি যেন পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম ক'রে চলেছেন। প্রতিবারই মনে হয়, এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেই তাঁর যাত্রা শেষ হবে; কিন্তু সেখানে উঠে দেখেন, সামনে আর একটা চূড়া। সে চূড়া থেকে কে যেন তাঁকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে—চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনই দুর্নিবার সে আকর্ষণ। চলতেই হয় তাঁকে, চলেছেনই তিনি। এইবার মনে হচ্ছে, এই সামনের চূড়াই শেষ। ওই চূড়ার মাথায় তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন—জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কামনা পরিপূর্ণ হবে। ওইখানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন—নবগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি তাঁকে পূজা করবেন, তিনি তাঁকে বরদান করবেন। বর দেবেন, আজ থেকে তোমার মা—এই হ'ল আমার পরিচয়; আমার পরিচয়েই হবে তোমার পরিচয়।

সাপ! সাপ!

চমকে উঠলেন গোপীচন্দ্র। উচ্চ অথচ চাপা গলায় কে চীৎকার ক'রে উঠল। তাঁর খাটের পাশেই প্রকাণ্ড বড় জানলা, তার ওপারে তাঁর বাড়ির পাশেই স্বর্ণবাবু-রাধাকান্তবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপ; চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখান দিয়ে পাড়ার লোকের এবাড়ি-ওবাড়ি যাওয়ার পথ, ওই পথের উপর কে চীৎকার ক'রে উঠল।

গোপীচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

বাইরে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ঝলমল করছে, সেই জ্যোৎস্নায় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন দুটি মূর্তি। সাপটাকেও দেখতে পাচ্ছেন। চ'লে যাচ্ছে সাপটা। মূর্তি দুটি দাঁড়িয়ে আছে। কে ওরা—অল্পবয়সী দুটি ছেলে। তিনি ডাকলেন, কে? কে?

মুহূর্তে ছেলে দুটি সাপটাকে সামান্য দূরে পাশে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল? কে? কে ওরা?

কিশোর নয়? মুখুজ্জেদের কিশোর? পবিত্রের বাল্যবন্ধু এই ছেলেটিকে চিনতে তো তাঁর ভুল হবার নয়। আর একটি—ওটি কে?

এই এতখানি রাত্রে অমনভাবে চোরের মত ওরা কোথায় গেল? সাপকে পাশে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল?

পরক্ষণেই তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হতভাগ্য সমাজ, হতভাগ্য দেশ! মাটির দোষে অমৃতবৃক্ষও বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। এই মাটির বিষ নিঃশেষে মুছে দিয়ে অমৃতসিঞ্চনে উর্বর ক'রে তুলতে হবে তাঁকে।

নয়

গোপীচন্দ্র ভুল দেখেন নাই। ছেলেটি কিশোরই বটে। কিশোরেব সঙ্গে ছিল সরকারদের শূলপাণি। শূলপাণিই সাপটাকে দেখে চাপা গলায় চীৎকার ক'রে উঠেছিল। বিচিত্র সম্মেলন। শূলপাণি এবং কিশোর! চবিত্রে সংস্কারে শিক্ষায় দুজনে প্রায় বিপরীত। শূলপাণি অতি প্রাচীন জমিদার সরকার-বংশের সন্তান, আর্থিক অবস্থায় কালক্রমে আজ সরকার-বংশ প্রায় দুঃস্থ হয়ে পড়েছে, প্রাচীন অভিজাত বংশের স্বাভাবিক পরিণতিতে বংশটির মধ্যে অনেক দোষও ঢুকেছে, শূলপাণির মধ্যেও সে সব দোষ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। শূলপাণি এখন স্কুলের ছাত্র, নামেই অবশ্য ছাত্র—কাজে নয়—যে দিন খুশি যায়, যখন খুশি চ'লে আসে, শিক্ষকেরা কেউ কিছু বলেন না। সবকাব-বংশ কুলাচারে তান্ত্রিক। একদিন এ বংশের অনেকে সাধনা করতেন, এখন সাধনা নাই, তন্ত্রের মন্ত্রোপলব্ধি দূরের কথা, শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণও সকলে করতে পারেন না, আছে শুধু আচার। অনেকের তাও নাই, শুধু আচারের দোহাই দিয়ে মদ্য-মাংসে আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে চরমানন্দ ভোগ ক'রে পরকালে অক্ষয় স্বর্গবাসে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন ক'রে নিশ্চিন্ত, এবং মত্তপদক্ষেপে জীবনপথ অতিক্রম ক'রে চলেছেন। শূলপাণিকে এই ছাত্রবয়সেই তার ছোঁয়াচ লেগেছে। সে মদ খেতে শুরু করেছে, গাঁজা নিয়মিত খায়। মধ্যে মধ্যে নদীর মধ্যে শ্মশানে গিয়ে ব'সে থাকে, কালী কালী তারা তারা ব'লে ডাকে। একদা কিশোর ওর সঙ্গেই পড়ত, কিন্তু কিশোর মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাস ক'রে জেলার সদরে গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে এণ্ট্রান্স পাস ক'রে এখন এফ. এ. পড়ছে। চরিত্রের দিক দিয়ে কিশোর সম্পূর্ণরূপে নূতন কালের তরুণ। নবগ্রামে সে নূতন দিনের প্রতিভূ। তবুও শূলপাণি কিশোরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, মুগ্ধ ভক্ত।

সাপ দেখে দুজনেই সতর্ক এবং শঙ্কিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

চণ্ডীমণ্ডপের এই সাপটি বিখ্যাত। গভীর রাত্রে সে গোটা পাড়াটায় কোথাও না কোথাও ঘুরে বেড়ায়, চণ্ডীমণ্ডপ তার কেন্দ্রস্থল। চণ্ডীমণ্ডপের আশেপাশের বাড়িতেও মধ্যে মধ্যে ঢোকে। ইঁদুর ব্যাঙ খেয়ে আবার শেষ রাত্রে বেরিয়ে আসে। বিচিত্র পল্লীসভ্যতা! এখানকার মানুষ বিষধরটাকে দেখেও মারে না। আজও পর্যন্ত সাপটাও কাউকে আক্রমণ করে নি। সেই কারণে ওই মৃত্যুমুখ সরীসৃপকেও ওরা কিছু তো বলেই না, বরং যেন বেশ খানিকটা প্রীতি-স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। ও যেন এই গ্রামের বাসীদের একজন। দেখলেই অবশ্য প্রথমটায় আতঙ্কিত হয়ে চমকে দু-পা পিছনে হ'টে দাঁড়ায়, তারপর সাপটাকে দেখে বলে, ওঃ, বুড়োটা! যা যা, চ'লে যা। সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দেয়। সাপটাও গতি দ্রুত ক'রে জঙ্গলের দিকে চ'লে যায়। ঠিক এই সাহসে ভর ক'রেই গোপীচন্দ্রের সাড়া পেয়ে কিশোর এবং শূলপাণি সাপটার পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে এসেছে।

গোপীচন্দ্রের বাড়ির পিছনেই গ্রামের বসতি শেষ হয়েছে। তার পরই সেই মাঠের ধারের রাস্তা, যে রাস্তাটার ধারে বেড়া দিতে এসে নাসের শেখ ফিরে গেছে। ছুটে এসে ওরা ওই রাস্তাটার মুখে থামল। শূলপাণি বিপুল কৌতুকে হি-হি ক'রে হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল। ওঃ, আচ্ছা বেরিয়ে এসেছি! আর একটু হ'লেই চিনে ফেলত বুড়ো! যা জ্যোৎস্না, ফিট সাদা—শালা, ফট-ফট করছে চারিদিক। ঠিক চিনে নিত।

এত জোরে হাসিস নে শূলপাণি। একটু বরং পা চালিয়ে চল্। এখুনি যদি চোর ডাকাত ভেবে চেঁচায়, কি দেখতে লোক পাঠায় তো মুশকিল হবে। পুঁটলিটা বরং আমাকে দে। অনেকক্ষণ বয়েছিস তুই।

শূলপাণির ঘাড়ে একটা মাঝারি আকারের পোঁটলা। বেশ ভারী কোন জিনিস অর্থাৎ ধান চাল ডাল জাতীয় বস্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে। শূলপাণি বললে, না। চল্ না তুই।

না, দে আমাকে। কষ্ট হবে তোর।

আরে নাঃ। ভারি তো পোঁটলা তোর! আধ মণ চাল। এ কাঁধে ক'রে আমি বিশ কোশ পথ তো একটানে চ'লে যাব না-থেমে, হ্যাঁ।

গোপথটার এক দিকে মাঠ, এক দিকে পাশাপাশি তিনটে পুকুর। মাঝেরটার পাড়ের উপর প্রকাণ্ড বড় শিমূলগাছ; লোকে বলে ওখানে ভূত আছে; তার পরেরটা কাশীর পুকুর, ঘন বাঁশ তাল এবং আম কাঁঠাল গাছের

বাগানে ঘেরা, ওখানে আছে সাপ এবং শেয়ালের বসতি। শূলপাণি বললে, আমি আগে যাই। তুই পিছনে আয়।

কিশোর হাসলে, কিন্তু আপত্তি করলে না। সাহস এবং শক্তি নিয়ে শূলপাণির অহঙ্কার আছে, অহঙ্কারের চেয়ে বেশি,—ওইটি তার জীবন-গৌরব। কিশোর নিজেও শক্তিশালী এবং সাহসী ছেলে, শূলপাণির সঙ্গে কুস্তি এবং পাঞ্জাও সে লড়েছে। তাতে প্রতিবারই সে শক্তি থাকতেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেছে—নইলে শূলপাণিব সঙ্গে চিরজীবনের মত বিচ্ছেদ হয়ে সাবে। শূলপাণির শক্তি এবং সাহসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেই সে পরিতৃপ্ত; বিনিময়ে সে জীবনেব অন্য সকল বিভাগের শ্রেষ্ঠত্ব তাল-বেতালের আনুগত্য স্বীকাবেব বরদানের মত দান কববে।

শিমূলগাছটার সামনে এসে শূলপাণি দাঁড়াল। বললে, এক-একদিন আমার মনে হয় কি জানিস?

কি?

গাছটার গোড়ায় এসে মড়ার আসন ক'রে বসি। হেঁকে বলি, নেমে আয়, কে আছিস? লড়ি এক হাত তোর সঙ্গে।

কিশোব তার পিঠে মাঝের আঙুলটা দিয়ে টিপ দিয়ে তাকে ইঙ্গিত ক'রে মৃদুস্বরে বললে, চুপ। পেছনে কালী সায়বের তালগাছের ফাঁকে আলো বাজছে। আলো নিয়ে কেউ আসছে।

বিদ্যুৎগতিতে শূলপাণি ঘুরে দাঁড়াল। এমন ভাবে ঘুবে দাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু শক্তি ও সাহসগববী শূলপাণির ওটা স্বভাব।

কালী সাযব স্বর্ণবাবুদের শখেব পুকুব, গোপীচন্দ্রের বিশাল অট্টালিকাকে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ঘিবে বেখেছে পাড়ের আম লিচু গোলাপজাম প্রভৃতি মূল্যবান ফলের গাছের বাগান দিয়ে, বাগানের চারিপাশে ঘন তাল এবং তেঁতুলের বেড়। সেগুলি গোপীচন্দ্রের দোতলাব মাথা ছাড়িয়েও উঁচু হয়ে উঠেছে। বেড়ার ঘন তালগাছের ফাঁকে আলোর ছটা দুলছে। কেউ আসছে। সম্ভবত গোপীচন্দ্রের বাড়ি থেকেই কেউ আলো হাতে বের হয়েছে এবং তাদেরই অনুসরণ করেছে বোধ হয়।

শূলপাণি কিশোরের হাত ধ'রে বললে, ছোট্। কাশীর পুকুরে ঢুকে পড়ি চল্।

কিশোর পেছন থেকে তাকে টেনে বাধা দিয়ে বললে, না।

ভয় নাই। আয়। আমি আছি।

সাপ আছে। ভয়ঙ্কর সাপ ওখানে।

ধ্যেৎ! আচ্ছা ভয় তোর! এখুনি সাপের মুখ দিয়ে পার হয়ে এলাম।

ও-সাপটা জানা সাপ। মানুষের সঙ্গে বাস ক'রে ওর স্বভাব খানিকটা পাল্টে গিয়েছে। তা ছাড়া—

অসহিষ্ণু শূলপাণি এবার দাঁত বার ক'রে খানিকটা হিংস্র ভঙ্গিতে বললে, বেরুলি কেন তবে? তোরই তো কাজ। ভয় নাই। আয়।

না বে না। দাঁড়া।

তুই ভারি ভীতু। বলি, সাপে মানুষ মারে বেশি, না মানুষে সাপ মাবে বেশি? মানুষের সাড়া পেলে স'রে যাবে। চ'লে আয়। তা ছাড়া কপালে লেখা না থাকলে সাপে কামড়ায় না। মা-কালী মা-মনসার নাম নিয়ে চ'লে আয়।

চিন্তাকুল কিশোব বললে, জঙ্গলের সাপ মানুষের সাড়ায় হিংস্র হয়ে ওঠে বেশি। তার ওপর অন্ধকার। অন্ধকারে জঙ্গলে সাপেই মানুষ মাবে বেশি শূলপাণি, ওখানে কপালের লেখা না থাকলেও কামড়ায়, মা-কালী মা-মনসার দোহাই মানে না। দাঁড়া।

নে। তবে কি করবি কর্। আমার কচু। আমি বলব—আমি চুলোয় যাচ্ছি তোমার বাবাব কি? ভয় তোর। ভাল ছেলে তুই। তুই কি বলবি ভেবে দেখ্।

ওদিকে তালগাছ-তেঁতুলগাছের ফাঁকগুলি উজ্জ্বলতর আলোয় ভ'রে উঠেছে, গাছেব মাথার উপর থেকে আলো নেমে এসে নিচের দিকটায় ছড়িযে পড়েছে বিস্তৃততর পরিধিতে। কিন্তু লোকের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। শূলপাণি হঠাৎ চালের পোঁটলাটা নামিয়ে রেখে পথের উপর থেকে কুড়িয়ে নিলে কয়েকটা শক্ত মোটা মাটির ঢেলা। শূলপাণির হাতের লক্ষ্য অদ্ভুত। ঢেলা মেবে গাছের মাথা থেকে নির্দিষ্ট ফলটিকে বাজি রেখে পেড়ে আনে। পত্রপল্লবহীন শুকনো ডালে কি বাঁশের ডগায় কি খুঁটির ওপর পাখি ব'সে থাকলে ইট কি ঘুঁটি মেরে শিকার করে। গ্রামের হনুমানেরা শূলপাণিকে চেনে—তার হাতের অব্যর্থ লক্ষ্যের ঢিল খেয়ে চিনে রাখতে বাধ্য হয়েছে, শূলপাণি ঢেলা তুললে ওরা চুপ ক'রে ব'সে থাকে না, মাথা সরিয়ে কি নামিয়ে শূলপাণির ঢেলা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ভরসা করতে পারে না। দেখবামাত্র শব্দ ক'রে চালে চালে লাফ দিয়ে পালায়।

শূলপাণিকে ঢেলা তুলতে দেখে সশঙ্কিত হয়ে বললে, কি করবি? মাথায় লাগলে খুন হয়ে যাবে।

মাথা নয়, আলো। আলোটা ভেঙে দোব।

মানুষটা চলছে, আলোটা দুলছে শূলপাণি। হাতের ঢেলা—এত ঠিক যায় না।

তার চেয়ে এক কাজ কর্।

কি?

বলছিলি না—অর্জুনগাছের ভূতটাকে দেখাবি? চল্, তাই দেখি।

অ্যাঁ?

ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই চল।

কথাটা মন্দ লাগল না শূলপাণির। বহুকালের অর্জুনগাছ, মাথাটা প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, বিশাল কাণ্ড, তিনজন মানুষ হাতের বেড় দিয়ে গাছটাকে ঘিরতে পারে কি না সন্দেহ, গাছটার মসৃণ কাণ্ডে বর্ষায় ছাতা ধ'রে ছাতার দাগ বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত ক'রে রেখেছে কাণ্ডটাকে। নীচের দিকের প্রবীণ শাখাগুলি নাই, সেখানে আছে গহ্বর, দু চারটি নূতন ডাল গজিয়েছে ওগুলির গোড়া থেকে। উপরের দিকে প্রায় পনরো ফুট-উপর থেকে মোটা শাখা-প্রশাখাগুলি সুদীর্ঘ বিস্তারে প্রসারিত। গাছটার গোড়াটায় কোন জঙ্গল নাই, ঘন ছায়ায় গাছে ডাল জন্মায় না। জন্মাতে পারে ঘাস কালুকাঁটা প্রভৃতির জঙ্গল, কিন্তু সমস্ত তলদেশটা ভাঙা হাঁড়িতে একেবারে বোঝাই হয়ে আছে। প্রায় সমগ্র ব্রাহ্মণ-পল্লীর অশৌচ হেতু হাঁড়ি ফেলার স্থান এটা। সেই হেতু স্থানটা প্রায় শ্মশানের কাছাকাছি—আধা শ্মশান। জনমানব গাছটার পরিধির মধ্যে যায় না। অশৌচ হ'লে বাধ্য হয়ে আসে হাঁড়ি ফেলতে। পুরুষানুক্রমে লোকে এ গাছে প্রেত-পুরুষের অধিষ্ঠান-প্রবাদে বিশ্বাস ক'রে আসছে। এই প্রেত-পুরুষ এক উদাসীন, মাথায় তার জটা আছে, বিষণ্ণ ক্লান্ত দৃষ্টি তার চোখে; শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁকে মধ্যে মধ্যে লোকে দেখতে পায়। স্থির মূর্তির মত উদাসীন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আকাশের দিকে আঙুল তুলে কিছু যেন দেখিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায়। যে দেখে, ছ মাস বা এক বৎসরের মধ্যে তার উপর কোন মর্মান্তিক নিষ্ঠুর আঘাত নেমে আসে। হয় সে নিজে মারা যায় অথবা তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন চ'লে যায়। দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত শূলপাণির গাছটার দিকে চাইলেই ইচ্ছা হয়, একবার সেই পুরুষকে দেখে আসি। তার এ সাহস ভূত-প্রেত অবিশ্বাসের জন্য নয়, তার অসমসাহসিকতা ও শক্তি প্রমাণ করবার জন্যই তার এই অভিপ্রায়, হয়তো আর একটু আছে, সেটা হ'ল সে তান্ত্রিক বংশের সন্তান—সে বিশ্বাস করে যে ওই পুরুষ নিজে থেকে দেখা দিলে যা হয়, সে এক কথা; কিন্তু কেউ যদি সাহস ক'রে তার সঙ্গে

গিয়ে দেখা করে, তবে তার ফল অন্য রকম হতে বাধ্য। আজও কয়েক মুহূর্ত পূর্বে সে কিশোরকে বলছিল তার মনের কথা। কাজেই কিশোরের প্রস্তাবটা তার ভাল লাগল। উৎসাহিত হয়ে উঠল সে।

চল্।

সাবধানে কিন্তু। হাঁড়িগুলোর তলায় সাপখোপ থাকতে পারে।

অই! অই তোর এক কথা! সাপ, সাপ, সাপ! কলকাতায় পড়তে গিয়ে তোর এক বাতিক হয়েছে। আয়। সে কিশোরের কথার প্রতিবাদ ক'রেই ওই হাঁড়িগুলোর উপর দিয়ে মড়মড় শব্দে সেগুলোকে ভেঙে-চুরে এগিয়ে গেল গাছটার গোড়াব দিকে।

আয়। চ'লে আয়।

বহুযুগের বিশাল বনস্পতির তলায় ছায়া জ'মে আছে, একেবারে গোড়ার চারিপাশটা পরিষ্কার; নিস্তব্ধতা থমথম করছে। মধ্যে মধ্যে উর্ধ্বলোকে শাখাপল্লবের মধ্যে বাতাস এসে দোলা দিয়ে শব্দ তুলছে খস-খস—খস-খস।

কিশোর উপরের দিকে চাইলে। উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা দেশের গ্রামের ছেলে সে, কলকাতায় পড়তে গিয়ে নূতন কালের ভাবধারা যতখানি গ্রহণ করতে পেরে থাক্ না কেন, এখনও শৈশব ও বাল্যের সংস্কার একেবারে যায় নি। সে উপরের দিকে চাইলে ওই পুরুষটির ছায়াময় কায়ার সন্ধানে; কালবৈশাখীর মেঘের পূর্বাভাস উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল এবং রৌদ্রপাণ্ডুর আকাশের মত ভয়ঙ্কর ভয়ের পূর্বাভাসে বুকের ভিতরটা স্তব্ধ, মন ও ভয়ের প্রতীক্ষায় একাগ্র। শূলপাণিও চাইলে। তারও বুক এবং মন কিশোরের মতই ভয়ঙ্করকে দেখে শঙ্কিত এবং কম্পিত হবার জন্য ব্যগ্র।

কিন্তু কই? বিশাল পল্লবপরিধির নিচে মাটি পর্যন্ত ছায়ার অন্ধকারে জ্যোৎস্নার রেখায় রেখায় বিচিত্রিত, পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। একটি বড় ফাঁক দিয়ে খণ্ড আকাশের গায়ে দুটি চারটি তারা দেখা যাচ্ছে। আর পাতায় পাতায় জ্বলছে অজস্র জোনাকি, ফাঁকগুলো দিয়ে দীপ্তির ঝিকিমিকি টেনে উড়ে বেড়াচ্ছে, জ্বলছে, নিবছে, মধ্যে মধ্যে ঝ'রে পড়ছে মাটিতে। কিশোর মুগ্ধ হয়ে গেল। সে কবি, তার উপর ভয়ঙ্কর কিছুকে নিশ্চিত আশঙ্কা ক'রে তার বদলে এমন সুন্দর শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে এসে মনে হ'ল, এ রূপ অপরূপ, এমনটি যেন কখনও তার চোখে পড়ে নাই।

শূলপাণি মৃদুস্বরে ব'লে উঠল, দাও বাবা, দেখা দাও। মহাপুরুষ!

কে? কারা ওখানে?—নিস্তব্ধতা চকিত হয়ে উঠল, শান্ত ছায়ান্ধকার

চঞ্চল হয়ে উঠল। গভীর কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন ক'রে দীর্ঘাকৃতি গোপীচন্দ্র একাই বেরিয়ে এসেছেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে, হাতের লণ্ঠনটা অল্প অল্প দুলছে, গাছ-তলার অন্ধকার টলছে যেন।

* * *

গোপীচন্দ্র একা বেরিয়ে এসেছেন বাড়ি থেকে।

জানলা থেকে জ্যোৎস্নালোকিত চণ্ডীমণ্ডপের খোলা আঙিনায় তিনি দুটি ছেলেকে স্পষ্ট দেখেছেন। সাপটাও তিনি দেখেছেন। স্পষ্ট না দেখতে পেলেও সবুজ ঘাসের উপর এক সর্পিল গতিশীলতা তাঁর চোখে যেন পড়েছে। ছেলে দুটি মরণ-বাঁচন-জ্ঞানশূন্যের মত ছুটে বেরিয়ে গেল, সম্ভবত সাপটার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল, তাতে সন্দেহ নাই। কারণ ঘাসের উপর ওই গতিশীলতা সঞ্চারিত হয় ছেলে দুটি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। সাপটাকে তিনিও জানেন, চেনেন। দীর্ঘ ষাট বৎসর তিনি এই চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়েই বাড়ি যাওয়া-আসা করেন, ওই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে দিয়েই তাঁর বাড়ি থেকে সদর রাস্তায় যাওয়ার পথ। অনেক কাল থেকেই ওকে তিনি দেখছেন। প্রথম যৌবনে দেখেছেন, তখন সাপটা ছোট ছিল অনেক। তখন ওর গতি ছিল অত্যন্ত ক্ষিপ্র। পথ চলতে চলতে অকস্মাৎ চমকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, মনে হয়েছে, পাশের ঘাসের বনে বা কালুকাঁটার বনের মধ্যে কি যেন ন'ড়ে উঠল, চ'লে গেল। দু-চারবার এমন হয়েছে—একেবারে সামনাসামনি পড়েছেন, আতঙ্কিত হয়ে পিছিয়ে এসেছেন, সাপটাও ফণা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে, কিন্তু পিছনে যাওয়া মাত্র সাপটা ফণা নামিয়ে চ'লে গেছে। একবার মনে আছে, তখন তাঁর প্রথম উন্নতির অবস্থা, সঙ্গে লোক আলো নিয়ে আসছে সাপটার সঙ্গে এমনই মুখোমুখি অবস্থায় পড়েছিলেন। তখন উকিল বৃদ্ধ দীনবন্ধুবাবু বেঁচে ছিলেন। 'সাপ সাপ' চীৎকার ক'রে তাঁর সঙ্গের লোকটা সাপটাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল। দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি চণ্ডীমণ্ডপের গায়েই। তিনি জানলা খুলে বলেছিলেন, চ'লে যেতে দাও না। অবসর দিলেও ও যদি চ'লে না গিয়ে আক্রমণ করতে চায়, তবে ওকে নিশ্চয় মারবে। কিন্তু ও যদি তা না ক'রে চ'লে যায়, তবে কেন অনর্থক মারবে ওকে?

তাঁর সঙ্গের লোকটা তাঁর অনুমতি চেয়েছিল—হুজুর?

তিনি বলেছিলেন, দেখ্‌ না। তোর হাতের লাঠি তো তুলেই রেখেছিস। ওখান থেকে ছোবল মেরে তোকে নাগালও পাবে না। যদি এগিয়ে এদিকে আসতে চেষ্টা করে, মারবি।

সাপটা মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা ক'রেই ফণা নামিয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল। পরের দিন দীনবন্ধুবাবু বলেছিলেন, গোপী, সাপটাকে মার নি ভালই করেছ। আমি খুশি হয়েছি ভাই। যতক্ষণ অনিষ্ট করতে চেষ্টা না করে, ততক্ষণ ওদের থাকতে দাও। জগন্মাতার পৃথিবী, ওরাও তাঁরই সৃষ্টি, বেঁচে থাকবার ওদেরও তো অধিকার আছে।

গোপীচন্দ্র তখন সায়েব কোম্পানির কুঠিতে চাকরি ক'রে অনেকটা বদলে গেছেন, দীনবন্ধুবাবু যে যুক্তি দিয়েছিলেন সে যুক্তি তাঁর অন্তরকে তেমন স্পর্শ না করলেও তিনি প্রতিবাদ করেন নাই, আগের রাত্রে সাপটাকে যেমন বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির অনুরোধেই মারতে দেন নি, তেমনই ভাবেই মৃদু বিনীত হাসি হেসে তাঁর যুক্তি স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন।

দীনবন্ধুবাবু সেদিন আরও একটা কথা বলেছিলেন—বলেছিলেন, জান ভাই নাতি, একটা কথা বলতেন আমার মাতামহ। আমাদের তখন বিশ-বাইশ বছর বয়স, পরীক্ষা দেব, রাত জেগে পড়ছি, মামার বাড়িতে মাস্টার থাকতেন, তিনি পড়াতেন। হঠাৎ জানলার বাইরে দেখলাম প্রকাণ্ড একটা গোখরো। 'সাপ সাপ ব'লে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে দিলাম পিটিয়ে। মেরে ফেললাম। মাতামহ জেগে উঠে বাইরে এসে দেখে বললেন, মেরে ফেললি দীনো? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আমি একটু বিরক্ত হয়েই বললাম, সাপ মারাতে দোষ হ'ল কর্তাদাদা? তিনি বললেন, দোষ একটু হ'ল বইকি। ও তো কোন দোষ করে নি তোর কাছে! তোর কাছে কেন, বাড়িতে ও অনেক দিন আছে। তা তোর জন্মের আগে থেকেই ওকে দেখছি। পঁচিশ-তিরিশ বছর তো হবেই। কিন্তু ভাই, আজও পর্যন্ত ও কাউকে মাথা তুলে ফোঁস ক'রেও ভয় দেখায় নাই। ইঁদুরটা ব্যাঙটা ধ'রে খায়। রাত্রে সবাই ঘুমুলে তখন বের হয়। জানিস, একদিন গলি-পথে বৈঠকখানা থেকে বাড়ি ঢুকছি, হঠাৎ মনে হ'ল, ঠিক সামনে দিয়ে সাপ চ'লে গেল। গলিটা কত সরু তা দেখেছিস্ তো! ভয় পেয়ে 'দেখ্ দেখ্' ক'রে এগিয়ে এলাম বাড়ির দিকে। কোথাও পেলাম না। শেষে দেখি, গলির এক পাশে বাড়ির দেওয়ালের ভিতর আর গলির গায়ে একেবারে লম্বা হয়ে লেগে রয়েছে। নড়ে না পর্যন্ত। আমি তুবার ওরই খোঁজে পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করেছি। কিন্তু ও আমাকে সহ্য করেছে। আমি আর ওকে মারতে দিই নি।

দীনবন্ধুবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, জান, সেদিন আমার কথাটা ভাল লাগে নাই ভাই। তোমার চেয়েও কম বয়স, রক্ত আরও তাজা, আরও

গরম। কিন্তু ভাই, বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই কালের যা দেখলাম বুঝলাম, তাতে এখন মনে হয়, কথাটা কর্তাদাদা অন্যায় বলেন নাই হে। মানুষের সঙ্গে গ্রামের ভেতরে যে সব সাপ বাস ক'রে, তারা মানুষকে মহামান্যে সম্ভ্রম ক'রেই বাস করে। তা-ই যখন করে ভাই, তখন ওদিগে যদি বিনা অপরাধে বধ কর, তবে যিনি সব সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে জবাবদিহি কি করবে?

গোপীবাবু বৃদ্ধের প্রতি সম্ভ্রমবশতই এ সব কথা বিনা প্রতিবাদে শুনেই মেনে নেওয়ার ভান করেছিলেন। আজও যে ঠিক মানেন তা নয়। তবে খানিকটা সত্য ব'লে মানতে বাধ্য হয়েছেন। গ্রামের ভিতরে মানুষের সঙ্গে বাস করে যে সব সাপ, তাদের স্বভাব এই সাপটার মত হয়।

এই কারণেই আজ ছেলে দুটি সাপটার পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে যাওয়ায় তিনি শঙ্কিত হন নি, কারণ সাপটা আক্রমণ করলে কি কামড়ালে ওরা চীৎকার করত। কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন, অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন এই রকমের দুটি ভদ্রসন্তান কোন্ কাজে এই রাত্রে এমন গোপনে চলেছে? তাঁর সাড়া পাওয়া মাত্রেই এমন ভাবে সাপের পাশ দিয়ে ছুটে চ'লে গেল কেন? তাঁর বয়স হয়েছে, চোখে চালশে ধরেছে, কাছের জিনিস কম দেখতে পান, কিন্তু দূরের দৃষ্টি তো স্পষ্ট। তাঁর মনে হচ্ছে একজনকে তিনি চিনেছেন। কিশোর পবিত্রের সহপাঠী ছিল, ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে। ওদের দুজনের মধ্যে প্রীতিও যত, প্রতিযোগিতাও তত। কিশোর পাঠ্যজীবনে পবিত্রকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। ছেলেটির আকৃতির মধ্যে মহিমা আছে, রূপের মধ্যে দীপ্তি আছে, কণ্ঠ সঙ্গীতের দানে ভ'রে দিয়েছেন ভগবান। বয়সের বশে দূরের দৃষ্টি যদি বা একটু আধটু ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে তো থাকতে পারে, কিন্তু বয়সের ফলে তাঁর সার্থক বিপুল কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় দূরদৃটি যে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তাঁর নাই। তিনি দিব্য দেখতে পান এই ছেলেটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেই কিশোর এই রাত্রে এমন ভাবে কোথায় যাচ্ছে? কয়েক মিনিট ভেবে তিনি আলোটি কমিয়ে হাতে নিয়ে নিঃশব্দে উপর থেকে সকলের অলক্ষিতে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলোটা জোর ক'রে দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সামনে রাস্তাটার প্রসারসীমার মধ্যে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। জ্যোৎস্নায় সমস্ত মাঠখানা যেন দুধে সদ্য স্নান ক'রে উঠেছে। এমন জ্যোৎস্নার মধ্যে তো মানুষ থাকলে মিলিয়ে যাওয়ার

কথা নয়। ঠিক এই মুহূর্তেই মড়মড় শব্দ তাঁর কানে এল। চমকে উঠলেন তিনি। এ কি দুর্দান্ত অসমসাহসিকতা! অশৌচের হাঁড়িগুলো ভেঙে ওরা এগিয়ে চলেছে ওই অর্ধশ্মশান অর্জুনতলার দিকে! সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসিও এল। ছেলে দুটি তাঁকে জানে না। তারা তাঁকে আশৈশব ধনীস্বরূপে দেখে আসছে। দেখে আসছে, কাছারি থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসেন তিনি—তাঁর আগে থাকে আলো হাতে একজন চাকর, লাঠি হাতে একজন চাপরাসী, পিছনে থাকে তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বাক্স কাঁধে একজন চাকর এবং প্রায়ই কর্মচারীও একজন থাকে। বাড়ি থেকে তিনি ওই ইস্কুলডাঙা পর্যন্ত যান—গাড়িতে যান, কোচম্যানের পাশে থাকে চাপরাসী। তাঁর এই রূপ দেখে ছেলে দুটি ভেবেছে ধনী তিনি, এ পৃথিবীতে কীট-পতঙ্গ জীব জন্তু মানুষ-প্রেত সমস্ত কিছুর আতঙ্কে আতঙ্কিত। তারা আর এক গোপীচন্দ্রকে দেখে নি, তাঁকে তারা জানে না। এ পৃথিবীর কোন স্থানে যেতে তাঁর কোনও আতঙ্ক হয় না। পাঁচ টাকা বেতনেব দীর্ঘাকৃতি যুবক, পরনে কয়লার কালিতে অপরিছন্ন কাপড়, কাঁধে চাদর, পিঠে কম্বল আর লোটা নিয়ে অকুতোভয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—বনের ধারে গাছতলায় রাত্রি কাটিয়েছেন, রাত্রে একলা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন; কুঠিতে ডাকাত পড়েছে, তিনি নির্ভয়ে অল্পদূরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, লড়েছেন তাদের সঙ্গে; বসন্ত-কলেরায় কুলি-বস্তি উজাড় হয়েছে; তিনি নির্ভয়ে তাদের মধ্যে কাটিয়েছেন; শবদেহ কোলে নিয়ে অন্ধকার রাত্রে গাছতলায় একলা ব'সে থেকেছেন, এ পৃথিবীর সমস্ত ভয়াবহতার সঙ্গে একদা তিনি যুদ্ধ করেছেন—আঘাত বহুবার পেয়েছেন, কিন্তু হার কখনও মানেন নি, ভয় কখনও পান নি। তাঁকে ওরা ওই অর্জুনগাছের প্রেত-প্রবাদের ভয়ের আড়াল দিয়ে এড়িয়ে চ'লে যেতে চায়! এই কারণেই ক্ষুব্ধ চিত্তেও তিনি অল্প একটু না-হেসে পারলেন না। নিঃশঙ্ক চিত্তে তিনি পুকুরটার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে গাছটার অল্প একটু দূরে দাঁড়ালেন এবং প্রশ্ন করলেন, কে? কারা তোমরা?

শান্ত নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি চকিত হয়ে উঠল। অদ্ভুত এখানকার প্রতিধ্বনি! ওদিকে কাশীর পুকুরের জঙ্গলে প্রতিহত হয়ে তাঁর প্রশ্ন বেজে উঠল—এদিকে বাড়ির পুকুরের ওপারে তাঁর বাড়ির গায়ে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনি উঠল।

কোন উত্তর এল না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কে? কারা ওখানে? বেরিয়ে এস।

এবারও কেউ কোনও উত্তর দিল না। গোপীচন্দ্র গাছটার তলার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হয়েই থেমে গেলেন। চারিপাশের ওই পরিত্যক্ত হাঁড়িগুলি মাড়িয়ে যেতে তাঁর শরীর ঘিন-ঘিন ক'রে উঠল, খানিকটা ভয়ও হ'ল—ওর মধ্যে সাপ থাকতে পারে, ভাঙা হাঁড়ির টুকরোয় পা কেটে যেতে পারে। সেটা বিষাক্ত হতে পারে। পল্লীর লোক না জানুক, গোপীচন্দ্র এ তথ্য জানেন। তিনি পিছিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তিনি আবার একটু হাসলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নাঃ, আর সেকালের সে অসমসাহসী দিগ্‌বিজয়ী গোপীকান্ত তিনি নন। ভয় দেখাতে চেয়ে ছেলেরা ভুল করে নি। অদ্ভুত মানুষ গোপীকান্ত। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরলেন। যাক, ওরা যেখানে যাচ্ছে যাক। তিনি ওদের অনুসরণ ক'রে বিব্রত করবেন না। তিনি ফিরতে গিয়েও এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সেই কথাটা ওদের জানিয়ে গেলেন—আমি যাচ্ছি। তোমরা বেরিয়ে এস। ওখানে অনেক কিছু বিপদ হতে পারে। চলে যাও যেখানে যাচ্ছ।

অভ্যাসমত ঈষৎ অবনমিত হয়ে দীর্ঘাকৃতি মানুষটি নীরবে ফিরে গেলেন। তাঁর হাতের লণ্ঠনটা দুলছিল, স্বর্ণবাবুর কালীসায়রের তালগাছের মাথায় সে আলোর ছটা চকিত প্রতিফলন তুলে পর মুহূর্তেই নেমে আসছিল। তাঁর পদক্ষেপের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অসমতালে আন্দোলিত হওয়ায় সেই সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, একটা নয়—দুটো আলো চলেছে আগে পিছনে।

শূলপাণি গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে মৃদুস্বরে বললে, শালা!

কিশোর বললে, ছি!

কি? কি করলাম?

গালাগাল দিচ্ছিস কেন?

ওকে গালাগাল দিয়েছি নাকি? কি বিপদটা গেল বল্ দেখি? শালা! হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম—শূলপাণি গোপীচন্দ্রকে গাল দেয় নি, উৎকণ্ঠার ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে তাই এটি তার স্বস্তিবাচক অভিব্যক্তি।

কিশোর একটু হেসে বললে, আমি ভাবলাম ওঁকেই বললি তুই।

বাপ রে! তাই পারি! কত বড় লোক, মহাশয় ব্যক্তি! মুখ্যই হই আর গোঁয়ারই হই, আমরাও বুঝি রে কিশোর, আমরাও বুঝি। পাস ক'রে কলেজে পড়েছিস ব'লে এত হেণ্টাকেণ্টা করিস না।

এই দেখ্! রাগ করছিস তুই!

তু ও কথা বললি কেনে?

আমি মনে করলাম—

মনে করবি কেনে এমন ?

আঃ, তা হ'লে তো বোকা হলাম আমি। তুই নয়।

ভারি ফিচেল তু। কথার প্যাঁচে 'হ্যাঁ'-কে 'না' করতে ওস্তাদ হয়েছিস একটি !

চল্, এখান থেকে চল্ এখন। আবার কি গোলমাল হয় কে জানে! চল্, এই পাড়ের আড়াল দিয়ে পুকুরের গর্ভে গর্ভে চ'লে যাই। রাস্তা সোজা হবে। ডাক্তারবাবু হয়তো ভাবছেন, আমরা এলামই না।

ডাক্তারটাকে আমার ভাল লাগে না। কি রকম লোক, যত সব উদ্ভুট্টি কথা! হুঁ! যেমন উদ্ভুট্টি, তেমনি চ্যাটাং চ্যাটাং!

না না না। ভারি ভাল লোক। দেখ্ না দিন কয়েক আলাপ ক'রে।

দেখেছি। আরে আরে!—দাঁড়িয়ে গেল শূলপাণি।

জলের মধ্যে একটা মাছ উথল মেরে উঠেছে। বড় মাছ নিশ্চয়। কিশোর হেসে বললে, জলে মাছ উথল মারছে, পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে? তোর পায়ের কাছে তো লাফিয়ে এসে পড়বে না?

ততক্ষণে শূলপাণি ঘাড়ের পোঁটলা নামিয়েছে। জলের কিনারায় নেমে পায়ে পায়ে কিছু যেন হাতড়ে চলেছে। খানিকটা গিয়েই সে ব'সে প'ড়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

কি রে?

শালাঃ—। আমার নাম শূলপাণি, আমাকে এড়িয়ে যাবে! এই দেখ্।

সে জলের ভিতর থেকে কালো মোটা মজবুত একগাছি সুতো হাতের শক্ত মুঠোয় ধ'রে টানতে শুরু করলে। সুতোটা টান হয়ে জলের ভিতর নেমে গিয়েছে। কিশোর এবার বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। কোন মৎস্যলোলুপ রাত্রে 'তগি' ফেলে গিয়েছে। স্বয়ংক্রিয় শিকারের যন্ত্রটি টোপ গেঁথে ফেলে রেখে বেচারী প্রতীক্ষমান হয়ে শুয়ে আছে এখন। শেষ রাত্রে এসে তুলে নিয়ে যাবে।

শূলপাণি মাছটা টেনে তুললে। বড় মাছ—দশ-বারো সের পাকা রুই! শালাঃ! মাছটাকে আছাড় দিয়ে ফেলে নাচতে লাগল সে। হঠাৎ নাচ বন্ধ ক'রে সে বললে, তুই যা কিশোর। আমি আর তোর ওসবে নাই আজ বাবা। ফিরে আসবার সময় আসিস, কণ্ট্রোল আপিসে মাছভাজা খেয়ে যাবি।

শূলপাণিকে আর বলা বৃথা। কিশোর নীরবে পোঁটলাটা তুলে নিয়ে চ'লে গেল। গ্রামের বসতির মধ্যেই খানিকটা পুষ্করিণীবহুল বসতিহীন স্থান অতিক্রম ক'রে দাঁড়াল একটা বাড়ির পিছন দিকে। ডাক্তারের বাড়ি। খিড়কির দরজার শিকলটাকে মৃদু শব্দে বাজিয়ে ছেড়ে দিলে। মিনিট খানেক পরেই দরজাটা খুলে গেল। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, কিশোর! আমি ভাবছিলাম তোমার জন্যে।

ভাবছিলেন—এল না এরা।

না না। আমি লোক চিনি মিস্টার। আমি ভাবছিলাম, ঘটল কি? কিছু ঘটেছে নিশ্চয়।

ঘটেছে। রাধাকান্তদাদার বাড়ি থেকে বেরিয়েই চণ্ডীমণ্ডপে পড়লাম সাপের সামনে—

সর্বনাশ! তারপর?

সাপটা আমাদের পাড়ার পুরনো সাপ, অনিষ্ট কারও কখনও করে না, কিন্তু সাপ তো! শূলপাণি উঠল চেঁচিয়ে। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন গোপীকান্তবাবু, তিনি শুনতে পেয়ে কি একটা বলতেই আমরা সাপটার পাশ দিয়েই ছুটলাম।

তারপর? চিনতে পেরেছেন?

কিশোর সমস্তটুকু ঘটনা ব'লে বললে, চিনতে বোধ হয় পারেন নি। কিন্তু গাছতলার দিকে এগিয়ে এলে আমাদের বেরিয়ে ছুট দিতে হ'ত কিংবা ধরা দিতে হ'ত। এগিয়ে এসে উনি পিছিয়ে গেলেন।

ডাক্তার হেসে বললে, বোঝা গেল না ঠিক। যাকগে, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। পিছিয়ে ফিরে গেছেন এইটাই লাভ। এখন চল, বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু—

কি কিন্তু?

ওষুধের বাক্স, চালের পোঁটলা—দুটো নিয়ে যেতে হবে। পথও ক্রোশ খানেক। শূলপাণি এল না, আমরা দুজনে কি বোঝা ব'য়ে যেতে পারব? অভ্যাস নেই তো।

খুব পারব, চলুন। ওষুধের বাক্স না নিয়ে অল্প কিছু ওষুধ বেছে নিন।

রোগী না দেখে অনুমান ক'রে ওষুধ নেওয়া, না-পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার মত কিশোর; দু-একজন হয়তো পাস ক'রে যায়। সেগুলো নেহাতই আকস্মিক ঘটনা—অ্যাক্সিডেন্ট, বুঝছ না। নইলে ফেল হওয়াটাই

স্বাভাবিক নিয়ম। প্রথমটাকে ভাগ্য বলতে পার, বুঝেছ না। মানে, গুরু-বল বা একাদশে বৃহস্পতি বা কবচ মাদুলীর ম্যাজিক—যা খুশি বল না, চ'লে যাবে।

খি-খি-খি-খি ক'রে এক বিচিত্র ধরনে হেসে থাকেন ডাক্তার। হঠাৎ খি-খি শব্দে হেসেই সারা হয়ে গেলেন। আবার হঠাৎ হাসি থামিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, দু-চারজন খুব চতুর ছোকরা, বুঝেছ না, অ-তি —চতুর ছোকরা, যোগাড় করতে পার? যারা খুব ভাল ছেলে নয়, আবার মন্দও নয়, খেলে বেড়ায় খুব, রাত্রি জেগে প'ড়ে পাস করে নিয়মিত— এমনই ছেলে, স্রেফ তারা ব'লে বেড়াবে, সরস্বতী-কবচ নিয়ে পাস করি। বুঝেছ না। কি হবে বুঝেছ? সওয়া পাঁচ আনা, বাস্, বেশি নয়। এইবার হিসেব কর। বছরে দুবার পরীক্ষা—হাফ-ইয়ার্লি, অ্যানুয়েল। হাই ইস্কুল হচ্ছে। অন্তত পক্ষে একশো ছেলে। ব'লেই আবার খি-খি-খি-খি হাসি। গমকে গমকে হাসি ব্যঙ্গে এবং কৌতুকে তীক্ষ্ণ সরস হয়ে উঠল।

কিশোর প্রাণভরে হাসলে ডাক্তারের সঙ্গে। কিছুক্ষণ হেসে ডাক্তার বললেন, চল, তোমার কথাই মেনে নিলাম। আজ অনুমানের চান্সটাই নেওয়া যাক।

কাঠের ওষুধের বাক্স খুলে কতকগুলি শিশি পকেটে পুরে ডাক্তার ছাতাটা হাতে নিয়ে বললেন, চালটা দু ভাগ কর—আমার এখান থেকে গামছা নাও একখানা।

নতুন কাপড় আছে একখানা। রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী কাশীর দিদি দিয়েছেন। ওতেই বেঁধে নিই।

না, কাপড়খানায় কুঁড়ো মাখিয়ে লাভ কি? নাও, একখানা গামছাই নিয়ে নাও। চল, খিড়কি দরজা দিয়েই বেরিয়ে পড়ি। সামনে থানায় দারোগার আড্ডা রাত্রি পর্যন্ত চলে।

*　　　*　　　*　　　*

জ্যোৎস্না রাত্রি। শরৎকালের প্রারম্ভ। দুজনে ওই ইস্কুলডাঙা পার হয়ে চলেছিলেন। ডাক্তার ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছিলেন। হঠাৎ ছাতাটা বন্ধ ক'রে দিলেন—ধুর! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করে, এমন জ্যোৎস্নাকে তা ব'লে উপেক্ষা করা চলে না।

ডাক্তারের এইটি একটি বাতিক। বারো মাস রাত্রে পথ চলতে হ'লেই ছাতা মাথায় দিয়ে থাকেন। ঠাণ্ডাকে ডাক্তারের অত্যন্ত ভয়। বলেন,

আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, অসুখ যত হয় তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হয় ঠাণ্ডা লেগে।

ডাক্তারের ছুটি ছেলে মারা গেছে নিউমোনিয়ায়।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রান্তরের দিকে চেয়ে ডাক্তার বললেন, ইউ সি কিশোর, বঙ্কিমচণ্ডর ইস এ গ্রেট রাইটার। শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীং—ফুল্লকুসুমিভ দ্রুমদল-শোভিনীং। মহাশয় ব্যক্তি, সত্যকারের কবি। দেশের রূপটা দেখেছেন বটে! গাও না, গানখানা গাও না হে। মনে মনে ভাবি, 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী চলেছি দুজন।

তরুণ কিশোরের মনেও রূপের মোহের ছোঁয়াচ লেগেছিল। এমন অবারিত মাঠে জ্যোৎস্নার অপরূপ প্লাবন না-দেখা নয়, এই গ্রামের ছেলে সে, এই প্রান্তর এই জ্যোৎস্না বরাবরই আছে। আঠারো-উনিশ বৎসর বয়সে শরৎকালও এসেছে প্রতি বৎসর ; কিন্তু এই ডাক্তারের মত সঙ্গীর সঙ্গে এমন উদ্দেশ্য নিয়ে পথ চলার কালের যে মন, সে মন নিয়ে কখনও এ রূপ দেখে নি সঙ্গে সঙ্গেই সে গাইতে শুরু করলে। কিশোরের মত কণ্ঠস্বর বিরল, এত মাধুর্য সে কণ্ঠস্বরে, আর এমনই ভরাট ও উচ্চ সে কণ্ঠস্বর যে, গোটা মাঠখানা যেন গানের সুরে ভ'রে উঠল—চারিদিকে গ্রামপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল বর্ষার উতল বাতাসে উচ্ছ্বসিত বেগবতী ভরানদীর ঢেউয়ের আছাড়ের মত।- -

শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীং
মাতরং—
বন্দেমাতরং—

খোলা মাঠে প্রতিধ্বনি ওঠে স্বাভাবিক নিয়মে। বর্ষা-বাদলের পর সে প্রতিধ্বনি স্পষ্টতর হয়, জোরালো হয়ে ওঠে। কিশোর নিজের গানের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে আচ্ছন্ন আবৃত হয়ে ছিল—সুরের মোহ এনেছিল আচ্ছন্নতা, শব্দঝঙ্কার রেখেছিল তার শোনার শক্তিকে ডুবিয়ে। কিন্তু ডাক্তার যেন কিছু শুনতে পেয়েছেন, তিনি কিশোরের হাত ধ'রে ইঙ্গিত করলেন। কিশোর চকিত হয়ে থেমে গেল!—কি ?

কিছু নয়, শোন। মন দিয়ে শোন। —মৃদুস্বরে ডাক্তার বললেন। কিশোর একাগ্র হয়ে উঠল, দৃষ্টিতে ফুটে উঠল তার আভাস।

মাতরং—মাতরং—মাতরং—মাতরং। 'বন্দে'র কম্পিত রেশটুকু জড়ানো আছে প্রতিটি 'মাতরং'য়ের আগে।

বন ও গ্রাম সমাবেশের আকস্মিক বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে স্থানটা হয়ে উঠেছে ভাঙনে ভাঙনে আঁকাবাঁকা নদীর মত, অথবা খিলানে-ভরা বিচিত্রগঠন প্রাসাদের মত, যেখানে ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠেই শব্দ মিলিয়ে যায় না, প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি ওঠে, একটা ধ্বনি দশবার বিশবার ফিরে ফিরে বেজে ওঠে।

কিশোর মৃদু হেসে বললে, অদ্ভুত তো!

সে আবার গাইলে— বন্দেমাতরম্!

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীং
কমলা কমলদলবিহারিণীং
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্!
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং মা-তরং—
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্—
বন্দে-মা-তরম্।

গমকে গমকে সুর উঠে ছড়িয়ে পড়ল, আবার ধাপে ধাপে নেমে এল।

ডাক্তার এক সময়ে বললেন, গ্রাম কাছে এসেছে, চুপ কর।

* * * *

কিশোর চুপ করলে, সঙ্গে সঙ্গে চোখও মুছলে। উনিশ শো ছয় সালের বাংলা দেশের কলেজে-পড়া ছেলে। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দুটি এক-ভাবের ভাবুক একসঙ্গে চলেছে, স্বাভাবিক ভাবেই মনে তার আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। চোখের উপর ভাসছে তার 'আনন্দমঠে'র জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রির ছবি। চোখে জল এসেছিল। ডাক্তার গম্ভীর হয়ে গেছেন। কিন্তু ডাক্তার যে আশঙ্কা ক'রে তাকে চুপ করতে বললেন, সে আশঙ্কা ইতিমধ্যেই সত্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বর্ষার শেষে আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত শূন্যলোক বর্ষণে বর্ষণে ধূলিমালিন্যহীন গাছপালার পল্লবে পল্লবে ঘন নিবিড় হয়ে উঠেছে, বাড়িঘর জলে জলে ভারী হয়েছে। তার উপর কিশোরের দুর্লভ মধুর এবং দীপ্ত কণ্ঠস্বর খোলা মাঠের উপর দিয়ে ছুটে পাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে ধ্বনি তুলেছে।

পাশে বড়গোগা ছোটগোগা—দুখানি গ্রামে চাষীর বাস। সদ্‌গোপ তন্তুবায় গৃহস্থ বৈষ্ণব সকলেই কৃষিজীবী। ছোটগোগায় মুসলমান আছে—তারাও চাষী। দুখানি গ্রামেরই লোক বিস্মিত হয়ে এ গান শুনলে। বড়গোগায় মহাপ্রভুর আখড়ায় চরিতামৃত পাঠ চলছিল, ছোটগোগায়

মসজিদের বারান্দায় মজলিস চলছিল, সকলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্দেমাতরম্ শব্দটি অকস্মাৎ ছড়িয়ে পড়েছে দেশময়, অর্থ কেউ জানে না, শহরে আন্দোলন হচ্ছে। শুনেছে, মর্ম কেউ বুঝতে পারে না—চায়ও না বুঝতে। শুধু জানে; বাবুরা হঠাৎ মোটা তাঁতের কাপড় পরবার হুজুক তুলেছে। এই গানও কেউ জানে না, অধিকাংশ লোকেই শোনেও নাই—সংস্কৃত শব্দ-সমন্বয়ে রচিত এমন অভিনব গান এবং এমন অপরূপ মধুর কণ্ঠস্বর শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে গেল, অভিভূত হয়ে গেল বিস্ময়ে।

মসজিদে ছোটগোগার মাতব্বর মকবুল খাঁ তারিফ ক'রে উঠল। কয়েকজন ছোকরা বললে, দেখব নাকি চাচা, কে এমন গাইছে এত রাতে? তা পহর তো পার হয়ে গিয়েছে গো।

মকবুল বললে, না। গান শুনে বুঝছিস না—বড় তামাশার লোকে গাইছে না। হিঁদুদের কেউ ফকির-দরবেশ হবে। রাতে-বিরাতে একা চলে উয়ারা, দিনমানে মানুষের ভিড়ে তো আসে না, চলছে হয়তো এক আস্তানা থেকে অন্য আস্তানে ঠাকুরদেবতার ঠাঁইয়ে। দেখতে গিয়ে কেনে তাকে বেখুশ করবি বাবা? ব'স্। বড় মিঠা গাইছে কিন্তু।

বড়গোগায় মহাপ্রভুর আখড়ায় চরিতামৃত পড়তে পড়তে চুপ ক'রে গেল মহান্ত বাবাজী। কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করলে। তার দেখাদেখি সকলেই নমস্কার করলে। সংস্কৃত গান! হয়তো সন্ন্যাসী, নয়তো—

নয়তো?

কপালে আবার একটু হাত ঠেকিয়ে হাসলে মহান্ত। কে জানে, কত সময় কত দৈবখেলা হয়! এমন সুর, এমন গান! দেবলোকের স্তবপাঠ কি—,কে জানে!

সামনের গাঁ ভালাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা নিজ হাতে চাষ করে না ব'লে ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত, তাদের বাস। সেখানেও গিয়ে গান পৌঁছেছিল।

ছেলেরা অবাক হয়ে গেল। বন্দেমাতরম্! কে গাইছে? কিন্তু যেতে সাহস হ'ল না। চোর-ডাকাত হ'লে হৈ-হৈ ক'রে বের হ'ত ওরা, কিন্তু বন্দেমাতরম্ গান যারা গাইছে এই রাত্রে মাঠের মধ্যে, তাদের দেখতে যেতে ওদের সাহস নাই। শুধু প্রবীণ কবিরাজ গুপ্ত মহাশয় জানলা খুলে ব'সে রইলেন মাঠের দিকে চেয়ে। কেমন যেন হয়ে গেছেন তিনি।

নবগ্রামে কিশোরের কণ্ঠস্বর অপরিচিত নয়। সেখানে লোকে বিস্মিত

হ'ল না, শুধু মুগ্ধ হ'ল, অনুমান করলে—কোথাও গ্রামপ্রান্তে জ্যোৎস্নার মধ্যে ব'সে কবি কিশোর—গায়ক কিশোর গান গাইছে।

পবিত্র ও অমরবাবু অভিনয়ের আলোচনা করতে করতে চুপ ক'রে ব'সে শুনলেন। অমরবাবু বললেন, গাইতে গাইতে চলেছে কেউ।

পবিত্র বললে, আমাদের কিশোর।

নিজের ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে গোপীচন্দ্র স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিশোরকে তিনি চিনেছেন। কিন্তু কেন সে এমনভাবে সাপকে পাশে রেখে ছুটে চ'লে গেল? কেন সে এমন ক'রে ওই অর্ধশ্মশানে, ওই বহু প্রবাদের আশ্রয় অর্জুনগাছের আড়ালে গিয়ে লুকাল? প্রথমে অনুমান করেছিলেন তিনি, কিশোর জীবনে ভ্রষ্ট হয়েছে, অধঃপতন হয়েছে তার। কিন্তু সে তা হ'লে এই গান গায় কেন? চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। নীল আকাশ জ্যোৎস্নায় গাঢ় উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করছে, একটানা প্রসারিত উজ্জ্বল নীলের যেন প্রশান্ত সমুদ্র। ওই আকাশেব মধ্যে যেন তিনি দশা হারিয়ে ফেলেছেন। কোনমতেই কিছু অনুমান ক'রে উঠতে পারছেন না। শুধু উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। একটা অসহনীয় অস্বস্তি ভোগ করছেন; কিসের এত গোপনীয়তা, কি করতে চলেছে ওরা?

*　　*　　*　　*

এত গোপনীয়তার সত্যই প্রয়োজন ছিল না। অতি নির্দোষ এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার। কিশোর একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়েছে। সভ্য মাত্র চাব-পাঁচজন। কাজ দুঃস্থ ভদ্রপরিবারদের সাহায্য করা। পাছে প্রকাশ্যে সাহায্য নিতে তাঁরা লজ্জা পান, বেদনা অনুভব করেন, সেই কারণে গোপনে সাহায্য করার ব্যবস্থা হয়েছে। রাত্রিতে সাহায্য দিয়ে আসে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে মহম্মদ মহসীনের কাহিনী থেকে। স্থানীয় উদাহরণের প্রেরণা আছে। রাধাকান্তের জ্যেঠামহাশয় এবং বাবা দুজনেই ছিলেন উকিল। তাঁরা গ্রামের দুঃস্থ পরিবারদের বিচিত্র কৌশলে সাহায্য করতেন। দুঃস্থ পরিবারের দূরান্তরের আত্মীয়ের নাম ক'রে তত্ত্ব পাঠাতেন। অপরিচিত তত্ত্ব-বাহক আসত কাপড়, মিষ্টি, কিছু অর্থ নিয়ে। সে কাহিনী আজও এখানে খুব পুরোনো হয় নি। প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ হ'ল কিশোর এবং ওই ডাক্তারটি। কিশোর প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিল ব্যক্তিগতভাবে। কিন্তু তার সামর্থ্য কোথায়? তার বাড়ির ব্যবস্থা এবং শাসন অত্যন্ত কড়া। একমাত্র তার মা ছেলের সকল কাজকে স্নেহের গভীরতায় সমর্থন করেন।

সংসারের ভাণ্ডারের কর্ত্রী হলেন কিশোরের পিসীমা। শাসন তাঁর ক্ষমাহীন, বাক্য নিষ্ঠুর মর্মচ্ছেদী, দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সন্দিগ্ধ, ভ্রাতৃবধূদের প্রতিটি পদক্ষেপ, বিশেষ ক'রে ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ার উপর তারা পা দিলেই তিনি চকিত হয়ে ওঠেন। দোষও অবশ্য তাঁর নাই, একালে বধূদের নিরেনব্বুই জন চাল চুরি ক'রে থাকে। বউরা বলে, না করলে আমরা পাই কোথা? আমাদেরও তো হাত-পা চলা চাই! চুলের দড়ি কাঁটা, মাঝে মধ্যে দু-একখানা খাম পোস্টকার্ড, কখনও কখনও দু-চার পয়সার তেলে-ভাজা বা মিষ্টি—এর সংস্থান তারা করে কোথা থেকে? কিশোরের মায়ের নিজের জীবনের প্রয়োজন কম, চুলের ফিতে তেলে-ভাজা পোস্টকার্ডের দরকার তাঁর হয় না, তাঁর নিজের দরকার তেলের পয়সার, তাঁর হাতেই সংসারের রান্নার ভার, বরাদ্দ তেলে রান্না ক'রে কুলানো হয়তো যায়, কিন্তু সে রান্না রেঁধে তৃপ্তি হয় না। সেই কারণে তেল তাঁকে গোপনে কিনতে হয়। আর প্রয়োজন হয় কিশোরের হাত-খরচের। এর উপর কিশোর যখন এই কাজ আরম্ভ করলে, তখন তাঁকে বিব্রত হতে হ'ল; কোথায় পাবেন তিনি এত চাল? দু-সের চার সের চাল সরালে বুঝতে পারা কঠিন, কিন্তু আধ মণ এক মণ চাল সরালে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন কিশোরের পিসীমা। তা ছাড়া আঁচলে লুকিয়ে এত চাল সরানোও অসম্ভব। তিনি বারণ করেছিলেন কিশোরকে, বলেছিলেন, বাবা, গরিব গেরস্ত যারা, তারা কি সাহায্য করতে পারে, না. দানধর্ম তাদের সাজে? ও সব কাজ বড়লোকের। ভগবান যাদের অখিল পুরে দিয়েছেন, এ কাজ তাদের।

কথাটা তাঁর সান্ত্বনা দেবার জন্য মুখের কথা নয়, একালের বিশ্বাস তাই। গৃহস্থের দান মুষ্টিভিক্ষায় সীমাবদ্ধ। আয়ের অতিরিক্ত দানে পুণ্য হয়তো হয়, কিন্তু তাতে গৃহস্থলক্ষ্মী চঞ্চল হন, রুষ্ট হন।

কিশোর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে প্রায় একটা বেলা সে বসেছিল। মায়ের তা সহ্য হবার কথা নয়, সহ্যও হয় নি তাঁর। অনেক ভেবে তিনি গিয়েছিলেন খুড়ীর অর্থাৎ খুড়শাশুড়ী কাশীর বউয়ের কাছে। কাশীর বউ—রাধাকান্তের স্ত্রী বয়সে তাঁর কন্যার বয়সী, কিন্তু সম্পর্কে তিনি খুড়শাশুড়ী, কয়েকটি বাড়িতেই তিনি খুড়ী নামেই চলেন। মেয়েটিকে শুধু ভালই লাগে না, শহরের এই গুণবতী মেয়েটিকে সম্ভ্রমও করতে হয়। এই মেয়ে নিশ্চয় কিশোরের এই ভাল কাজের উদ্দেশ্য বুঝবে। বুঝেওছিলেন কাশীর বউ। বলেছিলেন, বউমা, আপনার এ

ছেলে সাধারণ ছেলে নয়। এ গ্রামের অনেক কল্যাণ আপনার কিশোর করবে। ওকে আপনি পাঠিয়ে দিন আমার কাছে, আমি চাল দেব।

কাশীর দিদির সঙ্গে এই তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রথম সূত্র। শুধু তাই নয়, সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়ারও প্রথম পর্ব। তিনিই বলেছিলেন, এক কাজ কর ভাই, আরও দু-পাঁচজনকে ব'লে তাঁদের কাছ থেকেও চাল টাকা নিয়ে জমা কর। তারপব যাকে যেমন. বিবেচনা ক'রে সাহায্য করবে।

কিশোর হেসে বলেছিল, আপনি শহরের লোক দিদি, এ সব পাড়াগাঁয়ের বড়লোকদের জানেন না। যে দানে নাম জোটে না, সে রকম দান এঁরা করেন না। তা ছাড়া দান ক'রে পুণ্য সঞ্চয় করতে হ'লে গবিবকে নিজে হাতে তুলে নাকি দিতে হয়। দাতাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে গ্রহীতা, তবে তো দান ক'রে আনন্দ। ওঁরা এমন গোলে হরিবোল দেবেন কেন?

তাতেও কাশীর বউ দমেন নি। বলেছিলেন, একটা কথা এখানে এসে শিখেছি নাতি, কথাটা হচ্ছে—সংসার বহু রত্নের পুরী, কেউ কাঁদছেন কেউ হাসছেন কেউ করছেন চুরি। সবাই হাসে না, সবাই কাঁদে না, সংসারে সবাই চোর নয়। ভাল মন্দ নিয়েই ভগবানের পৃথিবী। এমন ভালকাজে রাজী হবেন এমন লোক এখানে নেই, এ কি হয়? তোমাদের নূতন কালের ছেলেদের মধ্যে দেখ না।

কিশোর উৎসাহিত হয়ে কাজ শুরু ক'রে ধীরে ধীরে ছোট্ট একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে। সব চেয়ে বড় আশ্রয় হয়েছেন এখন ওই ডাক্তাবটি। ডাক্তারই সংগ্রহ করেছেন কয়েকজন সাহায্যদাতা। তার মধ্যে জন পাঁচেক আছেন, যাঁরা গ্রামেই থাকেন। কালাচাঁদ চন্দ্র, ফকির দত্ত—এঁরা বণিক সম্প্রদায়ের মাথার লোক, ব্যবসা আছে। তাঁরা ডাক্তারের বাড়িতে মাসে নিয়মিত এক মণ হিসাবে চাল পাঠিয়ে দেন, ডাক্তার বলেছেন—ভাল কাজে লাগবে, তাই তাঁদের কাছে যথেষ্ট, জানতেও চান না, কি সে ভাল কাজ অথবা কত খরচ কত জমা! আর তিনজনের একজন স্বর্ণবাবুর মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার। একজন মণি দত্ত, সেও বণিক সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট লোক—বিশিষ্ট শুধু অবস্থার দিক দিয়েই নয়, অন্য দিকেও সে বিশিষ্ট; জেলার হাই স্কুলে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে এবং গ্রামের সকল বিধানে বিধিতে সে একটা না একটা হাঙ্গামা বাধিয়েই আছে সর্ব সময়ে। গ্রামে সে ব্যবসা পর্যন্ত করে না, ব্যবসা করে এখান থেকে সাত মাইল দূরে রেল-স্টেশন যেখানে আছে সেখানে। মণি দত্ত এ সব

ব্যাপারের অনেকটা জানে। আর দুজনের একজন—ননীমাধব দত্ত জাতিতে কায়স্থ, পেশায় কবিরাজ এবং ডাক্তার দুই। শেষের জনটি রাধাকান্তবাবু। ডাক্তারের সঙ্গে রাধাকান্তের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ডাক্তার ঠিক বিদেশী লোক নন, তবে গ্রামের লোকও নন। এ গ্রামে প্রথম প্র্যাকটিস করতে এসে রাধাকান্তের বাড়িতেই উঠেছিলেন। রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই তাঁর ডাক্তারখানা ছিল প্রথম প্রথম, কিছুদিন তাঁর বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করতেন। ডাক্তার তখন অবিবাহিত। তার কারণ ডাক্তার গোত্রে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় হ'লেও চলিত উপাধিতে ছিলেন চক্রবর্তী, কুলীন ছিলেন না, সেই কারণে ডাক্তারী পাস করা সত্ত্বেও স্থানীয় কুলীনের সমাজে কেউ তাঁকে কন্যাদান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাধাকান্ত এর প্রতিবাদ ক'রে গোত্র অনুযায়ী ডাক্তারের চক্রবর্তী উপাধির পরিবর্তে মুখোপাধ্যায় উপাধি দিয়ে নিজে উদ্যোগী হয়ে বর্ধমান শহরে তাঁর বিবাহ দিয়েছেন। এখন ডাক্তার স্বতন্ত্র বাস করছেন, নিজে বাড়িও করেছেন; কিন্তু রাধাকান্তের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। সেই কারণেই রাধাকান্তকে না ব'লে তিনি কিছু করেন না। রাধাকান্তকে সবই বলেছেন, রাধাকান্ত অনুমোদনও করেছেন সব। কিন্তু তাঁকে সভ্যদের নাম বলেন নি ডাক্তার, তিনিও জানতে চান নি। সকল বিষয়ের মত এ বিষয়েও তিনি উদাসীন। শুধু সাহায্য তিনি দিয়ে থাকেন। কাশীর বউ সাহায্য করেন, সে কথাও তিনি জানেন না। কাকে সাহায্য করা হয়, সে প্রশ্নও করেন না।

আজ তাঁরা কিন্তু চলেছেন নির্ধারিত গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রে। সে ভৌগোলিক গণ্ডির দিক থেকেও বটে, বিবিধ-নিয়মের গণ্ডির দিক থেকেও বটে। নবগ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে শেখেরবাঁধ গ্রামে এক অতি দুঃস্থ হরিজন-পরিবারকে সাহায্য দিতে। নবগ্রামের গণ্ডির বাইরে এত দূর তাঁরা কখনও এই কাজে অগ্রসর হতে সাহস করেন নি। ডাক্তারই বলতেন, চ্যারিটি বিগিন্‌স্‌ অ্যাট হোম। অন্য দিক দিয়ে শুধু ভদ্র সম্প্রদায়ের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে হরিজন-সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেছেন ব'লেই নয়, আরও অন্য কারণে তাঁরা আজ এমন ক্ষেত্রে পদার্পণ করতে চলেছেন, যে ক্ষেত্রটি সমাজের চক্ষে, দেশের চক্ষে অপবিত্র অস্পৃশ্য ব'লে পরিগণিত। এই হরিজন-পরিবারটি এ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ জগা ডাকাতের পরিবার। জগা ডাকাতের জাতিবাচক উপাধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে; নিষ্ঠুর নৃশংস তার প্রকৃতি। ব্যভিচারী জগা এ অঞ্চলের ভয়ঙ্করদের একজন, নবগ্রামের অর্জুনগাছের ওই কালপুরুষের চেয়ে লোকে তাকে কম ভয় করে না।

প্রচণ্ড তার শক্তি, দুর্দান্ত তার সাহস, একা লাঠি ধ'রে সে হাঁক মেরে একশো লোকের জনতাকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়। শেখের বাঁধ গ্রামখানি শেখ অর্থাৎ মুসলমান-প্রধান ; এখানকার শেখেরা সকলেই কৃষিজীবী, তাদের সঙ্গে জগার সম্প্রদায়ের জাতিগত শ্রেষ্ঠতা নিয়ে বিরোধ লেগেই আছে। মুসলমানেরা জগাদের বলে—ছোটলোক, জগাও তাদের বিধর্মী ব'লে ঘৃণা করে, মুখে মুখেই গাল দিয়ে কথা বলে। সেই জগা এখন জেলে। নবগ্রামের পাশের গ্রামেই ডাকাতির অপরাধে তার সাজা হয়েছে। দলের একজন বেইমানি ক'রে সরকারী সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অন্যথায় জগার সাজা হওয়া অসম্ভব ছিল। ডাকাতি সে'রেই অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর মধ্যে বিশ মাইল পথ হেঁটে সদর শহরে এক উকিলবাবুর দাওয়ায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে সকালে উঠেই নারীঘটিত একটা বাজে নালিশ দায়ের ক'রে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিল। যাক সে কথা। জগা আজ জেলে, তার স্ত্রী দুটি কন্যা এবং দুটি ছেলে নিয়ে চরম দুর্দশায় প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে দিন কাটাচ্ছে। একটা ছেলের বুকে সর্দি বসেছে,—শ্লেষ্মা বুকে নিয়ে জ্বর অর্থাৎ নিউমোনিয়া। পাশের গ্রামে কবিরাজ আছেন, তিনি দয়াপরবশ হয়ে প্রথম প্রথম ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু ওদের বাড়ি যেতে সাহস করেন নি। থানা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে,—কে বা কারা এই সময়ে জগার বাড়ি যায়, তাদের সাহায্য করে, সে সমস্ত তথ্য তাদের নথিতে লিখে রাখছে। এ অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিই জগার পরিবারের এই দুর্দশাকে বিধাতার দেওয়া শাস্তি ব'লে মনে করছে। মনে মনে দুঃখ তাদের হয় না এমন নয়, তবে একালের এই ধারণা।

ডাক্তার বলেন, বিচিত্র ব্যাপার, বুঝেছ না কিশোর! সাপ যতক্ষণ অনিষ্ট না করে ততক্ষণ এরা তাকে মারতে চায় না। কিন্তু মানুষকে ক্ষমা নেই এদের।

একটু থেমে থেমে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলেন, তবে রাধাকান্তবাবু একটা কথা বলেন কিশোর, সেটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। বুঝেছ না! উনি বলেন, দেখ ডাক্তার, একটু ভেবে দেখ। বিধাতা বহু বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি সৃষ্টির কর্ম নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী তার প্রকৃতি গঠন করেছেন, সেই অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাকে দিয়েছেন। সাপের মুখে দিয়েছেন বিষ. বাঘের পায়ে দিয়েছেন প্রচণ্ড শক্তি—তেমনই ধারালো ভীষণ নখ, মুখে দিয়েছেন তেমনই দাঁত। ওদের প্রকৃতিও তিনি ঠিক সামঞ্জস্য রেখে গড়েছেন। জীব-জগতে হিংসাই ওদের

কাজ, ধ্বংসকার্যে বিধাতার ওরা অনুচর। সৃষ্টির রাজ্যে জীবনের ক্ষেত্রে তারা এলেই তাদের মারে মানুষ। এখন ভেবে দেখ, কোন সাপ যদি মানুষের রাজ্যে নিজের স্বভাবকে সংযত ক'রে বাস করে, কোন বাঘ যদি নিজের প্রকৃতিকে নম্র ক'রে বাস করে, তবে তাদের জন্য করুণা মানুষের স্বাভাবিক ভাবেই হবে। কিন্তু মানুষকে বিধাতা যে প্রকৃতি দিয়ে কর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন, কোন মানুষ যদি তাকে লঙ্ঘন করে, তবে তাকে ক্ষমা কি ক'রে কোন্ যুক্তিতে করবে তুমি? শাস্তি দেবার অবশ্য তোমার আমার অধিকার নাই, আছে এক ভগবানের আর আছে রাজার; আমরা শাস্তি দিতে গেলে যেমন অন্যায় করব, তেমনই অন্যায়ই করব যে শাস্তি সে পেলে তার কর্মফলে, তাকে লাঘব করতে গেলে। ভেবে দেখ তুমি।

কিশোর ঠিক এর উত্তর খুঁজে পায় না। কিন্তু ডাক্তারের মতই রাধাকান্তের এই প্রাচীনকালের মতামতকে সত্য ব'লে মানতে পাবে না। তা হ'লে কি জগন্নাথের স্ত্রী-কন্যা-পুত্র না খেয়ে মরবে? ওর ছেলেটা নিউমোনিয়ায় বিনা চিকিৎসায় বিনা ওষুধে মরবে?

জগন্নাথের স্ত্রী নিরুপায় হয়ে একখানা দুর্গন্ধযুক্ত শতছিন্ন বেনারসী শাড়ি প'রে আজই সকালে এসে ডাক্তারের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। জগন্নাথের স্ত্রী স্বামীর শক্তির উদ্ধত মর্যাদাকে মান্য ক'রে চলে, স্বামীর অহঙ্কারে সে অহঙ্কৃতা। তার জন্য সে দুঃখ সহ্য করতে কাতর নয়। সুখের প্রতি লোভ অনেক, কিন্তু দুঃখেতে ভয় করে না। জগন্নাথ যখন এক-একটা কীর্তি ক'রে ফেরে, তখন জগার স্ত্রী খাওয়াপরায় বিলাসে সত্যসত্যই নেশায় মেতে থাকে, পাকিমদের বোতল তখন ঘরে জমা করা থাকে। বড় বড় মাছ তখন কিনে খায়। আবার জগন্নাথ যখন জেলে যায় তখন দুর্দশা হয়, সে দুর্দশা নীরবেই সহ্য করে। তখন জালিতে মাছ ধ'রে পাড়ায় বিক্রি করে। কিন্তু এবারের মত দুর্দশা এবং বিপদ কোনবার হয় নি। অন্যবার জগন্নাথের মহাজনেরা গোপনে সাহায্য ক'রে থাকে। এবার সে সাহায্য বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ, বিরোধ ক'রে জগন্নাথ এবার একজন মহাজনের বাড়িতেই ডাকাতি করেছে। অন্য মহাজনেরা এ দৃষ্টান্তে ভয় পায় নি, বরং ক্রুদ্ধ হয়েছে। মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তারা একবাক্যে ব'লে দিয়েছে—না, তাতেও জগন্নাথের স্ত্রী দমে নি। বাড়িতে ঢেঁকি পেতে দুই মেয়েকে নিয়ে ধান ভানতে শুরু করেছিল।

কিন্তু দেহে শক্তি থাকতেও ঢেঁকি চলল না। ধান দিলে চাল পাওয়া যাবে কি না এই সন্দেহে প্রায় সকলেই ফিরিয়ে দিয়েছে। দিয়েছিলেন

কিছু ধান পাশের গ্রামের কবিরাজ ওই গুপ্ত মহাশয়। জগন্নাথের স্ত্রী দশজনের সন্দেহকে সত্যে পরিণত ক'রে সে ধান ভেঙে খেয়েছে। জগন্নাথের স্ত্রীরও দোষ ছিল না, ধান অল্প, তার বাড়ির খরচ অনেক। এক সের দু সের হিসেবে খেতে গিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই সব ধানের চাল শেষ হয়ে গিয়েছে। গুপ্ত মহাশয় উৎপীড়ন বা তিরস্কার করেন নি, কিন্তু আর ধানও দেন নি।

তারপর জগন্নাথের স্ত্রী জাল নিয়ে মাছ ধরার কাজ আরম্ভ করেছিল। দুই মেয়েকে নিয়ে তিনখানা জালিতে গৃহস্থের পুকুরে কুঁচোচিংড়ি তার সঙ্গে কিছু মৌরলা পুঁটি ধ'রে গৃহস্থকে অর্ধেক ভাগ দিয়ে সেই মাছ বিক্রি করত। তিনজনে গড়পড়তা তিন সের মাছ ভাগে পেত। ছ পয়সা সাত পয়সা সের দরে সাড়ে চার আনা পাঁচ আনা উপার্জন হ'ত, তাতে চ'লে যেত সংসার। উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা দেশে কাঁচির মাপ অর্থাৎ ষাটের ওজন দেশে প্রচলিত; দেড় টাকা দু টাকা চালের মণ, দৈনিক পাঁচ আনা উপার্জনে ছ জনের সংসার চ'লে যেত এক রকমে। কিন্তু জালি দিয়ে মাছ ধরার ব্যবস্থা বারো মাস চলে না। বর্ষায় পুকুর ভ'রে গিয়েছে। মাঠে এখন প্রচুর মাছ, খুচরো মাছের দর এখন দু পয়সা থেকে চার পয়সা। জগন্নাথের পরিবারে অর্ধাশন আরম্ভ হ'ল। এত দুর্দশার মধ্যেও কিন্তু জগন্নাথের স্ত্রী ভিক্ষা করতে বের হয় নি, অথবা ছেলে দুটিকে রাখালির কাজে লাগতে দেয় নি। জগন্নাথ সর্দারের ছেলে তারা, জগন্নাথের পরিবার বলে—বাঘের বাচ্চা শেয়াল-কুকুরের কাজ করবে? সর্দার যখন ফিরে আসবে, তখন তাকে মুখ দেখাব কি ক'রে?

বড় ছেলেটার বয়স বছর বারো। সে কিছু সাহায্য করতে পেরেছে। মাঠ থেকে বাগান থেকে ফসল ফল আনতে পেরেছে। চুরি ক'রে নয়, প্রকাশ্যেই নিয়ে আসে। মধ্যে মধ্যে মার খায়। কিন্তু তাতে দমে না। বর্ষার সময়, মাঠে এখন ফসল শুধু ধান, তাও কাঁচা; বাগানের গাছেও এখন ফল নাই, কচি পাতায় পাতায় গাছগুলি ভ'রে উঠেছে।

ছোটটির বয়স আট। এটির শরীরও জন্মাবধি দুর্বল। এইটিই পড়ল জ্বরে। প্রথমে কম্পজ্বরে পড়ল। শ্রাবণের শেষ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত তিনবার জ্বর হ'ল, চারবারের বার বুকেও বসল সর্দি। কবিরাজ গুপ্ত ব'লে দিয়েছিলেন, শিউলিপাতার রস খাওয়াতে। জগন্নাথের স্ত্রী অবহেলা করে নি তাঁর কথা। তবে নিয়মিত কিছুদিন ধ'রে খাওয়ানো হয় নি। যখন জ্বরে পড়েছে তখন খাইয়েছে। জ্বর সেরেছে তখন বলছে—এইবার ভাল

ক'রে খা। শরীরে বলাধান হ'লেই জ্বর পালাবে। এবার জ্বর হ'লে, সঙ্গে সঙ্গে গলায় সাঁই সাঁই শব্দে একটা ডাক উঠতে শুরু করল। আগে জ্বর ছেড়ে ছেড়ে আসত, এবার আর জ্বর ছাড়ল না। জগন্নাথের স্ত্রী কবিরাজের ওখানে গেল ছেলেকে কোলে নিয়ে। কবিরাজ দেখে বললেন, তাই তো রে এ যে বেশ পাকিয়ে ফেলেছিস, অ্যাঁ! বুকে বেদনা-টেদনা আছে?

আছে বাবা। সারারাত কুঁতিয়েছে।

হুঁ। ওষুধ আমি দিচ্ছি বাবা। তবে রোগটি বড়লোকের মা। পুলটিশ মালিশ অনেক কিছু চাই। তা নিয়ে যাস। ওষুধ আমি দোব। ঠাণ্ডাকে সাবধান। বুঝেছিস? আর একটি কথা। চল্, ওই ওদিকে চল্।

আড়ালে ডেকে বললেন, এখানে আসবি বাবা একটু সাবধানে, বুঝেছিস? সন্ধ্যের পর বরং একেবারে বাড়ির ভেতরে আসবি। তোকে সেবার ধান দিয়েছিলাম, দফাদার বেটা এসে বললে—কবিরাজ মশাই নাকি জগন্নাথের পরিবারকে, ধান দিয়েছেন? বুঝলি না বাছা?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জগন্নাথের স্ত্রী বললে, জানি ওসব বাবা, বুঝিও সব। বেকায়দায় পড়লে হাতী, চামচিকেতে মারে লাথি। তা মারুক। আমিও একদিন এ বেকায়দা থেকে উঠব। বাবা, দফাদার আমার বড় মেয়েকে সেদিন ডেকে হেসে কথা বলেছে। বলেছে—। দাঁতে দাঁতে ঘ'ষে জগন্নাথের স্ত্রী নিষ্ঠুর অক্রোশে বললে, আমি থাকলে বেটার কষে আঙুল ভ'রে মুখের হাসির দাগে দাগে মুখখানাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম। তা আসুক, সর্দাব আসুক।

কবিরাজের ওষুধে ফল হয় নি। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নাই। প্রবল জ্বর, তার উপর বিকারের ঘোরে বকছে, চীৎকার করছে, বিছানা ছিঁড়ছে। জগন্নাথের স্ত্রী যেন পাগল হয়ে গেল। কবিরাজ বললেন, আমার হাতে আর নাই সর্দার-বউ। আমার ওষুধ আমি সবই দিয়েছি মা। কিন্তু ধরল কই? তুই বরং এক কাজ কর্; যদি পারিস, সাধ্যিতে কুলোয়, তো নবগ্রামের ডাক্তারকে একবার ডেকে দেখা। ওদের ওষুধ বিলাতে তৈরী ওষুধ, তেজ ভাল, ফল হ'লেও হতে পারে। নাড়ী দেখে অবিশ্যি—। তা দেখা না কেন একবার।

নবগ্রামের ডাক্তার নবগ্রামের বাইরে দু টাকা ভিজিট নেয়, তার ওপরে ওষুধের দাম। কোথায় পাবে জগন্নাথের স্ত্রী?

বড় মেয়ে বিধবা। সে বললে, মা!

মা কথা বললে না, ফিরে মেয়ের দিকে তাকালে।

মেয়ে বললে, জানবি না হয় আমি ম'রে গিয়েছি।

দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল সর্দারের স্ত্রীর চোখ। মেয়ে কি বলতে চাচ্ছে তার আভাস পেয়েছে সে।

মেয়ে বললে, মহম্মদ টাকা দেবে মা।

মহম্মদ জগন্নাথ সর্দারের লাঠির শাকরেদ একজন। এই গ্রামেই বাড়ি। মহম্মদ তরুণ জোয়ান। সে আজ নিজেকে সমগ্র অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিধর ব'লে মনে করে। একমাত্র জগন্নাথকে স্বীকার করতে হয় তাকে। আজও তার সঙ্গে লাঠি ধ'রে শক্তিপরীক্ষার সুযোগ হয় নি। সংকল্প ক'রেও সাহসে কুলোয় নি। মনে মনে একটা কঠিন আক্রোশ আছে জগন্নাথের উপর—ওস্তাদ-শাকরেদ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আছে। শেখের পাড়ায় শেখেদের জগন্নাথের সঙ্গে জাতি নিয়ে যে বিসম্বাদ, যে আক্রোশ, আসল আক্রোশ বোধ হয় তাই। শেখেদের সর্বাপেক্ষা শক্তিধর মহম্মদ জগন্নাথের অনুপস্থিতির সুযোগে তার কন্যাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ তুলতে চায়।

শেখের পাড়ার প্রধান মকার্খাঁ এর বিরোধী, নইলে এতদিন কোন্‌দিন বাঘে যেমন লাফ দিয়ে প'ড়ে হরিণীকে মুখে নিয়ে পালায় তেমনই ক'বেই মহম্মদ জগন্নাথের বড় মেয়েকে তুলে নিয়ে আসত। মকার্খাঁ বলেছে, খবরদার! ওসব চলবে না। হাঁ। আমার জানটা থাকতে না।

মহম্মদ টিটকারি দিয়েছিল, কেনে গো, জগন্নাথের ডরে না কি?

ডর? মু সামিলে বাত বলিশ মহম্মদ, নোড়া দিয়া দাঁতগুলান তোর ভেঙে দিব।

মহম্মদ বত্রিশটা দাঁত বের ক'রে হেসে বলেছিল, নিয়ে এস তোমার নোড়া, দেখি ভ্যালা নোড়াটাই কেমন!

দেখবি। একদিন আমাকেও দেখাতে হবে। তোকেও দেখতে হবে। সে আমি বেশ জানি। বুঝলি, হিঁদুরা বলে—রাম না জন্মাতে রামায়ণ, তোরে নিয়েও তাই হবে।

মহম্মদ বলেছিল, হিঁদুদের ডরেই তুমি গেলে, বুঝেছ!

ডর হিঁদুরও লয় রে বেতমিজ, জগন্নাথেরও লয়। ডর ওই ওনার। সে হাত তুলে, আকাশের দিকে দেখিয়ে দিয়েছিল। শুন্‌, হিঁদুর মেয়ে ঘরে তুললে তোর যে বাহাদুরি হবে, সে বাহাদুরি শয়তানের বাহাদুরি। খোদাতালা তাতে খুশি হন না। পয়গম্বর তা বলেন নাই। ডর তারই।

একটু চুপ ক'রে থেকে মকাখাঁ আবার বলেছিল, হাঁ, আসুক কেউ হিঁদু, মর্দানা হোক মেয়েলোক হোক, নিজে থেকে এসে বলুক—আমি কল্‌মা পড়ব, মোসলমান হব, তখন যদি আমি ডর করি তখন বলবি। মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে তখন কসুর আমি মানব। তুই যা বলছিস সে হ'ল জানোয়ারের কাম, শয়তানের হদিস,—উ আমি করতে দিব না।

মহম্মদের সমর্থক আছে, তরুণ দলে তার সমর্থক অনেক। কিন্তু মকাখাঁ গ্রামের প্রধান বিশিষ্ট চাষী, ধার্মিক লোক; তাকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর হয় নি। আরও যে ভয়ের অপবাদ মকাখাঁকে দিতে চেয়েছিল মহম্মদ, সে ভয় তার না থাক, তার দলের আছে। জগন্নাথ যে দিন ফিরবে সে দিনের কথা মনে ক'রে তারা শিউরে ওঠে। মহম্মদ বলে, আর রাখ্ তোর জগন্নাথ। আর জগন্নাথ জন কয়েক লোক নিয়ে কি করবে? আমরা এখানে কত জনা, গোটা গাঁ আমরা এক দিক।

সে কথাও সত্য। জগন্নাথ এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মুষ্টিমেয়। কিন্তু তবু ভয়। জগন্নাথ ও তার সম্প্রদায়ের সকলেই হয়তো তাদের জনবলের সম্মুখে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যেতে যেতে তাদের সমসংখ্যক প্রতিপক্ষকে নিয়ে যাবে এ কথাও ধ্রুব সত্য। সেই ভয়ে তারা পিছিয়ে আসে।

অবশেষে মহম্মদ অন্য পথ আবিষ্কার করেছে।

জগন্নাথের মেয়ে যদি স্বেচ্ছায় আসে? খাঁ সায়েব তখন কি বলবে?

জগন্নাথের সংসারে চরম দুর্দশার সংবাদ পেয়ে সে খান কয়েক নোট হাতে নিয়ে চাঁপার সামনে এসে দাঁড়াল।

জগন্নাথের স্ত্রী সমস্ত শুনে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তারপর? তোর বাবা যখন ফিরবে, তখন? তখন কি হবে?

চাঁপা হেসে বললে, ভালই হবে। পিচাসটার সাজা হবে। ওর রক্তে চান ক'রে শুদ্ধ হয়ে বাড়ি আসব।

তোকে ছাড়বে তোর বাপ?

না। মরব। ম'রে জুড়োব।

তারপর?

তারপর আবার কি!

তারপর আবার কি? তাকে যে ফাঁসি যেতে হবে!

চাঁপা শিউরে উঠল, বললে, তবে? তবে কি হবে?

অনেকক্ষণ ভেবে জগন্নাথের স্ত্রী বললে, দাঁড়া। শেষ একবার দেখব।

তোরা দুই বোনে শম্ভুকে নিয়ে থাকতে পারবি তো? আমি একবার ঘুরে আসি।

কোথা যাবে?

যাব, ওই নবগেরামেই যাব। ডাক্তারের কাছেই যাব।

চাঁপাই ওই পুরানো ঢাকাই শাড়িখানা বার ক'রে দিয়ে বলেছিল, কাপড় ছেড়ে যাও, ওই কাপড়ে যায় না। হাজার হ'লেও বাবার তো একটা নাম আছে!

জগন্নাথের স্ত্রী এসে দীর্ঘ ঘোমটা টেনে ডাক্তারের খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে উঠানে দাঁড়াল। ডাক্তার তখন কিশোরের সঙ্গেই কথা বলছিলেন। ডাক্তার বিস্মিত হন নি, এমন ভাবে পুরুষ-অভিভাবকহীন সংসারের অনেক মেয়েছেলেই বিপদে প'ড়ে ডাক্তারকে ডাকতে আসে। কিশোরের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে ডাক্তার প্রশ্ন করলে, কে? কি বলছেন?

জগন্নাথেব স্ত্রী জীবনে কখনও কারও পায়ে ধ'রে মিনতি করে নি। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একবার তার ইচ্ছা হ'ল ছুটে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাও সে পারলে না।

ডাক্তাব আবাব প্রশ্ন করলেন, অকপট সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন, বলুন মা, কি হয়েছে? বাড়িতে অসুখ? কার অসুখ?

জগন্নাথের স্ত্রী ওই সহানুভূতির স্পর্শে বিগলিত হয়ে গেল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব'লে উঠল, আমার ছেলের।

পর-মুহূর্তে সে ডাক্তারের পায়ে আছড়ে প'ড়ে বললে, স্বামীর নাম ধরতে নাই, তবু আজ ধরছি বাবু, আমি জগন্নাথ সদ্দারের পরিবার। আমার ছেলের বুকে ঠাণ্ডা ব'সে সান্নিপাতিক জ্বর। স্বামী আমার ডাকাতি মকদ্দমায় জেলে আছে। আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরছে। আপনি তাকে বাঁচান বাবু।

ডাক্তার বললেন, বেশ তো, আমি যাব দেখতে।

আমি ভিজিট দিতে পারব না, ওষুধের দামও দিতে পারব না। দিতে হ'লে আমার বেধবা মেয়েকে বেচতে হবে বাবু, মহম্মদ শেখ কিনতে চেয়েছে। হয় তাই করতে হবে, নয়, আমার ছেলেকে যমকে দিতে হবে।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলেন। প্রথম মুহূর্তে একটা দ্বন্দ্ব জেগে উঠল মনে। প্রচলিত সমাজের চিন্তাধারা—নিষ্ঠুর নৃশংস জগন্নাথ ডাকাতের জেল হয়েছে, সে শাস্তি দিয়েছে রাজশক্তি; এ শাস্তি

দিচ্ছেন বোধ হয় বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করেন যে শক্তি সেই শক্তি। তা ছাড়া মনে হ'ল থানার সতর্ক দৃষ্টির কথা। এ কথা প্রকাশ পেলে থানার খাতায় তাঁর নাম লেখা হবে।

তরুণ কিশোর ব'লে উঠল, ওঠ তুমি, ওঠ। যাবেন ডাক্তারবাবু, নিশ্চয় যাবেন।

ডাক্তার হাসলেন। ইংরেজীতে বললেন, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার সমস্যার তুমি সমাধান ক'রে দিলে।

কেন?

পরে বলছি। তার আগে শোন মা; আমি যাব রাত্রে। বুঝেছ না? নিশ্চয় যাব।

ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন বাবা। আমার মত দুঃখিনীকে তিনি দয়া করেন না, কিন্তু আমাকে আপনি দয়া করবেন তার জন্যে তাঁকে আপনাকে দয়া করতে হবে। আর সদ্দার ফিরে এলে সে আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। আপনার পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁতে ক'রে সে কাঁটা বের ক'রে দেবে।

হেসে ডাক্তার বললেন, ভগবানের কথা ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও। যা ভাল বুঝবেন তিনি করবেন। তোমার স্বামী ফিরে এসে যা ভাল বুঝবে করবে। এখন গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দাও দেখি? সত্যি জবাব দেবে কিন্তু।

বলুন বাবু।

ছেলের অসুখ হয়েছে—আমি যাব, দেখব, ওষুধ দেব, কোন টাকাকড়ি লাগবে না। যথাসাধ্য করব। তবে বাঁচা-মরার কথা কেউ বলতে পারে না, সে তুমিও বোঝ। কিন্তু এতেই কি তোমার সব দুঃখ বিপদ অভাব যাবে?

জগন্নাথের স্ত্রীর মুখে বেদনার্ত হাসি ফুটে উঠল, সে বললে, তাই কি ঘোচে বাবু?

হ্যাঁ, তাই বলছি। খুলেই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি বললে, মহম্মদ শেখ তোমার বিধবা মেয়েকে কিনতে চেয়েছে। এখন ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'লেই কি তা আর করতে হবে না। তোমাদের এখন খাওয়া-পরা চলছে কি ক'রে?

একে একে ডাক্তার সকল সংবাদ সংগ্রহ ক'রে একটু ভেবে বললেন, তুমি বাড়ি চ'লে যাও। একটা ওষুধ এখন দিচ্ছি, নিয়ে যাও। রাত্রে আমরা

যাব, আমি আর এই বাবু। কিছু চাল, পারলে দু-একখানা কাপড় আমরা নিয়ে যাব।

জগন্নাথের স্ত্রী চ'লে গেল।

ডাক্তার কিশোরকে বললেন, কিশোর, এক মুহূর্তে সমস্যার যে সমাধান মনে জাগে, তাই হ'ল তাঁর নির্দেশ। আমাদের সমিতির নিয়ম ছিল গরিব ভদ্রলোকের সাহায্য করা। গণ্ডি ছিল এই গ্রামটি। আজ যখন তাঁর নির্দেশ এসেছে, তখন সে নিয়ম সংশোধন ক'রে ফেল। বুঝেছ না? কিছু চাল আর কাপড় যোগাড় করতে হবে।

আজকার এই যাত্রা সেই শেখেরপাড়ায় জগন্নাথের ছেলেকে দেখবার জন্য এবং তার স্ত্রীকে সাহায্য দেবার জন্য। শেখের পাড়ার প্রান্তদেশে এসেই তাঁরা থমকে দাঁড়ালেন।

শেখেরপাড়ার প্রান্তদেশে একটা বড় পুকুর।

পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সেখানে একটি স্ত্রীমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল। জগন্নাথের স্ত্রী। সে ডাক্তারবাবুদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

দশ

দিন কয়েক পর গোপীচন্দ্র কিশোরকে ডাকলেন। অনেক সন্ধান ক'রেও তিনি কিছু জানতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি। অবশেষে সেদিন অমরনাথ এবং পবিত্রকে বললেন, থিয়েটার পার্টি যখন করবে তখন সকলকে নিয়ে কর।

পবিত্রের সে উদারতা যথেষ্ট আছে। উদারতা তার স্বাভাবিক তো বটেই, তার উপর সে প্রায় সাধনা ক'রে সে উদারতাকে উদারতর মহিমায় উজ্জ্বল এবং প্রশস্ত ক'রে তুলে চলেছে। সে বললে, আমরা সকলকেই নেব। এখন তাড়াতাড়ি এই কজন মিলে নামাব।

কে—কে?

চন্দ্র জামাই, মঙ্গল, উরু, শূলপাণি—

কিশোর? কিশোরকে নাও নি? চমৎকার গলা, গান গেয়ে মন কেড়ে নেয়। সেদিন রাত্রে গাঁয়ের বাইরে কোথাও ব'সে গান গাইছিল, বন্দেমাতরম্ গান; শোন নি?

শুনেছি।

ওকে নাও নি?

আমি তো কয়েকবার ওকে বলেছি। কিন্তু থিয়েটার করবার ঝোঁক ওর নেই।

ঝোঁক নেই? কেন?

তা কি ক'রে বলব?—একটু মিষ্ট হাসি হাসলে পবিত্র।

এ বয়সে তো এ সবের ঝোঁক স্বাভাবিক। এই তোমার পিসীমাকে, মাকে বলছিলাম, সেকালে গ্রামে যাত্রার দল এসেছিল, আমার বয়স তখন অল্প। আমার চেহারা দেখে অধিকারীর আমাকে দলে নেবার জন্যে কি আগ্রহ। আমারও নেশা কম হয় নি। গোপীচন্দ্র হাসলেন। আমি তখন মাথায় ছোট, এমন লম্বা মানুষ হবার কোন লক্ষণই ছিল না। অধিকারী বললেন, তোমায় রাধা সাজাব। আমার মনে হ'ল, আমি স্বর্গে চ'লে গেলাম। সেই জরির কাপড়, মাথায় মুকুট, মুখে অলকা তিলকা, নাকে নোলক, গায়ে পুঁতির গয়না, আর সেই সব বক্তৃতা, সেই সব গান! ওঃ! যাত্রা হয়ে যেত, যাত্রা চ'লে যেত, দু-তিন দিন কান্না পেত, রাত্রে রাধাকে স্বপ্ন দেখতাম। সেই রাধা সাজব আমি! তা শেষ পর্যন্ত হ'ল না, কপালে রয়েছে কয়লা ঘেঁটে জীবন যাবে, রাধা সাজা ঘটবে কেন? মা আমার কিছুতেই যেতে দিলেন না।

কিছুক্ষণ হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, ডাক কিশোরকে ডাক। আমি বলছি তাকে।

কিশোর প্রণাম ক'রে কাছে বসল। এক কথাতেই জবাব দিয়ে দিলে। বললে, আমি এখন পড়ছি। এখন কি আমার থিয়েটার করা চলে?

কথাটা গোপীচন্দ্র ভুলেই গিয়েছিলেন। এ গ্রামের ছেলেদেব মধ্যে এক কিশোরই এণ্ট্রান্স পাস ক'রে কলেজে পড়ছে। পবিত্র পাস করতে পারে নি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, তাই তো! কথাটা আমার মনে ছিল না।

অমরবাবু বললেন, তাতে কি হয়েছে! তুমি কলেজের ছাত্র, নাটক তোমার পাঠ্য, তোমাকে শেক্সপীয়র পড়তে হবে, আরও বড় বড় নাট্যকারের নাটক পড়তে হবে। আর অভিনয় হ'ল একটা আর্ট। ওদের দেশে ইস্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত অভিনয় করে। কলেজে পড়ছ, তাতে কি হয়েছে?

কিশোর সবিনয়ে বললে, না। আমার নিজের ভাল লাগছে না, তা ছাড়া আমার বাবা কাকা—এঁরাও পছন্দ করবেন না।

থাক্ অমর। কিশোর ঠিক বলেছে। ও এখন ছাত্র, ভাল ক'রে পড়াশুনা করুক। তোমাকে এম. এ. পাস করতে হবে। খুব ভাল ক'রে পাস করতে হবে। নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করা চাই।

পবিত্র এবার বললে, বেশ তো, পার্ট না হয় নাই করলে, কিন্তু অন্য কাজও তো আছে। হারমোনিয়ম বাজাবে গানের সঙ্গে, প্রম্‌ট্ করবে—ওগুলো করতে আপত্তি কি ?

কিশোর হেসে ফেললে, ও ভাই পারব না। সাজলে রাজা রাণী সাজাই ভাল। তামাক সাজা ঠিক নয়। ওসবগুলো এক রকম তামাক সাজার পার্ট।

গোপীচন্দ্র বললেন, থাক্ পবিত্র, কিশোর ঠিক বলেছে। আমি কিন্তু খুব খুশি হয়েছি কিশোর। আচ্ছা, তুমি যাও। তোমরাও যাও, ব্যবস্থা যা করবার তুমি কর অমর। কীর্তিকে পবিত্রকে সঙ্গে নাও। আমাকে নিশ্চিন্ত কর।

বলে তিনি নিজেই উঠে পড়লেন। সর্বাগ্রে তিনিই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দার উপর দাঁড়ালেন। তাঁর নীল চোখ দুটি নিষ্পলক স্থির হয়ে উঠেছে। কিশোরকে তিনি বুঝতে পারেন নি। এই উনিশ-কুড়ি বছরের একটি ছেলে, তাকে তিনি বুঝতে পারলেন না ? তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, কই, সে তো লজ্জায় মুখ নামালে না ? কথা বলতে কণ্ঠস্বর কুণ্ঠায় একবারের জন্যও জড়িয়ে গেল না ? তিনি কি সেদিন রাত্রে ভুল দেখেছেন ? এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যে তবে সেই দীর্ঘাকৃতি তরুণ কে ? তারপর সে রাত্রের সেই গান ? সে গান যে কিশোরের কণ্ঠের গান, সে কথা তো পবিত্রও বললে। তবে ? দুটো কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? না। আপন মনেই তিনি ঘাড় নাড়লেন। না, তাঁর ভ্রম নয়।

কিশোর রাস্তার উপর নেমে চ'লে গেল।

গোপীচন্দ্র কয়েক মুহূর্ত পরেই নেমে পড়লেন রাস্তার উপর। দ্রুত দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে ডাকলেন, দাঁড়াও কিশোর, চল, আমিও যাব ওদিকে।

অমর এবং পবিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আসছি।

বিস্ময় জেগে উঠল দুজনের মুখে। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করতে সাহস করলে না। নিজেই গোপীচন্দ্র বললেন, আমি যাব একবার রাধাকান্তমামার ওখানে।

বাধ্য হয়ে কিশোরকে দাঁড়াতে হ'ল। গোপীচন্দ্র কিশোরের পাশে এসে মৃদু হেসে বললেন, চল।

কয়েক পা অগ্রসর হয়েই তিনি বললেন, কিশোর!

কণ্ঠস্বর শুনেই কিশোর চকিত হয়ে উঠল, মুহূর্তে বুঝতে পারলে গোপীচন্দ্র কি বলবেন। ক্ষণেকের জন্য তার বুকটা গুরগুর ক'রে উঠল, কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়ে তারপর বললে, বলুন।

তোমার কাছে সেদিন আমি হার মেনেছি।

কিশোর চুপ ক'রে রইল।

গোপীচন্দ্র বললেন, ভূতের ভয় প্রেতের ভয় আজও আমার নেই। সামনে পড়লে লড়াই করতে পারি-না-পারি, কথা বলতে পারি। প্রথম জীবনে আমার যে সাহস ছিল, সে সাহস তোমারও আজ নেই। কিন্তু বুড়ো হয়ে, অর্থ-সম্পদের মালিক হয়ে জীবনের ভয় হয়েছে। কোথায় কোন খোলায় পা কেটে যাবে, কি কোন প'ড়ো হাঁড়ির মধ্যে সাপ থাকবে—এই ভয়ে আর অর্জুনগাছটার গোড়া পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলাম না। ফিরে এলাম। তুমি আর তোমার সঙ্গে কে ছিল ঠিক চিনতে পারি নি, তোমরা দুজনে দিব্যি চ'লে গেলে ওগুলো মাড়িয়ে। সাপটার মুখের সামনে দিয়ে ছুটে চ'লে গেলে তাও দেখেছি। সেটাও আমি পারতাম না। জীবনের দাম হয়ে ভীতু হয়ে গিয়েছি।

একটু ম্লান হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপর বললেন, কিন্তু কেন? আমার সাড়া পেয়ে কেন তোমরা এমন ভাবে সাপের মুখ অগ্রাহ্য ক'রে পালালে, কেন তোমরা ওই প্রেতের আশ্রয়—ওই গাছটার তলায় গিয়ে লুকুলে?

কিশোর ভাবছিল, ভাবছিল মিথ্যা কথা ব'লে অস্বীকার করবে কি না? মন সায় দিচ্ছিল, আবার সাহসও হচ্ছিল না।

গোপীচন্দ্র বললেন, কিশোর!

আজ্ঞে।

আমার কথার উত্তর দাও।

কিশোর আবার চুপ ক'রে গেল।

আমি কি সাপের চেয়েও হিংস্থক, সাপের চেয়েও কি আমার বিষ বেশি? ওই যে অর্জুনগাছে যে কালপুরুষ আছে লোকে বলে, তার চেয়েও কি আমি বেশি ভয়ঙ্কর?

কিশোর তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, আপনি মহাপুরুষ। এ কথা কি কেউ ভাবতে পারে আপনার সম্বন্ধে?

তবে? তবে কেন এমন ভাবে আমাকে এড়াতে চাইলে?

কিশোর সংযত পরিষ্কার কণ্ঠে বললে, আমরা কোন অন্যায় কাজ করতে যাই নি।

গোপীচন্দ্র হাসলেন। বললেন, তুমি খুব চতুর কিশোর। এক কথাতে তুমি আমার মুখ চাপা দিতে চাচ্ছ। তুমি যা বললে কিশোর, সে কি আমি বুঝি নি? তা যদি না বুঝতাম, যদি ভাবতাম যৌবনকালের ধর্মে তুমি এখানকার আর পাঁচটা ছেলে যা করে, এই ধর না, আমার ছেলে পবিত্রের কথা—ওর অনেক গুণ, তবু সে সব দোষ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তোমার সম্পর্কে তাই যদি ভাবতে পারতাম, তবে তোমাকে ডেকে এ সব কথা জিজ্ঞাসা করব কেন? তোমরা যুবা হয়ে উঠেছ, যৌবনের দোষই যদি পেয়েই বসে, তবে সে নিয়ে দুঃখ করব মনে মনে, ডেকে জিজ্ঞাসা করব কোন্ মুখে?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, প্রথমটা এমন সন্দেহই হয়েছিল আমার। রাগ হ'ল তোমার উপর। এমন রাগ হ'ল যে, থাকতে পারলাম না, আলোটা হাতে নিয়ে তোমাকে ধরবার চেষ্টায় বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে, তোমরা অর্জুনগাছের আড়ালে লুকুলে। এগিয়ে যেতে না পেরে হার মেনে ফিরেই এলাম, মনে মনে দুঃখও করলাম অনেক যে, নবগ্রামের মাটিতে বোধ হয় বিষ আছে—হলাহল বিষ। শরীরে এ বিষ ঢুকলে কারও নিষ্কৃতি নাই। বাড়ি ফিরে এসে ওই কথাটাই ভাবছিলাম। এমন সময় তোমার গান কানে ঢুকল। অনেকটা দূরেই গাইছিলে, কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রি আর বাধাবিঘ্নহীন ফাঁকা মাঠ—আমার দোতলা পর্যন্ত অন্তত এসেছিল। প্রথমটা মনে হ'ল, উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস তোমার এত বেশি হয়েছে যে, কুৎসিত কাজ করতে গিয়েও এমন গলা ছেড়ে গান গাইতেও বাধছে না তোমার। কিন্তু গানের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্ শব্দ শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে যা ভেবেছিলাম এতক্ষণ, সব মিথ্যা ব'লে মনে হ'ল। এই গান—এ গান তো ব্যভিচারীর মুখ দিয়ে বেরুবে না। মাতাল তো কখনও দুধের বাটি মুখে তোলে না, ও বস্তু তো তার জিভে রোচে না, পেটেও সয় না। তবে? আমি কদিন ধ'রে ভেবেছি, কিন্তু কিছু অনুমান করতে পারি নি। লোক দিয়ে সন্ধান করবার চেষ্টা করেছি। সন্ধান যা পেয়েছি, তাতে আরও জটিল হয়ে উঠেছে সমস্ত ব্যাপারটা। তোমরা পশ্চিম দিক ধ'রে গিয়েছিলে, শেখের পাড়ার বড় মাঠটার চারিপাশের গাঁয়ের লোকে তোমার গান শুনেছে—এ খবর পেয়েছি, তার বেশি কোন কিছু জানতে পারি নি। আমি যে বুঝতে পারছি না আর না-বুঝে না-জেনেও নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। এই

এত রাত্রে এমন ভাবে কোন্ কাজে ওদিকে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? কি সে কাজ, যা আমার কাছে লুকোবার জন্যে সাপের মুখ দিয়ে ছুটে পালালে, ওই অর্জুনগাছটাব মত ভয়ের জায়গায় অনায়াসে গিয়ে লুকোলে? আমাকে যে জানতে হবে। বল, তুমি নির্ভয়ে বল, আমা থেকে কোনো অনিষ্ট হবে না তোমার, আর তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারবে না। এমন কি আমার দীক্ষাগুরু পর্যন্ত যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে তোমার অনুমতি না নিয়ে তাঁর কাছেও প্রকাশ করব না আমি।

কিশোর অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

গোপীচন্দ্র তাঁব দেহ ও রূপমহিমায়, জীবনেব কর্ম-সাফল্যের অসামান্যতায় তার কাছে বিবাট পুরুষ। এবং তাঁর জীবনসাধনায় তিনি শুধু সম্পদই অর্জন করেন নি, একটি মহৎ ব্যক্তিত্বও অর্জন করেছেন। সেই ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তার অভিভূত হয়ে পড়ারই কথা। তিনি যদি তাকে কড়া কথা বলতেন, শাসন করতেন, তা হ'লেও হয়তো কিশোর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। কিন্তু এত বড় ব্যক্তিটি এমন মিষ্ট ভাষায় সস্নেহে তাকে গ্রহণ করলেন যে, সে আর আত্মরক্ষা করতে পারলে না। বললে, আমরা গিয়েছিলাম শেখের পাড়াতেই। গিয়েছিলাম—

বল। আমি তো বলেছি—কোনও সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই।

জগন্নাথ সর্দারের পরিবারের খুব দুর্দশা হয়েছে, সে জেলে আছে—

ডাকাত জগন্নাথ?

হ্যাঁ।

মাটির দিকে তাকিয়ে কিশোর ব'লে গেল সব কথা। গোপীচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন, মুগ্ধ হয়ে গেলেন, একটা বিচিত্র অনুভূতিতে মন ভ'রে উঠল। তার মধ্যে বিস্ময় আছে, তার মধ্যে অকারণ একটা শঙ্কা আছে, গৌরব অনুভবের আনন্দ আছে, তাঁর নিজের সন্তান পবিত্র ও-কাজে অগ্রণী হয় নি তার জন্য বেদনা আছে, আরও যেন কিছু আছে।

কথা শেষ ক'রে কিশোর মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। গোপীচন্দ্র যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন। তিনি ভাবছিলেন, নবগ্রাম তো তাঁর অজানা নয়, এখানকার মাটিকে তিনি জানেন, নবগ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে স্বর্ণের পুষ্করিণীর নীচে এক স্তর মাটি আছে, যার রঙ গাঢ় লাল, সে মাটি পুকুর কাটবার সময় দক্ষিণ পাড়ের ঠিক মাঝখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, লোকে সেই মাটিতে দেওয়াল লেপন করে। তিনি জানেন, দক্ষিণে রাধাকান্তের বাগানের মধ্যে মাটি আছে, যে মাটির মধ্যে মানভূম-সাঁওতালপরগনার মাটির আমেজ।

তিনি জানেন, পূর্বদিকে মহাপীঠের পাশে মাটি আছে, যে মাটির রঙ কালো, যার মধ্যে অপরিসীম উর্বরতা। তিনি জানেন, ওখানে ছিল একদা কোন নদীগর্ভ, যে নদী আজ ম'জে গিয়েছে, যার খানিকটা অংশ আজও পঙ্কিল জলাশয়ের মত মাঠের মধ্যে জেগে রয়েছে। তিনি নবগ্রামের মানুষকে জানেন, এখানকার মানুষের জীবনধারাকে জানেন; যে প্রবাহের জলের পলিমাটির দাগ এখানকার সকল মানুষের গায়ে লেগে রয়েছে, যার দাগ তার সন্তানদের গায়েও লেগেছে নবগ্রামের বাইরে, বৃহৎ পৃথিবীর জীবনধারায় স্নান করিয়েও তাদের অঙ্গ থেকে সে মালিন্য ওঠে নি। সবই তিনি জানেন। কিন্তু এ যে তাঁর সকল কল্পনাকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে। কোথা থেকে পেলে এমন জীবনধারার সন্ধান এই ছেলেটি! ভগীরথের মত শাঁখ বাজিয়ে কল্লোলমুখর ধারাকে সে নবগ্রামে আনতে পারে নি, কিন্তু জীবনভৃঙ্গার পরিপূর্ণ ক'রে নিয়ে এসেছে, তাতে তো সন্দেহ নেই। স্তব্ধ হয়ে তিনি ভাবছিলেন।

কিশোর বললে, আমি যাই।

না।

কিশোর এবার অস্বস্তি অনুভব করলে। আবার কি?

ওই ডাক্তারকে নিয়ে আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। কেমন?

বলব তাঁকে।

না। তুমি বিকেলবেলা আমার কাছে আসবে। আমরা একসঙ্গে যাব ডাক্তারের কাছে।

কেন? আমরা কি অন্যায় করেছি?

হাসলেন গোপীচন্দ্র। বলব, তখন বলব।

ফিরলেন তিনি। ফিরেই দেখলেন, তাঁর চাকর দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দূরে তাঁর বৈঠকখানার বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে অনেক লোক জ'মে রয়েছে। কীর্তিচন্দ্র পায়চারি করছে। গোপীচন্দ্র এখান থেকেই দেখতে পেলেন কীর্তির কপালে সারি সারি কুঞ্চনরেখা দেখা দিয়েছে।

বৈকালে নিজেই গোপীচন্দ্র কিশোরদের বাড়ির দুয়ারে এসে গাড়ি নিয়ে দাঁড়ালেন। কিশোরের অভিভাবকেরা অবাক হয়ে গেল। লক্ষপতি গোপীচন্দ্রের সঙ্গে গ্রামের জমিদারবংশোদ্ভূত স্বর্ণবাবু, সরকারপাড়ার বংশলোচন, এমন কি রাধাকান্তেরও প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা আছে, গ্রামের অ-জমিদার মধ্যবিত্তদের সঙ্গে নাই। বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় গোপীচন্দ্রের প্রভুত্ব-

প্রতিষ্ঠা। তার কারণ তারা নিজেরা প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী নয়, তারা যোগ্যতম ব্যক্তিকেই গ্রামের প্রধান হিসাবে চায়,—গোপীচন্দ্র নিঃসন্দেহে যোগ্যতম ব্যক্তি। উনিশ শো ছয়-সাত সালের গ্রাম্য মধ্যবিত্তদের দৃষ্টিতে গোপীচন্দ্রের সুগৌর মসৃণ প্রসন্ন ললাটে চাঁদের আভাস দেখতে পায় তারা। সেই হেতু তাদের কাছে তিনি নবগ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য এবং এখানকার অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্য দেবতা-প্রেরিত ব্যক্তি। আরও একটি কারণ সম্ভবত আছে। প্রতিষ্ঠাবান সমাজপতিদের সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অদৃশ্য দ্বন্দ্ব আছে; মানব-সমাজের এই ফল্গুর মত প্রবহমান দ্বন্দ্ব চিরন্তন সত্য। ভাঙা-গড়ার মধ্যে এই শক্তিই সম্ভবত প্রধানতম শক্তি। সেই দিক দিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান গোপীচন্দ্র নিজের কর্মবলে সম্পদ এবং ব্যক্তিত্ব অর্জন ক'রে প্রাচীন প্রধানদের পরাজয় ঘটিয়ে প্রভুত্ব এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করলে তাদের গোপনতম অন্তর প্রসন্নতায় ভ'রে উঠবে—এটা স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে গোপীচন্দ্র তাদের গোপন মানসের প্রতিভূ। তাই তিনি তাঁদের সত্যকারের প্রিয়জন। এই কারণেই কিশোরের বাড়ির প্রত্যেকে যেমন হ'ল বিস্মিত, তেমনই হ'ল আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

কর্তাবাবু নিজে এসেছেন গাড়ি নিয়ে! কি ভাগ্যি কিশোরের, কি ভাগ্যি আমাদের!

কিশোর কিন্তু স্তিমিত হয়ে আছে। সকাল থেকেই সে চুপ ক'রে ব'সে ভেবেছে। প্রথমটায় তার মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কর্তাবাবুর মত মানুষ তার সঙ্গে যে সস্নেহ অন্তরঙ্গতার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাতে সে বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে তার বিগলিত চিত্ত কেমন যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার হিমানী-প্রবাহের স্পর্শ পেয়ে জ'মে কঠিন হয়ে গিয়েছে। সে ঠিক এই নবগ্রামের সাধারণ মানুষ নয়। সে কলকাতায় পড়তে গিয়ে নূতন মানুষ হয়ে উঠেছে। এই নূতন মানুষদের কাছে ধনী জমিদার—এরা সাধারণ মানুষদের ঠিক আপন জন নয়। এরা যেন একটা আলাদা জাত। এদের ভয় না করলেও বিশ্বাস করতে সে পারে না। সে বেরিয়ে আসতেই গোপীচন্দ্র তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোচম্যানকে বললেন, চল্, ডাক্তারবাবুর বাড়ি।

ডাক্তার সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। কিশোরই খবরটা দিয়ে এসেছিল। ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ভেবে হেসে বলেছেন, ভাল, আসুন তিনি, দেখি।

আরও খানিকটা ভেবে আবার বলেছিলেন, মনে হচ্ছে ভালই হবে। আরও খানিকটা ভেবে বার কয়েক ঘাড় নেড়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, ভালই হবে। বুঝেছ না কিশোরচন্দর, ভালই হবে।

গোপীচন্দ্র ডাক্তারের বাড়িতে এসে স্মিতহাস্যে ডাক্তারকে অভিনন্দিত ক'রে বললেন, তোমাদের দলে আমাকে ভর্তি ক'রে নাও ডাক্তার। আধ মণ পঁচিশ সের চাল ঘাড়ে নিয়ে দু-চার ক্রোশ হাঁটবার ক্ষমতা আমার আজও আছে। হেসে উঠলেন তিনি।

ডাক্তার তাঁকে নমস্কার ক'রে হেসে বললেন, আমাদের কিন্তু আরও অনেক বেশি ওজনের বোঝা বইবার লোকের প্রয়োজন।

আরও বেশি? না ডাক্তার। এ বয়সে সে শক্তি আর নাই।

আছে। অপার শক্তি আছে ব'লেই বিনয় ক'রে ওটা বলছেন।

থাকলে নিশ্চয়ই বইব। বল, কি বইতে হবে?

মানুষের দুঃখের বোঝা। দুঃখী মানুষের সেবা করবার জন্যেই আমরা কজনে মিলে একটু-আধটু চেষ্টা করি; কিন্তু শক্তি আমাদের নেই, আমরা পারি না। আপনার মত লোকেরই প্রয়োজন। ভগবান আমাদের ডাক শুনেছেন, তিনি আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর আমাদের ভাবনা কি?

গোপীচন্দ্র হেসে বললেন, যে চিন্তামণি চিনি যুগিয়ে থাকেন তিনি আমাদের গাঁয়ের মুদী চিন্তামণি নন। আমিও ওই মুদীর মত নামে শুধু দুঃখহরণ ডাক্তার, আসল দুঃখহরণ ছাড়া দুঃখের বোঝা বইবার শক্তি পৃথিবীর কারুর নাই। আমাকে পেয়ে ভাবনা চ'লে গেল—এ ধারণা ক'রো না।

ডাক্তার হার মানলেন না। বললেন, কথাটা না-মেনে উপায় নাই। আসল চিন্তামণি—আসল দুঃখহরণের কথা তুললে আর কথা থাকে না। তবে কি জানেন কর্তাবাবু, চিন্তামণি মুদী যদি ইচ্ছে করে তবে যেটুকু চিনি ওজনে মারে সেটুকুও সে যোগাতে পারে, আর দুঃখহরণ যদি না বাঁচাতে চায় তবে আধ মণ পঁচিশ সের দুঃখের বোঝার জায়গায় এক মণ দেড় মণ দিব্যি বইতে পারে। আপনি তো নামেই শুধু দুঃখহরণ নন, কাজেও দুঃখহরণ। এইচ. ই. ইস্কুল করছেন –

আরও করব ডাক্তার, আরও করব। গোপীচন্দ্র থাকতে পারলেন না, ডাক্তারের কথার মধ্যস্থলেই ব'লে উঠলেন, আরও করব। বোর্ডিং করব। চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্‌সারি করব। টোল করব। গার্লস ইস্কুল করব।

এই তো—এই তো—এই তো হ'ল কর্তাবাবু। বোঝার পর বোঝা ঘাড়ে ক'রে তুলে চলেছেন, এর্ পরেও কি বলবেন, আপনি শুধু নামেই

দুঃখহরণ? আমাদের নবজীবন সমিতি লোকের যে দুঃখ-কষ্টের পোঁটলা-পুঁটলি জড়ো করেছে, কি আরও দু-চার আঁটি যোগাড় করবে—তা আপনার ঘাড়ের বোঝার ওপর ফালতু আঁটির মত বইতে পারবেন না?

হেসে গোপীচন্দ্র বললেন, পারলে পিছিয়ে যাব না। কিন্তু কি নাম বললে তোমাদের সমিতির।

নবজীবন সমিতি।

নবজীবন সমিতি। বাঃ, বড় ভাল নাম ডাক্তার। নবজীবন! বাঃ!

সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন গোপীচন্দ্র নবজীবন সমিতির ছোট্ট ঘরখানি দেখে। ডাক্তারের বাড়ির খ'ড়ো বারান্দার একটা কোণ ঘিরে ছোট্ট একখানি ঘর—এক দিকে তিন হাত, অন্য দিকে চার হাত কি পাঁচ হাত। তেমনই ছোট দরজা। এক দিকে ততোধিক ছোট একটি জানলা—চওড়ায় এক হাতেরও কম, লম্বায় হাত দেড়েক।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন,—দেওয়ালের গায়ে মোটা হরফে লেখা একখানা কাগজ চার কোণে পেরেক দিয়ে আঁটা রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে—মুচী মেথর চণ্ডাল তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

আর একটা কাগজে লেখা রয়েছে—বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির জন্য বীর রাজপুত জাতির অধঃপতন হইয়াছে। বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত ছিন্নভিন্ন, তাহাদের অধঃপতন দেখিয়া কি মনে হয় না যে, ইহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে? আইস, আমরা ইহার প্রতিবিধান করি। রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিক কুলীন শ্রোত্রীয় বংশজ বিভেদ তুলিয়া দিই—গাঁই গোত্র মেলের বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া এক হইয়া যাই। আজ হইতে আমরা রাঢ়ী বারেন্দ্র নই, আমরা কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান—সেই পরিচয়ে কান্যকুব্জব্রাহ্মণ। বাংলা দেশে বাস করি, সেই হিসাবে আমাদের পরিচয় বঙ্গমেল। পঞ্চগোত্র আমাদের পরিচয়, গাঁই তুলিয়া দিলাম। দীক্ষা একমাত্র ব্রহ্মদীক্ষা। শাক্ত বৈষ্ণব শৈব দীক্ষা বর্জন করিলাম। আমরা গঠন করিলাম, শপথ করিয়া নবজীবনে গঠন করিতেছি—সনাতন ব্রাহ্মণ সমাজ। আমরা শৈব নই, আমরা শাক্ত নই, বৈষ্ণব নই—আমরা ব্রাহ্মণ।

ডাক্তার!

আজ্ঞে?

কিছু মনে করবে না তো? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বলুন?

কিছু মনে করবে না তো ?

সে কি ? মনে করব কেন ?

তোমাদের কি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ?

না—না—না। ওই তো আমরা স্পষ্ট লিখে রেখেছি—আমরা ব্রাহ্মণ। আমাদের প্রত্যেক সভ্যকে শিখা রাখতে হবে, ত্রিসন্ধ্যা করতে হবে, কেউ মাদক দ্রব্য স্পর্শ করতে পারবে না, কোন অখাদ্য খেতে পারবে না।

তবে মুচী মেথর চণ্ডাল তোমার ভাই হবে কি ক'রে ?

হবে। সে যখন আমার ভাই হবে, তখন তাকে আমি পবিত্র ক'রে নোব। আমরা হব অগ্নির মত। ঘৃত বলুন, আবর্জনা বলুন, অমৃত বলুন, বিষ বলুন, যা আসবে তাই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করব, তখন আর ঘৃত আবর্জনা অমৃত বিষ এ ভেদ থাকবে না—কারণ সে হবে অগ্নি।

এ সব কি তুমি ভেবে ঠিক করেছ ডাক্তার ? এ সব তোমার কথা ?

মুচী মেথর চণ্ডাল তোমার রক্ত, তোমার ভাই—ও হ'ল স্বামী বিবেকানন্দের কথা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ? শুনেছি তাঁর কথা।

আর, সনাতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়ার কথাটা আমার বটে। আমি অনেক ভেবেছি কর্তাবাবু। জানেন—ভুক্তভোগী ভিন্ন ভাবতে পারে না, দুঃখটা বুঝতে পারে না। আমি ভুক্তভোগী। ডাক্তারী পাস করলাম, তবু চক্রবর্তী উপাধি—বংশজের সন্তান ব'লে আমাকে কেউ বিয়ে দিতে চাইলে না। রাধাকান্তবাবু আমার গোত্র ধ'রে মুখুজ্জে উপাধি দিয়ে কুলীন ব'লে চালালেন আমাকে। তিনি নিজে বললেন, সেই কথায় বিশ্বাস ক'রে আমার শ্বশুর আমাকে কন্যাদান করেছেন। নইলে—

হাসলেন ডাক্তার। বললেন, সবই তো জানেন। কিন্তু আমার মনের কথা জানেন না। কর্তাবাবু, বিয়ের পর আমি আর শ্বশুরবাড়ি যাই নি। তাঁরা এখনও জানেন না যে, আমি কুলীন নই। কিন্তু আমার নিজের মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। আমার স্ত্রীর বড় ভগ্নীকে আমার শ্বশুর এক বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি বিধবা। মধ্যে মধ্যে আমার এখানে আসেন। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কখনও কখনও উন্মাদ হয়ে যান। সেই অবস্থায় কতবার বলেছেন—ঘর থেকে চ'লে যাবেন, বোষ্টম হয়ে যাবেন, মালাচন্দন করবেন। কখন বলেন, না হয় পাদরীদের কাছে যাব—কৃশ্চান হব। বলতে সে সব লজ্জা হয়। মনের দুঃখে লজ্জায় অনেক ভেবেছি, শাস্ত্র-টাস্ত্রও পড়েছি। ভেবেচিন্তে এই ঠিক করেছি। এ না-হ'লে আর পথ

নেই। গ্রামের ছোকরাদের দেখি, বখাটে মুখ্যু। কুলীনের ছেলে, জমিদারের ছেলে কি ভাইপো—ষোল বছর পার না-হতে বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েদের দেখি, যুবতী সুন্দরী গুণবতী মেয়ে বুড়োর হাতে পড়েছে, আটটা দশটা সতীন, বাপের বাড়িতে দাসী-বাঁদীর মত কাল কাটাচ্ছে। আপনি নিশ্চয় জানেন—আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তি জানেন না, এ আমি বিশ্বাস করি না—কত ভ্রূণহত্যা যে হয় তার হিসেব নেই।

গোপীচন্দ্র বললেন, ঠিক বলেছ ডাক্তার, ঠিক বলেছ।

সেই জন্য ভেবে আমি এই ঠিক কবেছি। বুয়েছেন না? এ ছাড়া পথ নেই। আমরা সব উল্টে-পাল্টে সনাতন ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়ব। যারা ব্রাহ্মণের ধর্ম পালন করবে না, তাদের পতিত করব। আমাদের নবজীবন সমিতির এই হ'ল প্রধান কাজ। এ কথা এখনও আমরা দুজন—কিশোর আর আমি—ছাড়া কেউ জানে না। রাধাকান্তবাবুর উদারতা আছে, আমার উপকার করেছেন অনেক, তাঁকেও আজও বলি নি। তবে ওঁর স্ত্রী জানেন কিছু কিছু। মেয়েটি আশ্চর্য মেয়ে। আজ আপনাকে দেখালাম।

গোপীচন্দ্র বললেন, এ নিয়ে তুমি বড় ক'রে কাজ আরম্ভ কর ডাক্তার। আমাকে দিয়ে যা হবে তাই আমি করব। তোমার দল বাড়িয়ে তোল, গ্রামের ছেলেদের নাও। কিশোর, যাও তো বাবা, আমার গাড়ি নিয়ে পবিত্রকে আর অমরকে নিয়ে এস। বল, আমি ডাকছি। কিংবা চল না ডাক্তার, আমার সঙ্গে ইস্কুলের ওদিকে চল না। ওখানে ওদের পাব, ফাঁকা জায়গায় ব'সে কথাবার্তাও হবে।

গোপীচন্দ্র অস্ফুট একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ডাক্তারের বারান্দা-ঘেরা ঘরের ছোট দরজায় দীর্ঘাকৃতি গোপীচন্দ্রের মাথায় আঘাত লেগেছে। ডাক্তার অপ্রতিভ হলেন।—কেটে গেল? দেখি দেখি!

না—না। চল, কিছু হয় নি। একটু লেগেছে, অপ্রস্তুত অবস্থা কি না! হাসলেন গোপীচন্দ্র।

ডাক্তার বললেন, একেই আমাদের দেশের দরজা ছোট করবার রেওয়াজ, তার উপব বারান্দা-ঘেরা ঘর। ঘর এবার পালটাব। বড় ক'রে আন্দোলন করতে হ'লে ঘর পালটাতেই হবে।

গোপীচন্দ্র বললেন, নবজীবন সমিতির ঘর পালটালেও দরজার মাপটা যেন কখনও বড় ক'রো না ডাক্তার। ওই মাপটাই বজায় রেখো। সভ্যেরা বিনয় শিখবে। উদ্ধত হয়ে মাথা উঁচু ক'রে যারা চলে, তারা দরজার ভয়েই

আপনা থেকেই ঢুকতে ভয় পাবে। এই ব্যাপারটি তোমার একটি সত্যকারের শিক্ষা ডাক্তার।

কিশোর সমস্ত ক্ষণটা স্তব্ধ হয়ে দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গোপীচন্দ্র এবং ডাক্তার কথাবার্তার মধ্যে এমনই মগ্ন ছিলেন যে, কিশোরের স্তব্ধতা লক্ষ্য করেন নি। এমন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার কথাও নয়; তাঁদের কথাবার্তার সময়ে কিশোরের বয়সের যুবকের সম্ভ্রমভরে চুপ ক'রে থাকারই কথা।

ডাক্তার এবং গোপীচন্দ্র দুজনেই বেরিয়ে এসে গাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন। কিশোর বেরিয়ে এল ঘর থেকে, নামল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললে, ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার পিছন ফিরে তাকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, আরে এস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

গোপীচন্দ্র দৃষ্টি দিয়ে আহ্বান করলেন।

কিশোর বললে, আপনারা কথাবার্তা বলুন গিয়ে। ওর মধ্যে আমি থেকে কি করব? আমি বরং একবার শেখের পাড়া ঘুরে আসি। জগন্নাথের স্ত্রী আজ তিন দিন আসে নি, কোন খবরও পাই নি।

গোপীচন্দ্র বললেন, ভাল কথা ডাক্তার, তোমাদের বোঝার ওই পোঁটলাটাই আমি প্রথম ঘাড়ে নিলাম। জগন্নাথের মেয়ে-ছেলের ভার আমার উপর রইল। শেখের পাড়া আমার জমিদারি। আমি গমস্তাকে লিখে দিচ্ছি, ওদের খাবার ধানটা সে মাসে মাসে দেবে আমার ওখানকার কাছারি থেকে। ওর ছেলে তো একটু ভাল আছে?

হ্যাঁ। সে জন্যে ভাববেন না। ও ভারটা আমার। আপনার ধান আছে আপনি ধান দেবেন; আমার ওষুধ আছে ওটার ভার আমার রইল। কিশোর, তা হ'লে আর ওখানে আজ গিয়ে কাজ নেই। কালই একেবারে ওঁর চিঠিপত্র নিয়ে আমরা দুজনে যাব।

কিশোর বললে, না। আমি আজ একবার ঘুরে আসি। আমার মন যেন কেমন বলছে। হয়তো খারাপ কিছু হয়েছে।

কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার এবং গোপীচন্দ্র দুজনেই বিস্মিত হলেন। স্তব্ধ শান্ত কিশোরকে প্রথমটায় যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, কিন্তু এই কয়েকটা কথা বলতে বলতেই কিশোরের মুখ গভীর কোন বেদনায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

বিচিত্র বস্তু বেদনা, যে মানুষকে সে স্পর্শ দেয়, মুহূর্তে সে মানুষ চ'লে যায় নাগালের বাইরে। তাকে ছুঁতে গিয়ে মানুষ সসঙ্কোচে পিছিয়ে আসে। বোধ করি, লক্ষ্মণ সীতার চারি পাশে যে গণ্ডী টেনেছিলেন সে গণ্ডী ছিল বেদনার গণ্ডী; সীতা যতক্ষণ রামের ভাবনায় বেদনায় সমাহিত হয়ে বসেছিলেন, ততক্ষণ রাবণের মত দুর্ধর্ষ শক্তিশালীও তাঁকে স্পর্শ করতে সঙ্কোচ বোধ করেছিল; ছদ্মবেশী তপস্বীর কথাবার্তায় যে মুহূর্তে এই বেদনার সমাধি থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন, তখনই রাবণ তাঁকে অপহরণ করবার মত মানসিক দুর্ধর্ষতাকে সচেতন করতে পেরেছিল। কিশোরও যেন আজ কোন বেদনায় প্রায় সমাহিত হয়ে যেতে চলেছে। উদাস বিষণ্ণতা ফুটেছে তার দৃষ্টিতে, তার মুখে, তার সর্ব অবয়বে।

ডাক্তার গোপীচন্দ্র প্রবল উৎসাহে উৎসাহিত তখন। তবুও কিশোরকে তাঁরা স্পর্শ করতে পারলেন না। সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। ডাক্তার মৃদুস্বরে শুধু একবার বললেন, যাবে? তা যাও।

গোপীচন্দ্র বললেন, আমি একজন লোক দিই সঙ্গে, কেমন?

শান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বললে, না, দরকার হবে না।

সে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলে।

তার যেন কান্না পাচ্ছে। কেন, সে তা জানে না।

পথের মধ্যে একটা গাছতলায় ব'সে সে বহুক্ষণ ভাবলে। তবু কোন কিনারা পেলে না সে। শুধু একটা অভিপ্রায় ধীরে ধীরে মনের মধ্যে বীজ ফেটে অঙ্কুরের মত মাথা তুলছে; নবজীবন সমিতির কাজ আর সে করবে না। ভাল লাগছে না।

জগন্নাথের ছেলে ভালই আছে। কিশোরের মন যা বলেছিল সেটা মিথ্যে হয়েছে। জগন্নাথের স্ত্রী তার সামনে ব'সে হাত জোড় ক'রে বললে, আপুনি আমার আর-জন্মে বাপ ছিলেন বাবা।

এতক্ষণে কিশোর হাসলে, বললে, আর ডাক্তারবাবু? জ্যাঠামশায়, না, কে?

জগন্নাথের বউও হাসলে, বললে, দুজনাই বাবা ছিলেন, বাবা।

কিশোর বললে, তা হ'লে আর রক্ষে থাকবে না সর্দার-বউ, আরও আরও জন্মের বাবার খোঁজ মিলবে। এবার থেকে তোমাদের জমিদার—আমাদের গোপীচন্দ্রবাবু তোমাদের ভার নিয়েছেন। কাল বরাত আসবে গমস্তার কাছে। মাসে মাসে এখানকার কাছারির ধানের গোলা থেকে তোমাদের খোরাকির ধান দেবার হুকুম হয়েছে।

চমকে উঠল জগন্নাথের বউ—জমিদারবাবু খোরাকির ধান দেবেন ?

হ্যাঁ।

ক্যানে বাবা ? তার চেয়ে—

তার চেয়ে কি ?

মাটির উপর নখের আঁচড় কাটতে কাটতে সর্দার-বউ বললে, তার চেয়ে আপনারা যা পারতেন দিতেন, আমরা খেটে খুটে বাকিটা ওজগার করতাম। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, ওনারা মাশায় বড়নোক। বড়নোকের—

উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে সামনের দিকে। ঠিক যেন কুলকিনারা পাচ্ছে না। হাঁটুর উপরে হাত ছুখানি ঝুলতে লাগল, যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কিশোর একটু বিস্মিত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে চিন্তিত হয়ে উঠল; প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে তাতে ? বড়লোক, তাতে কি হয়েছে ?

আজ্ঞে ?—নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে।

বড়লোক তো কি হয়েছে ?

বড়নোকের দেনা মাশায়—

দেনা কোথায় ? আমরা তোমাদের চাল দিচ্ছিলাম পাঁচজনের কাছে ছু সের পাঁচ সের ক'রে চাঁদা নিয়ে। উনি একা সেইটা দেবেন, শোধ দিতে হবে না—ধার-দেনা নয়, বুঝেছ !

বুঝেছি মাশায়।

বুঝেও কিন্তু সর্দার-বউয়ের বিষণ্ণতা কাটল না। তেমনই ভাবেই ব'সে রইল। কিন্তু কিশোরের বিষণ্ণতা কেটে গেল। সে অকারণে যেমন বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তেমনই ভাবেই অকস্মাৎ আনন্দচঞ্চল না হ'লেও প্রসন্ন হয়ে উঠল। অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়াল, যেন দেহের অবসন্নতা ঝেড়ে ফেলে দিলে; বললে, আজ আমি চললাম সর্দার-বউ।

যাবেন ?

হ্যাঁ। আমি ডাক্তারবাবুকে বলব।

কি বলবেন ?

বলব, বাবুদের ধান নিতে সর্দার-বউয়ের ইচ্ছে নাই।

আজ্ঞে না। তা বলবেন না বাবা।

কেন ? ভয় করছিস ?

তা, ভয় বটে বইকি। জমিদার বড়নোক, রাগ করলে যে বিপদ হবে বাবা। তা ছাড়া—

কি, তা ছাড়া?

তা ছাড়া, খেয়ে বাঁচতে হবে তো বাবা, নোব, তাই নোব। বাবুর জয়-জয়কার হোক, বাড়বাড়ন্ত হোক। রাজা—মহারাজা হবেন বাবু। নোব, তাই নোব বাবা।

কিশোর এবার একটু হাসলে।

সে ফিরল। দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে সে হাঁটতে শুরু করলে, একটা অতি প্রয়োজনীয় কাজ তাকে যেন টানছে।

*   *   *   *

এখানে ইস্কুল-ডাঙায় বিচিত্র আসর বসেছিল তখন।

ডাক্তারকে নিয়ে গোপীচন্দ্র এসে দেখলেন, অমরচন্দ্র এবং পবিত্র নবগঠিত থিয়েটার পার্টির সভ্যদের নিয়ে ব'সে গিয়েছেন। গ্রামের তরুণ ছেলেদের প্রায় সকলেই এসেছে। থিয়েটারের পার্ট দেওয়ার আলোচনা চলছে। গোপীচন্দ্র আসতেই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। গোপীচন্দ্র বললেন, ব'স, ব'স, সব ব'স।

পবিত্র বললে, আমরা সব ওদিকে গিয়ে বসি। থিয়েটারের কথা হচ্ছে, আপনাদের কাজের ব্যাঘাত হবে।

ব'স ব'স। তোমাদেব সকলকেই দরকার আমার। আমরাও একটি দল গড়েছি! বুঝেছ? তোমাদের থিয়েটারের দলের সঙ্গে আমরা যোগ দেব, আমাদের দলের সঙ্গে তোমাদের যোগ দিতে হবে!

দল! গোপীচন্দ্র দল গড়েছেন! অবাক হয়ে গেল সকলে।

বিস্মিত হলেন না শুধু অমরচন্দ্র। তিনি ইস্কুলের ভিত্তি স্থাপনের আয়োজনের পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন এক দিকে ব'সে। ইতিমধ্যেই তিনি নিমন্ত্রণ-পত্রের খসড়া ক'রে ফেলেছেন। নিমন্ত্রণের তালিকা তৈরি করেছেন। এখন তৈরি করছিলেন কর্ম্মসূচী। তিনি চোখ তুলে একবার গোপীচন্দ্রের দিকে চাইলেন, তারপর আবার কাজে মন দিলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, অমর, তুমিও একটু শোন।

লিখতে লিখতেই অমরচন্দ্র বললেন, বলুন, আমি শুনছি।

লেখা রাখতে হবে একটু। আমাদের ডাক্তার একটি সমিতি করেছে—নবজীবন সমিতি। আমি তার একজন সভ্য হয়েছি। আমার ভারি ভাল লেগেছে। অবাক হয়ে গিয়েছি আমি। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ—বঙ্গমেল। এ যদি আমরা ক'রে উঠতে পারি, তবে কত উপকার যে হবে আমাদের, কত উন্নতি যে হবে! বল, ডাক্তার বল।

ডাক্তার মুখর হয়ে উঠল। বলতে শুরু করলে তার কল্পনার কথা।

অমরচন্দ্র কাগজগুলি গুছিয়ে কলম রেখে চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বসলেন।

দীর্ঘক্ষণ ধ'রে ডাক্তার ব'লে গেলেন তাঁর কথা। তারপর বললেন, নবজীবন সমিতির আজ মহা সৌভাগ্য, আপনাকে পেয়েছি।

অমরচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখে চোখে উৎসাহের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন, গ'ড়ে তুলুন ডাক্তারবাবু। আজই একটা এক্‌জিকিউটিভ কমিটী তৈরি ক'রে ফেলুন। তিনি আবার চেয়ার সরিয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। বলুন, প্রেসিডেণ্ট কে হবেন?

ডাক্তার বললেন, শ্রীযুক্ত বাবু গোপীচন্দ্র—

না ডাক্তার। আমি থাকব একজন সভ্য—সেবক একজন।

ডাক্তার বললেন, সেবক আমরা সকলেই। প্রেসিডেণ্ট আপনাকে হতে হবে। আগে যিনি চলবেন, যাঁর হাতে থাকবে আমাদের দলের ধ্বজা, তিনি ছোটখাটো মানুষটি হ'লে তো চলবে না; সব চেয়ে মাথায় উঁচু যিনি, সব চেয়ে শক্তি যাঁর বেশি, তাঁকেই নিতে হবে সে ভার। তবে তো ধ্বজা উঠবে উঁচুতে, চারি পাশের দূর-দূরান্তর থেকে দেখতে পাবে সে ধ্বজা। দেখবে আর ভাববে, এত উঁচুতে উড়ছে, কাঁপছে না, টলছে না—কিসের ধ্বজা ওটি? তারপর তারা এগিয়ে আসবে। কাছে আসবে। লিখুন অমরবাবু, প্রেসিডেণ্ট—শ্রীযুক্ত বাবু গোপীচন্দ্র দেবশর্মা। উপাধি আমাদের দেবশর্মা। রাঢ়ী না, বারেন্দ্র না, বৈদিক না, আমরা কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ; ফুলে না, খড়দা না, বিদ্যাধরী না, আমাদের এক মেল—বঙ্গমেল, উপাধি এক—দেবশর্মা। বাস্।

অমরচন্দ্র বললেন, বলুন, তারপর বলুন। সহকারী সভাপতি কে, নাম বলুন?

লিখুন—শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেবশর্মা, তারপর লিখুন শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দেবশর্মা। লিখে গেলেন অমরচন্দ্র।

নিজের নাম লিখতে এতটুকু আপত্তি করলেন না।

ঠিক এই সময়ে ফিরে এল কিশোর।

এসে নীরবে পিছনে এক জায়গায় বসল। গোপীচন্দ্র তার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন—সস্নেহ মিষ্ট হাসি।

সমস্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার উঠলেন।

অমরচন্দ্র বললেন, এর জন্যে একদিন একটা সভা ডাকুন। শুধু এ গ্রাম নয়, পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজকে ডাকুন।

ডাক্তার বললেন, ডাকব। তার আগে আমাদের নিজেদের শক্ত হয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। বুঝেছেন না? হ্যাঁ, ঠিক, এই কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণ বঙ্গমেল—এই ব'লে আমরা যদি দু-একটা বিয়ে দিতে পারি, বুঝেছেন না, ধরুন কর্তাবাবুর বাড়ির কোন ছেলের, কি মেয়ের এই ব'লে যদি বিয়ে হয়, তবে না সেটা নিয়ে সাড়া উঠবে দেশে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, আর যদি সভা করতেই হয়, বুঝেছেন না, তবে আপনার ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন লেয়িংয়ের সময় সভা ডাকুন; পঞ্চগ্রাম কেন, গোটা জেলার বড় বড় লোক আসবেন।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

কিশোর পিছন থেকে ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

কিশোর! কখন এলে তুমি?

এসেছি কিছুক্ষণ আগে।

কোথায় ছিলে?

এখানেই ছিলাম, পিছনে ব'সে ছিলাম।

ও। আমি দেখতে পাই নি।

হেসে কিশোর বললে, অত্যন্ত মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, খেয়াল করবার অবকাশ ছিল না।

হ্যাঁ। বুঝেছ না কিশোর, ওই আমার একটা ডিফেক্ট। যখন যা নিয়ে পড়ি তখন তাতেই, কি বলে, একেবারে ডুবে যাই। ভাল না ওটা। বুঝেছ না—গল্প আছে না, দাবা খেলছিল দুজনে, একজন লোক এসে খবর দিলে, খেলোয়াড়দের একজনের স্ত্রীকে সাপে কামড়েছে, তাতে খেলোয়াড় জিজ্ঞাসা করলে—কাদের সাপ? এও প্রায় তাই তো। বুঝেছ না, একটু তফাত। আমাদের মেডিকেল ইস্কুলের দারোয়ান বলত—জেরাসে ফরক।

হেসে উঠলেন ডাক্তার। তারপর বললেন, ওখানকার খবর কি? জগন্নাথনন্দন কেমন আছে?

ভাল আছে।

গুড। সেরে যাবে।

আমি একটা কথা বলছিলাম।

বল।

আমি কাল ভোরেই কলকাতা চ'লে যাচ্ছি।

কাল ভোরে কলকাতা চ'লে যাচ্ছ? হঠাৎ? ছুটি রয়েছে এখনও—

থাক্। আমাকে যেতেই হবে।

কেন? এই তো এসেছ সবে। এরই মধ্যে—

জিজ্ঞাসা করবেন না। আমি কালই যাব। আমার কাছে যে টাকা-পয়সা আছে সমিতির, সেগুলো নিয়ে নেবেন চলুন। না হ'লে আপনাকে না ব'লেই আমি চ'লে যেতাম।

কিন্তু সমিতির এই এমন একটা সুসময়, এই তো গড়বার স্বর্ণ সুযোগ, বুয়েছ না, সুবর্ণ সুযোগ। দেখ না, কি করি দেখ না! ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন স্টোন লেয়িংয়ের সময় সভা করব। চোখ দুটিকে ছোট ক'রে যেন দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত ক'রে দিলে ডাক্তার, ডান হাত মুঠি বেঁধে উপরে তুলে গভীরস্বরে বললে, ইট উইঃ বি এ গ্রেট মুভমেন্ট।

কিশোর হাসলে। ডাক্তার গ্রাহ্যই করলে না, বললে, এ সময় তুমি না থাকলে কি ক'রে চলবে?

চলবে। আমাকে যেতেই হবে।

* * * *

আর একজনের কাছে বিদায় নিতে হবে—কাশীর দিদির কাছে।

কিশোর এসে দাঁড়াল রাধাকান্তের বাড়ির উঠানে।—রাঙাদি! কেউ সাড়া দিলে না। বাড়ির নীচেটা যেন জনশূন্য। একটু বিস্মিত হ'ল কিশোর। এখন রাত্রি সবে আটটা। রাধাকান্ত এখন বৈঠকখানায়। তাঁর মজলিস রাত্রি এগারোটার আগে কোন দিন ভাঙে না। বাড়িতে রাঙাদিদির মজলিস বসে। পাড়ার মেয়েরা আসে তাঁর কাছে গল্প শুনতে অথবা বই-পড়া শুনতে। হঠাৎ কি হ'ল?

আবার সে ডাকলে, রাঙাদি!

একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে ওদিকের অন্ধকার বারান্দার ভিতর থেকে সামনের থামের পাশে দাঁড়াল।

কে মেয়েটি? রাধাকান্তদার বাড়িতে ঝি আছে, সে প্রৌঢ়া; রাঁধুনী আছে একটি মেয়ে, সেও প্রৌঢ়া। এ মেয়েটি যুবতী। এ কে?

মৃদুস্বরে মেয়েটি বললে, মা উপরে আছেন, বাবার মাথা ধরেছে সন্ধ্যে থেকেই, শুয়েছেন—

ও। কিশোর ফিরল। রাধাকান্তবাবুর অসুখ, এখন কাশীর দিদিকে ডাকা ঠিক হবে না, ডাকলে তিনি আসতে পারবেন না।

বাবু!—মেয়েটি ডাকলে।

আমাকে বলছ?—কিশোর চমকে ফিরে দাঁড়াল।

হ্যাঁ।

আমাকে? তুমি কে?

আমি ষোড়শী, বাবু।

ষোড়শী! কিশোরের মনে প'ড়ে গেল। সেই সদ্‌গোপ মেয়েটি, যাকে সে একরকম উদ্ধার ক'রে এনেছে এই গ্রামের জন কয়েক ভদ্রসন্তানের লালসার গ্রাস থেকে, এনে কাশীর দিদির কাছে রেখে গিয়েছে—মনেই ছিল না তার কথা।

বল, কি বলছ? আমি তোমাকে চিনতে পারি নি।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বললে, আমি যে আর এখানে থাকতে পারছি না বাবু।

কেন? কি হ'ল?—বিস্মিত হ'ল কিশোর।

আমার জন্যে এ বাড়ির মাকে বাবুকে যে গালাগাল করছে তারা।

কারা? ভূপতি অমূল্য—এরা?

হ্যাঁ।

রাধাকান্তদাদাকে গালাগাল করছে? অবাক হয়ে গেল কিশোর।

আমি খিড়কির ঘাটে নামি, ওরা খিড়কির পুকুরের ও-পাড়ে তালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি স্নান করতে যাই—। স্তব্ধ হয়ে গেল ষোড়শী।

তাই তো!

আজ সন্ধ্যেবেলা এ বাড়ির বাবার সঙ্গে রাস্তায় ভূপতিবাবুর দেখা হয়েছিল। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিল ভূপতিবাবু—

দেখা হওয়া মাত্র ভূপতি পরমভক্তিভরে রাধাকান্তকে প্রণাম করেছিল—কে? মামা? পেনাম! পেনাম!

তার অবস্থা দেখে রাধাকান্ত স্বল্প কথায় উত্তর দিয়ে নিজের বৈঠকখানায় উঠবার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। হ্যাঁ, আমি। বাড়ি যাচ্ছ?

ভূপতিও নিজের বাড়ির দিকে অর্থাৎ স্বর্ণবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে খানিকটা গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে গালাগালি শুরু করেছিল, হ্যাঁ, শালা শূয়ারকি বাচ্চা, বাড়ি যাচ্ছি! শালা নচ্ছার, বাড়িতে খানকী পুষে রেখেছ শালা, আমার ধাম্মিক যুধিষ্ঠির শালা।

রাধাকান্ত কানে আঙুল দিয়ে বৈঠকখানায় চ'লে গিয়েছিলেন, শোনবারও অভিপ্রায় ছিল না, অবসরও ছিল না। বৈঠকখানায় দারোগা এসে ব'সে ছিলেন তাঁর অপেক্ষায়। নিত্য সকাল দুপুর সন্ধ্যায় তিনি তাঁর স্বর্গত পিতার পাদুকা তাঁর নিত্যব্যবহার্য শেষ চটিজোড়াটিকে প্রণাম করেন। দুপুরে চন্দন

এবং ফুল দিয়ে পূজা করেন। আজ সন্ধ্যায় তিনি প্রণাম ক'রে উঠেই দেখলেন, চাকর বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছে। সে খবর দিলে যে, দারোগা এসেছেন, জরুরী কাজ আছে। তিনি বাড়ি থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আসছিলেন, পথে ঘটনাটা ঘ'টে গেল। ভূপতির চীৎকার শুনে দারোগা এবং আরও কজন ভদ্রলোক ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাধাকান্তের সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম ক'রে উঠেছিল প্রথমটা, পর-মুহূর্তেই আত্মসম্বরণ ক'রে কানে আঙুল দিয়ে তিনি বললেন, চলুন, ভিতরে চলুন।

ষোড়শী বললে, দারোগাবাবু চলে যাবার পরই বাবু এসে বাড়ি ঢুকলেন। বললেন—কাশীর বউ, উপরে একটা প্রদীপ জ্বেলে দাও তো, আমি শোব। বড় মাথা ধরেছে। আর ঠাণ্ডা জল এক ঘটি দাও, মাথাটা ধুয়ে ফেলব। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। সেই এসে শুয়েছেন। আমার জন্যে যখন এই লাঞ্ছনা এঁদের, তখন আমি এখানে কি ক'রে থাকব বাবু?

কিশোর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, আচ্ছা যা ব্যবস্থা হয় করছি আমি।

কি ব্যবস্থা করবেন।

বিরক্ত হ'ল কিশোর।—জানতে পারবে। আজ রাত্রেই এসে ব'লে যাব আমি।

বেরিয়ে গেল কিশোর। আবার ফিরে গেল সে ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বাড়ি ছিলেন না। ছিলেন থানায়। ডাক্তারের বাড়ির সামনেই থানা, থানায় ব'সে তিনি দারোগাবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। নবজীবন সমিতির কথা বলছিলেন দারোগাকে। ডাক্তার আজ যেন ঢাক ঢোল পিটিয়ে নবজীবন সমিতির কথা না বললে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। এতদিন সঙ্গোপনে এ কাজ করার মধ্যে তাঁর মনে যেন ক্ষোভ ছিল, অতৃপ্তি ছিল ; সেই ক্ষোভ সেই অতৃপ্তি আজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খি-খি-খি-খি শব্দে ভেসে চলেছিল। যেন অবরুদ্ধ একটা জলস্রোত অকস্মাৎ পথ মুক্ত পেয়ে বেরিয়েই চলেছে। কিশোর ডাক্তারের বারান্দায় ব'সেই রইল অপেক্ষা ক'রে।

অত্যন্ত অকস্মাৎ যেন ডাক্তারের হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন। রাস্তার এ পারে ডাক্তারের বারান্দায় ব'সে কিশোর সেটা যেন অনুভব করলে। ডাক্তার ঝুঁকে পড়েছেন টেবিলের উপর। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার উঠলেন ক্লান্ত মানুষের মত। অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে তিনি

ফিরলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন তিনি। রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন মাথা নীচু ক'রে।

কিশোর ডাকলে, ডাক্তারবাবু!

ধীরে ধীরে মাথা তুললেন ডাক্তার, অন্ধকারের মধ্যে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? কোথায় বাড়ি?

আমি আবার ফিরে এলাম ডাক্তারবাবু। আমি কিশোর।

কিশোর! ভালই হয়েছে। খবর শুনেছ?

কি?

বলছি। রাধাকান্তবাবুর বৈঠকখানার সামনে দিয়েই তো এলে? আলো জ্বলছে? আছেন তিনি বৈঠকখানায়?

না। তিনি আজ সন্ধ্যেবেলাই শুয়ে পড়েছেন। মাথা ধরেছে তাঁর।

হুঁ।

আমি তাঁর বাড়ি থেকেই আসছি।

কিশোর ব'লে গেল সব কথা। বললে, মেয়েটি ওখানে থাকতে চাচ্ছে না। বলছে, আমার জন্যে এ অপমান ওঁরা সহ্য করবেন, আর আমি থাকব কি ক'রে?

কিন্তু যাবে কোথায়?

আপনি বরং গোপীকান্তবাবুকে ব'লে ওঁর বাড়িতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা ক'রে দিন। উনি যখন নবজীবন সমিতির প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন তখন এটা কর্তব্যও বটে ওঁর, আর সে কর্তব্য উনি খুশি হয়েই করবেন। তা ছাড়া ওঁর বাড়িতে কাজেরও অভাব নেই—একটা কেন, দশজন অনাথকে ঠাঁই দিতে পারেন উনি।

হুঁ। কিন্তু—

কিন্তু কি?

আগে রাধাকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

কেন? তাঁকে আর এ নিয়ে বিরক্ত করা কেন?

প্রয়োজন আছে। রাধাকান্তবাবুর মাথা ধরেছে বললে না! সেটা ভূপতির গালাগালির জন্যে রাগেই শুধু নয়। আরও আছে। আজকের মত অপমান বোধ হয় রাধাকান্তবাবুর জীবনে কোনদিন হয় নি। সেই জন্যেই তাঁর খবর তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এক কড়া হুকুম পাঠিয়েছেন রাধাকান্তকে, গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। দারোগা সন্ধ্যেবেলা সেই হুকুমই জারি ক'রে এসেছেন রাধাকান্তবাবুর উপর।

ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

হ্যাঁ, হাত জোড় ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। দারোগা দেখালেন সে চিঠি আমাকে। সত্যি সত্যি লেখা আছে—উইথ ফোল্‌ডেড হ্যাণ্ডস।

কেন? কি অপরাধ হ'ল তাঁর? আর এ রকম হুকুম ম্যাজিস্ট্রেট দেবেনই বা কোন্ আইনে?

ম্যাজিস্ট্রেটের কথাই আইন, রাজপ্রতিনিধি তিনি। মহিষাসুর যদি সেকালের দৈত্যপতি না হয়ে একালের ম্যাজিস্ট্রেট হ'ত কিশোর, তবে দুর্গা-প্রতিমার চেহারাই অন্য রকম হ'ত। দেখতে মা-দুর্গা দশ হাত জোড় ক'রে আছেন, আর তাতে পাঁচ জোড়া হাতকড়ি পবানো রয়েছে।—তিক্ত হাসি হাসলেন ডাক্তার।

কিন্তু অপরাধটা কি?

অপরাধ, তিনি নিজের বাগানের গোলাপ গাছটা কেটে ফেলেছেন। গাছটার ফুল তিনি নিজেও তুলতেন না, কাউকে তুলতেও দিতেন না। পূজোর জন্যও না। সেই ফুল গোপীবাবু ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য—

কিশোর বললে, জানি। ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে আমার খুড়তুতো ভাইয়ের জন্য। কাটা গোলাপের ডাল নিয়ে রাধাকান্তদার ছেলে গৌরীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গৌরীর হাত ছ'ড়ে গিয়েছে গোলাপের কাঁটায়। রাধাকান্ত-দার মজলিসে কীর্তিবাবু ছিলেন তখন। গৌরীই কথাটা ব'লে ফেলেছিল।

ডাক্তার বললেন, সেই ঘটনা কোনক্রমে সাহেবের কানে পৌঁছেছে। তিনি ধ'রে নিয়েছেন গোপীকান্তবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্যটাই এর মূল কারণ। তাঁর ধারণা, তিনি যদি রাধাকান্তবাবুর ওখানে যেতেন, তবে রাধাকান্ত নিজেই ফুল তুলে তাঁকে দিতেন এবং গাছ কাটার কল্পনাও তাঁর মনে উঠত না। সুতরাং—

চুপ ক'রে গেলেন ডাক্তার।

কিশোরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, আপনি রাধাকান্তদাকে বলুন তিনি যেন ক্ষমা না চান।

ডাক্তার বললেন, আগে একটা মিটমাটের চেষ্টা করব আমি।

মিটমাট! মিটমাট হবে?

হবে বইকি। চল, তোমাদের পাড়ায় যাব আমি। গোপীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

গোপীচন্দ্রবাবুর দরজায় এসে কিশোর বললে, ওই মেয়েটির জন্যেও বলবেন। ভুলে যাবেন না।

ভুলব না, বলব।

কিশোর চ'লে এল।

আর তার মনে কোন দ্বিধা নাই। নবজীবন সমিতির সঙ্গে সম্বন্ধ তার চুকে গেল। একটু হাসলে সে। ধনী গোপীচন্দ্র গভর্মেন্টেব কাঠামোর স্তম্ভে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। তাঁকে আঘাত করলে, তাঁকে অপমান করলে গভর্মেণ্ট বিচলিত হয়ে উঠছে। ডাক্তারবাবু নবজীবন সমিতিকে ওই স্তম্ভের পাদমূলে শুইয়ে দিয়ে নিশ্চিত হলেন। কিন্তু—

সে এসে আবার উঠল রাধাকান্তের বাড়ি।

কাশীব বউ নীচে নেমে এসেছেন। দুধ গরম করছেন।

রাঙাদি!

কিশোর? তুমি আর একবাব এসেছিলে?

এসেছিলাম।

কিছু বলছিলে?

বলছিলাম।

বল।

আমি শেষরাত্রেই কলকাতা চ'লে যাচ্ছি।

এখন হঠাৎ?

অনেক কথা। আপনার আজ সময় হবে না আমি জানি। দাদার মাথা ধরেছে।

হ্যাঁ।—ক্ষোভে ধারালো হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। উনানের আগুনের লাল আভা পড়েছে তাঁর গৌরবর্ণ মুখে, চোখে তার প্রতিচ্ছটা জ্বলছে। হ্যাঁ, তাঁর মাথা ধরেছে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে কিশোর বললে, আমি সব শুনেছি রাঙাদি।

হ্যাঁ, ষোড়শী বলছিল আমাকে, সে এখানে থাকতে চাচ্ছে না।

শুধু ভূপতির কথাই নয় রাঙাদি, দারোগা এসেছিলেন তিনি যা ব'লে গেছেন সে কথাও আমি শুনেছি।

কাশীর বউ মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন, কে, বললে তোমাকে?

ডাক্তারবাবু। দারোগা তাঁকে বলেছেন।

কাশীর বউ কোন কথা বললেন না।

আপনি দাদাকে বারণ করুন রাঙাদি, তিনি যেন কিছুতেই ক্ষমা না চান।

কাশীর বউ আবার মুখ তুলে কিশোরের দিকে চেয়ে হাসলেন। কয়েক

মুহূর্তের মধ্যেই সে হাসি মিলিয়ে গেল। বিচিত্র রূপান্তর ঘ'টে গেল, তাঁর চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠল,—মুখের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি পেশী কাঠিন্যে কঠোর হয়ে উঠল। বললেন, বলেছিলাম। কিন্তু—। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, তাঁর সে সাহস নাই, শক্তি নাই। তবে—

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, এটা দেনা হয়ে থাকল আমাদের। ওঁর যা দেনা, সে আমারও দেনা। এ দেনা আমার গৌরীকান্ত শোধ করবে।

কাশীর বউ উঠে চ'লে গেলেন।

এগারো

রাধাকান্ত ক্ষমা প্রার্থনাই করলেন। একটু অভিনব ধরনে ক্ষমা চাইলেন তিনি। একেবারে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার অন্যায় হয়েছে, গোলাপের গাছটা কেটে আপনাকেই অসম্মান করেছি আমি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

গোপীচন্দ্রবাবু স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারলেন না। গোপীচন্দ্রের মজলিসে আরও অনেক লোক ছিল, সকলেই মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইল। দারোগা সকালেই এসেছিলেন রাধাকান্তের কাছে,—সাহেবের কাছে রাধাকান্তের উত্তর জানাতে হবে। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই রাধাকান্ত গোপীচন্দ্রের বৈঠকখানায় এসে বললেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

গোপীচন্দ্র প্রথমটায় চমকে উঠলেন।

গত রাত্রে ডাক্তার এসে তাঁকে ঘটনাটা জানিয়েছিল। তিনি সত্যই কিছু জানতেন না। কিন্তু অনুমান ক'রে নিতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হ'ল না। এ কাজ কীর্তি করেছে। বার বার তিনি নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কীর্তি শোনে নাই। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। তাঁর মত সক্ষম কীর্তিমানের এক্ষেত্রে ক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু গোপীচন্দ্র জীবনে ক্রোধকে সংবরণ করতে শিখেছেন এবং কীর্তিকে তিনি ভয় করেন। ভয় না ক'রে উপায় নাই। তাঁর শক্তি আছে, কীর্তি তাঁর শক্তির তুলনায় সামান্য জীব; কিন্তু পুত্রস্নেহে তিনি দুর্বল। তার উপর কীর্তিই আজ তাঁর বিরাট

ব্যবসায় পরিচালনায় ডান হাত, সুতরাং শক্তি থাকতেও তাঁকে চুপ ক'রে থাকতে হয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ডাক্তারকে বললেন, বিশ্বাস কর ডাক্তার, এর কিছুই আমি জানি না। সাহেবকে আমি এ কথা জানাই নি।

কীর্তিচন্দ্র নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘরে প্রবেশ করলে, গোপীচন্দ্রের পাশের ঘরেই সে থাকে, সে সব শুনতে পেয়েছে ; কীর্তিচন্দ্র ঘরে ঢুকে বললে, আমি জানিয়েছি।

গোপীচন্দ্র তার মুখের দিকে চাইলেন। কীর্তিচন্দ্র বললেন, এতে নিশ্চয়ই আমাদের অপমান হয়েছে। গাছটা কেটে তিনি মহাধার্মিক সাজবার চেষ্টা করেছেন, বিধর্মী রাজার বিধর্মী কর্মচারীকে ফুল দিতে বাধ্য হয়েছেন ; লোকে ভাবছে, ওঃ রাধাকান্ত কি ধার্মিক, দেখ কি মনের তেজ ! ম্যাজিস্ট্রেট হোক আর যাই হোক, তাকে সে পূজা করবে না। আর আপনার নাম ক'রে বলবে—অমুক বাবুর যতই টাকা থাক্, যতই বড়লোক হোন, যতই দেবপ্রতিষ্ঠা করুন, সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে পুজো করেছেন। বিধর্মীকে যে পুজো করে, সে আবার ধার্মিক হয় ? ঠিক করেছি আমি। এই কথাই আমি সাহেবকে লিখেছিলাম। লিখেছিলাম—আপনার জন্যই আমাকে আজ গ্রামের সমাজের কাছে এইভাবে অপমানিত হতে হয়েছে। আপনাকে এ অপমান স্পর্শ করবে না, কিন্তু আমার অবস্থা আপনাকে ভেবে দেখতে প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং প্রতিকার করবার জন্য হুজুরের কাছে আরজি পেশ করছি।

গোপীচন্দ্র শুধু বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে নিষেধ করেছিলাম।

কীর্তিচন্দ্র অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে ব'লে উঠল, এ আপনার অন্যায় নিষেধ, মানতে গেলে কোন কালে এ গ্রামে আপনি সম্মান পাবেন না। চুনোপুঁটিতে বড় মাছের গায়ে ঠুকরে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তাকে মেরে ফেলে শেষ পর্যন্ত, বড় মাছকে সেই জন্যে চুনোপুঁটি ধ'রে খেতে হয়।

তুমি এখন যাও কীর্তি। যাই বল তুমি, কাজটা ভাল কর নি।

আমি ঠিক করেছি। এই ক'রেই এরা সব মাথায় চ'ড়ে বসেছে। আমি এদের প্রত্যেককে সায়েস্তা করব। কাউকে আমি ছেড়ে কথা কইব না।

তুমি এখন যাও কীর্তি। আমার কথা শুনতে পেয়েছ ?

যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কোন রকম আপস ক'রে ভদ্রতা দেখাতে যাবেন না। তা হ'লে আমি ঘর থেকে চ'লে যাব।

কীর্তি বেরিয়ে চ'লে গেল।

ডাক্তার এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন কীর্তিচন্দ্রের কথা। তিনি শুধু স্তম্ভিত হয়েই যান নি, কীর্তিচন্দ্রের এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তিনি ভয়ে যেন পঙ্গুও হয়ে গিয়েছিলেন। লক্ষপতি ধনীর পুত্র কীর্তিচন্দ্রের ও আস্ফালন শূন্যগর্ভ পাত্রের ধ্বনি নয়।

গোপীচন্দ্র বললেন, তুমি রাধাকান্তমামাকে ব'লো ডাক্তার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, কি বলব ?

গোপীচন্দ্র বলতে চেয়েছিলেন, ব'লো—আমার লজ্জার সীমা নাই, কীর্তি আমাকে না জানিয়েই কাজটা ক'রে ফেলেছে, ছেলেমানুষ, ওদের এখন রক্ত গরম; ক'রে ফেলেছে অভিমানের বশে। ক'রে এখন তারও লজ্জার সীমা নাই।

কিন্তু সে কথা তিনি বললেন না, বলতে পারলেন না। তিনি চ'লে যাবেন। বয়স অনেক হয়েছে। সামনের বড় আয়নাতে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব ভাসছে; সুগৌর ললাট দিনে দিনে শুভ্র থেকে শুভ্রতর হয়ে উঠছে, মাথার সাদা চুলগুলি মৃদু বাতাসে উড়ছে।

তাঁর অবর্তমানে কীর্তি থাকবে। আজ সকলের বিদ্বেষ, সকলের ক্রোধ তিনি বহন ক'রে নিয়ে যাবেন। কীর্তির শত্রু তিনি কি বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেন? তাই কথাটা মুখে এনেও উচ্চারণ করতে পারলেন না। থেমে গেলেন। ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ব'লো—যা হয়ে গেছে তার জন্যে তিনি যেন কিছু মনে না করেন। সে সময়ে বড় দুঃখ বড় অভিমান হয়েছিল। ব্যাপারটা সাহেবকে জানানো হয়ে গেছে। এখন নিজেই লজ্জা পাচ্ছি। সাহেব দারোগাকে হুকুম করেছেন—নিজে দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখে তাঁকে জানাতে, নইলে এইখানেই শেষ ক'রে দেওয়া যেত ব্যাপারটা। তা একবার আমার এখানে এলেই হবে, পায়ের ধুলো দেবেন, তাতেই হবে।

ডাক্তার রাধাকান্তের কাছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু এ প্রশ্ন তিনি তুলতেই পারেন নি। রাধাকান্ত স্তব্ধ হয়ে শুয়েই ছিলেন। কথাও খুব কমই বলেছিলেন। ডাক্তার আসতেই বলেছিলেন, এস ভাই। শরীর খুব খারাপ।

কি হয়েছে ?

হয় নি কিছুই। শরীর খারাপ কথাটা হয়তো ভুল বলেছি। আত্মা অসুস্থ।

ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে ভাবলেন কিছুক্ষণ। কি ব'লে কথাটা

তুলবেন ? কিন্তু কোন সূত্রই যেন হাতড়ে পেলেন না। কিছুক্ষণ পর শুধু বললেন, হাতটা একবার দেখি !

দরকার নেই। দেহে কোনও রোগ নেই।

ডাক্তার এবার বললেন, নবজীবন সমিতি নিয়ে আজ—

বাধা দিয়ে রাধাকান্ত বললেন, আজ থাক্ ভাই।

তবুও ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। আবার বললেন, মানে—মানে—আজ গোপীচন্দ্রবাবু—

ভাল লাগছে না ভাই ডাক্তার।

আচ্ছা, তা হ'লে আজ উঠি।

এস। রাধাকান্ত পাশ ফিরে শুলেন।

কিছুক্ষণ পর কাশীর বউ এসে বসলেন পাশে, বললেন, আমার একটা কথা। তুমি যদি ক্ষমাই চাও, যদি 'না' বলবার সাহস তোমার না-ই থাকে—

না, নাই সে সাহস আমার। আত্মহত্যাও হয়তো করতে পারব, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম।—তিনি হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়লেন। সে সাহস তাঁর নাই। সন্ধ্যা থেকে তিনি বহু চেষ্টা করেছেন। মনে কোনমতেই সাহস পান নি। ইংরেজ রাজশক্তিকে তাঁর দুরন্ত ভয়। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁর মামার বাড়ি। সাঁওতাল-হাঙ্গামার ঢেউ সে গ্রাম পর্যন্ত এসেছিল। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে সেই গ্রামে। তিরিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে সংঘটিত এই বিদ্রোহ দমনের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে সেই গল্প শুনেছেন তিনি। ঘনজঙ্গল-ভরা ক্ষুদ্র গ্রাম—রেড়ির তেলের প্রদীপের স্বল্প আলোতে তাঁর মাতামহী সেই গল্প বলতেন। মুখে সিঁদুর মেখে রক্তমাখা টাঙি হাতে সাঁওতালেরা মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে নরহত্যা করেছিল, গ্রাম জ্বালিয়েছিল; কিন্তু তাদের দমন করবার জন্য ইংরেজদের ফৌজ যে অত্যাচার করেছিল, সে অত্যাচার গ্রামের নিরীহ নরনারী কল্পনাও করতে পারে না।

দিদিমা বলতেন, ভাই, গুলি খেয়ে সাঁওতালেরা মরল, ভেসে গেল ময়ূরাক্ষীর বানে। তারপর গড়ের বাজনা বাজিয়ে তালে তালে পা ফেলে এল গোরা পল্টন। লাল লাল মুখ, কটা চোখ, এই পোশাক পেন্টুলন কোট জুতো—একসঙ্গে খট খট ক'রে পা ফেলে ময়ূরাক্ষী পেরিয়ে গাঁয়ে এসে ঢুকল। ঘোড়ার উপর চ'ড়ে তাদের কাপ্তেন। সাঁওতালদের মত কালো যাকে দেখলে, দুম ক'রে গুলি ক'রে দিলে। ঘোষালদের কত্তা কালো

ছিলেন, চান ক'রে ঠাকুরদের নাম করতে করতে বাড়ি ফিরছিলেন, গলায় পৈতে ধবধব করছে, তাঁকে মেরে দিলে ভাই, বুকে গুলি বিঁধল, পিঠের দিকে —গোটা পিঠ ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গোটা বাগদীপাড়া তো একেবারে মেরে নি-মানুষ ক'রে দিলে। তারপর হুকুম দিলে, লিয়ে আও গাঁয়ের মাতব্বর লোককো। ঘাড়ে ধ'রে ঘর থেকে বার করলে, তারপর বন্দুকের ডগায় লাগাল খোঁচা, উঁচিয়ে হাঁকিড়ে উঠল—চল্ শালালোক। ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সব গেল। কাপ্তেন বললে, সাঁওতাললোক কাঁহা থাকে, দেখলাও। জোড় হাত ক'রে সব বললে, হুজুর, জঙ্গলে থাকে, কোথা পালাল। ভাই, কথা শেষ করতে দিলে না, বললে, লাগাও কোড়া। ভাই, গাছে বেঁধে উলঙ্গ ক'রে দিলে। হরিহরপুরের গোসাঁই-বাড়ির গোসাঁই ছিলেন এ অঞ্চলের ঠাকুরদেবতার মত মানুষ। সাঁওতালেরা তাঁকে ভক্তি করত। সেই অপরাধে গোসাঁইকে গুলি করলে। গোসাঁইয়ের একটি বিধবা কন্যে, তাকে ভাই—

দিদিমা বলতে পারতেন না, ঝরঝর ক'রে কাঁদতেন, আঁচলে চোখ মুছতেন।—আমার বাড়ি হরিহরপুর, সে আমার সই ছিল। অত্যাচারে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাকল রক্তচন্দন-মাখা পদ্মফুলের মত। কারও সাহস হ'ল না—মুখে জল দেয়, ঘরে তুলে এনে সেবা করে। পরের দিন সকালে লোকে দেখলে, সই আমার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। এত বড় গোসাঁই-ঘরের কন্যে এই অপমানের পরে, এই পাপের বোঝা ঘাড়ে চাপানোর পরে সে বাঁচবে কি ক'রে ?

সাঁওতালদের মেয়ের কাপড় কেড়ে নিয়ে ন্যাংটা ক'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে এল সব। তারপর—

শিউরে উঠতেন দিদিমা, রেড়ির তেলের প্রদীপের শিখার মৃদু এবং স্বল্পায়তন আলোর মতনটির বাইরে অন্ধকারের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন, প্রদীপের আলো পড়ত সেই বিস্ফারিত চোখে। রাধাকান্ত দেখেছেন সে ভয়ার্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি। বুকের মধ্যে সে দৃষ্টি যেন পাহাড়ের গুহার মধ্যে আদিম কালের শিল্পীর হাতের খোদাই করা ভয়াল এক মূর্তির মত খোদিত হয়ে গিয়েছে। তারপর রাধাকান্ত বয়সের সঙ্গে বহু বিচিত্র পরিবর্তিত আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে চ'লে এসেছেন, কিন্তু ওই ভয়াল মূর্তি অনাবিষ্কৃত পর্বতগুহার মধ্যে তেমনই অক্ষয় হয়ে রয়েছে। রাজসরকারের সঙ্গে বিরোধিতার কল্পনা মনে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ওই ভয়াল মূর্তি যেন সেই অনাবিষ্কৃত গুহা থেকে মুখ বাড়ায়; মুহূর্তে রাধাকান্ত পঙ্গু হয়ে যান। শুধু রাধাকান্তই নন,

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রতিটি মানুষেরই ছিল এমনই ভয়। রাধাকান্ত শত চেষ্টা ক'রেও ম্যাজিস্ট্রেটের এই হুকুমকে অমান্য করবার সাহস পান নি। একবার ভেবেছিলেন, গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা না-চেয়ে চ'লে যাবেন সদর শহরে, একজন উকিলকে সঙ্গে নিয়ে সাহেবের কাছে গিয়ে বলবেন, অপরাধ হয়ে থাকলে আমায় অন্য যে দণ্ড দেবেন দিন, শুধু এই দণ্ড থেকে অব্যাহতি চাই আমি হুজুরের কাছে। কিন্তু পরে সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির করেছেন, নাঃ, ভাগ্যফল অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হোক। এ তো শুধু আমার অদৃষ্টফল নয়, এ আমার এই জীবনের কর্মফল।

কাশীর বউ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্বামীর হতাশা দেখে।

রাধাকান্ত বললেন, তুমি হয়তো আমাকে মনে মনে ঘেন্না করবে।

এ কি বলছ তুমি ?

তুমি শহরের মেয়ে, তোমার মনের সাহস, তোমার তেজ তো আমার অজানা নয়। তুমি তো অনেক চেষ্টা করেছ, তোমার তেজ, তোমার সাহস আমার মনে সঞ্চার করতে। কিন্তু—

তুমি দুঃখ ক'রো না। তুমি তো নিজেই বল—ভাগ্যবশে মহারাজ নলকে দাসত্ব করতে হয়েছিল, অত বড় রাজা—হয়েছিলেন অশ্বপরিচারক।

ঘোড়ার সহিস কথাটা মুখে তাঁর বেধে গেল।

ও সব কথা থাক্ কাশীর বউ। শাস্ত্র পুরাণ এ সব তো অনেকই পড়লাম, জানিও তো সবই। কিন্তু মনে বল পেলাম কই ? এ দেহ বস্ত্রের মত, এ সংসার মায়া। নির্যাতন বল, বিপদ বল, এ সব জীবনের পরীক্ষা, এ জেনেও যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। তুমি কি বলছিলে, বল ?

কাশীর বউ স্থির দৃষ্টিতে জানলার দিকে চেয়ে বললেন, ক্ষমাই চেয়ে এস তুমি। কিন্তু ক্ষমা চাইতে হ'লে যেমন ভাবে চাইতে হয়, তেমনি ভাবে চেয়ে এস, এতটুকু বাকি রেখো না। হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে, মাথা নীচু ক'রে, গোপীচন্দ্রবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে—আমার অন্যায় হয়েছে, আমার গোলাপ গাছটা কেটেছি, আপনার তাতে অসম্মান হয়েছে ; আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি ; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রাধাকান্ত উঠে বসলেন। বললেন, তাই বলব।

তারপর আবার বললেন, ভাল বলেছ। ভাগ্যকে যখন যুঝতেই পারব না, তখন এমনি ক'রেই তার লাঞ্ছনা একান্ত অনুগতের মত মাথায় তুলে নেওয়াই ভাল।

কীর্তিচন্দ্র ব্যাপারটার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। কতকগুলি বাক্য বেছে রেখেছিলেন, শানিয়ে রেখেছিলেন। হস্তপদবদ্ধ শত্রুকেও আঘাত করতে তাঁর বাধে না। কিন্তু রাধাকান্ত তাঁকে সে অবসর দিলেন না। এক রাত্রের নিদারুণ মানসিক যুদ্ধের ছাপ তাঁর সর্ব অবয়বে সুপরিস্ফুট। কীর্তিচন্দ্রও বিস্মিত হলেন তাঁর মুখ দেখে। রক্তাক্ত বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্র দেখে বিজয়ীর উল্লাস যেমন গাম্ভীর্যে পরিণত হয়, তেমনই ভাবেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন আপনা-আপনি। শুধু বললেন, আসুন। একটা চিঠি দেখাব। সেখানে তিনি, রাধাকান্তবাবু আর আমি থাকব শুধু।

দারোগা প্রশ্ন করলেন, বাবা আছেন ?

হ্যাঁ। রয়েছেন ভিতরে।

না।—রাধাকান্তবাবু সংযত স্থির কণ্ঠে বললেন, না। তার প্রয়োজন নেই।

আপনি একবার গিয়ে বলুন—আমার একটু নিরিবিলি কাজ আছে। সাহেবের দারোগাবাবু। সাহেব চিঠিতে সে কথা লেখেন নাই। বরং 'প্রকাশ্যভাবে' কথাটাই তিনি লিখেছেন। আসুন, কোনও দ্বিধা করবেন না। তিনিই এগিয়ে গেলেন। সর্বাগ্রে ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি গোপীকান্তবাবু। আসুন দারোগাবাবু।

দারোগা মাথা হেঁট ক'রে ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের এক পাশে ব'সে পত্রখানা গোপীচন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। গোপীচন্দ্র চিঠিখানা নিলেন, কিন্তু পড়লেন না। রাধাকান্তকে বললেন, আপনি বসুন। কথাটা ব'লে নিজেই একটু স'রে বসলেন, পাশেই স্থাননির্দেশ করলেন।

রাধাকান্ত বসলেন না, বললেন, সাহেব লিখেছেন, আমার বাড়ির গোলাপ গাছ কাটার ব্যাপারে আপনি দুঃখিত হয়েছেন, নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছেন ; তিনি প্রকাশ্যভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার হুকুম করেছেন দারোগাবাবুর মারফৎ। আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

দুই হাত জোড় করলেন রাধাকান্ত।

গোপীচন্দ্র অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি রাধাকান্তের হাত ধ'রে বসাবার জন্যে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাধাকান্তের হাত জোড় করা দেখে ব'সে পড়লেন তিনি।

হাত জোড় ক'রে রাধাকান্ত বললেন, উত্তাপ ছিল না, ক্ষুব্ধতা ছিল না তাঁর কণ্ঠস্বরে, ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি অন্যায় করেছি।

গোলাপ গাছটা কেটে আপনারই অসম্মান করেছি আমি, আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমাভিক্ষা করছি—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সমস্ত মজলিসটা অবশ স্তব্ধ হয়ে গেল।

মুখরপ্রকৃতি বংশলোচনের মুখেও কথা যোগাল না। ক্রুদ্ধ কীর্তিচন্দ্রও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাধাকান্তের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ উত্তাপ কিছু থাকলে বড় ভাল হ'ত, এই আক্ষেপটাই মনের মধ্যে নদীর বাঁধ-বাঁধা জলের আবর্তের মত পাক খেয়ে সারা হয়ে গেল।

রাধাকান্ত বললেন, দারোগাবাবু, এইবার আমি যেতে পারি?

হ্যাঁ, আমি লিখে দেব সাহেবকে।

কোন ত্রুটি যদি থাকে তো বলুন।

না।

রাধাকান্ত ঘর থেকে চ'লে গেলেন।

* * * *

ফিরে তিনি বৈঠকখানায় এলেন না।

তাঁর বৈঠকখানাতেই গ্রামের সবচেয়ে বড় মজলিস বসে। সকালে সন্ধ্যায় বিশ-পঁচিশজন ভদ্রলোক ব'সে থাকেন। গল্পগুজব হয়, নানা আলোচনা হয়, স্বর্ণবাবু পর্যন্ত এ মজলিসের নিয়মিত সভ্য। গোপীচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে আসেন। কীর্তিচন্দ্রকে আসতে হয়। বংশলোচনও আসেন।

এই কারণেই রাধাকান্ত বৈঠকখানায় গেলেন না। বাড়ির ভিতর গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ঘরটার এক পাশে একখানা পুরানো আমলের খাট, একটি আলমারি, খাটের পাশে একটি ছোট টেবিল, দেওয়ালে গোটা কয়েক ব্র্যাকেট এবং একটি কাচের দেওয়াল-আলমারি। এক দিকে ছোট চৌকির উপর পাঁচ-সাতটি বাক্স, বাক্সগুলির পাশে ঘরের কোণে একটি একনলা বন্দুক এবং একখানি তলোয়ার ও একটি ঢাল; অন্য দিকে মেঝের উপর একখানি গালিচার আসন বিছানো, আসনের সামনে দেওয়াল ঘেঁষে তাঁর পূজার্চনার সরঞ্জাম এবং ছোট একটি জলচৌকির উপর তাঁর পিতার পাদুকা—রাধাকান্তের অর্চনায় চন্দনলিপ্ত এক জোড়া চটিজুতা। রাধাকান্ত ঘরে এসে খাটের উপর ব'সে পড়লেন। সবলদেহ বিশালকায় পুরুষ রাধাকান্ত। সুপুরুষ নন তিনি, রঙ তাঁর কালো, কিন্তু সর্ব অবয়বে আছে একটি সম্ভ্রান্ত পরিচয় এবং পৌরুষের ছাপ। মুখখানা তাঁর থমথমে হয়ে উঠেছে।

ঝড়ে-ওড়া লাল-ধুলো-মাখা কালো মেঘের মত বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত তাঁর অবস্থা। হাতের উপর কপাল রেখে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি। বুকের

ভিতর তাঁর ঝড় উঠেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত গোপীচন্দ্রের ওখানে ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত অসাধারণ সংযমে নিজেকে স্থির দৃঢ় ক'রে রেখেছিলেন; কিন্তু বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠেছে। এখনও পর্যন্ত বার বার তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছেন—তিনি যে যুক্তিতেই এ কাজ ক'রে থাকুন, যে অধিকারেই তিনি তাঁর গাছটা কেটে থাকুন, তাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং গোপীচন্দ্রের অসম্মান হয়েছে; স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা আঘাত পেয়েছেন। অপরাধ তাঁর। মমতায় এবং মোহের বশে তিনি দেবপূজার জন্য ফুল তুলতে দিতেন না। এ সেই মোহের শাস্তি। গোপীচন্দ্র তাঁর এ মোহের কথা না-জেনেই ফুল চেয়েছিলেন। তখন তিনি এই দুর্বলতার কথা জানালেই পারতেন। কেন তিনি জানাতে ভয় করলেন? এ তাঁর কাপুরুষতার শাস্তি। তিনি ভয় করছিলেন, ফুল না-দিলে ঠিক এমনই ঘটনা ঘটবে। সাহেবের ভয় তাঁকে কণ্ঠরোধ করেছিল।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। আর আত্মসম্বরণ অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি দুই হাত জোড় ক'রে উপরের দিকে তুলে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, হে বিশ্বনাথ—হে ভগবান!

তারপর খাট থেকে নেমে তাঁব বাপের পাদুকার উপর মাথা রেখে ব'সে পড়লেন। ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকল। বুঝলেন, কাশীর বউ। কিন্তু মাথা তুললেন না তিনি। এক মুহূর্ত পবেই তিনি মাথার উপর স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেলেন। তবুও তিনি মাথা তুললেন না। এই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও তাঁর হাসি পেল, বিক্ষুব্ধ অন্তরের তিক্ত হাসি। তুমি মূর্খ কাশীর বউ, এ জ্বালা বাতাসের স্পর্শে স্নিগ্ধ হয় না, এ আগুন জল দিলে নেবে না।

হঠাৎ ঝনাৎ শব্দে কি যেন একটা ভারী জিনিস প'ড়ে গেল।

রাধাকান্ত বিরক্ত হয়ে মাথা তুললেন। দেখলেন ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কাশীর বউ বন্দুকটা এবং তলোয়ারখানা সরাচ্ছে। তলোয়ারখানাই প'ড়ে গিয়েছে। হাসলেন তিনি। বললেন, ভয় নেই কাশীর বউ, মরব না। মরতে আমি চাই না। আমি বাঁচব দেখবার প্রত্যাশায়—

বাধা দিয়ে কাশীর বউ বললেন, ছি, অভিসম্পাত কাউকে ক'রো না।

রাধাকান্ত একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি আমায় অপমান করলে কাশীর বউ। আমি এত নীচ, আমি এত অক্ষম! ছি—ছি—ছি! আমি—

হঠাৎ তিনি চুপ করলেন। হঠাৎ নয়, পিঠের উপর পাখার মৃদু আঘাত অনুভব করছেন। বিস্মিত হয়ে কথা বন্ধ ক'রে পিছনে তাকালেন তিনি।

কাশীর বউ ওখানে, তবে বাতাস করে কে? উত্তেজনায় বাতাসের স্পর্শ সত্ত্বেও কথাটা মনে হয় নি। গৌরীকান্ত পাখা দিয়ে বাতাস করছিল, অসাবধানতায় অথবা চাঞ্চল্যবশত পাখা তাঁর পিঠে লেগেছে। গৌরী অপ্রস্তুত হয়েছে, সে পাখাখানা মাটিতে ঠেকাচ্ছে। পাখা গায়ে লাগলে মাটিতে ঠেকাতে হয়। রাধাকান্তের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল; অগ্ন্যুত্তপ্ত মানুষ যেমন অধীর আগ্রহে ছোট একটি আধারের জলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তেমনই ব্যাকুল আগ্রহে তিনি তাকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। যেন ওকেই আশ্রয় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। গভীর স্বরে বললেন, আমি বাঁচব কাশীর বউ, গৌরীকে মানুষ করবার জন্যে। জীবনে আমি হোম করব, ওই আমার অগ্নি—আমার জীবনের সমস্ত হবি আমি মন্ত্রপাঠ ক'রে বিন্দু বিন্দু ক'রে ঢালব, বলব—তুমি অকলঙ্ক হয়ে প্রজ্বলিত হও, তুমি অদমিত হয়ে প্রজ্বলিত হও, তুমি উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রজ্বলিত হও, তুমি আকাশস্পর্শী হয়ে প্রজ্বলিত হও, তুমি সকলের মঙ্গলের জন্য প্রজ্বলিত হও, মানুষের শ্রদ্ধার ছবিতে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রজ্বলিত হও; কখনও যেন গৃহস্থের গৃহ তোমার দ্বারা দগ্ধ না হয়। শিশু নারী বৃদ্ধ নিরীহ ধার্মিক তোমার উত্তাপে যেন কখনও উত্তপ্ত না হয়; পূর্ণ-প্রজ্বলিত তোমার শিখার মধ্যে যেন আমাকে পূর্ণাহুতি দিয়ে আমার সকল কলঙ্ক সকল অপমানের অবসান হয়। এই জন্যে আমি বাঁচব কাশীর বউ।

রাধাকান্তের চোখ ধকধক ক'রে যেন জ্বলছিল। গৌরীকান্ত বিস্ফারিত নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল মন্ত্রমুগ্ধের মতই। কাশীর বউ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন।

রাধাকান্ত এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধ'রে বললেন, রাখ বন্দুক, তলোয়ার রাখ।

তারপর বললেন, তুমি কি রাগ করলে? দুঃখ পেলে?

না। ব'স তুমি, আমি বাতাস করি।

বাতাস করতে করতে বললেন, কাল রাত্রি থেকে কিছু খাও নি—

হেসে মধ্যপথেই বাধা দিয়ে রাধাকান্ত বললেন, আজও কিছু খাব না। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রে বলেছে, পিতামাতার তুল্য আশ্রয় নাই, ভার্যার তুল্য সান্ত্বনা নাই, পুত্রের তুল্য আশা নাই, উপবাসের তুল্য প্রায়শ্চিত্ত নাই—আমি নিরম্বু নির্জলা উপবাস করব।

* * * *

স্নানান্তে প্রসন্নমনে পূজার্চনা শেষ ক'রে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন। গত

রাত্রে ঘুম হয় নি। স্নান করার পরই চোখে যেন ঘুম ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। কোনমতে পূজা শেষ ক'রে তিনি শুয়ে পড়বামাত্র গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অপরাহ্লে যখন উঠলেন, তখন কার্তিক মাসের ছোট দিনের আলো প'ড়ে এসেছে। শরীরটা হালকা এবং মন প্রশান্ত হয়ে উঠেছে।

চাকর বিষ্ণু এসে তামাক দিয়ে নলটি বাড়িয়ে ধরলে। তিনি বললেন, না। উপবাস ক'রে তামাক খেতে রুচি ছিল না। বললেন, আমার ডায়রি আর দোয়াত কলম দিয়ে যা।

ডায়রি লিখতে বসলেন।

অদৃষ্টবাদে গভীর বিশ্বাস রাধাকান্তের। অর্থকরী-কর্মজীবনহীন রাধাকান্তের পুরুষকার স্বাভাবিক ভাবেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। নবগ্রামের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের রীতির নির্দেশে পৈতৃক সম্পত্তির স্বল্পায়তন আধারের মধ্যে ব'সে থেকে বিকলাঙ্গ মানুষের মত অবস্থা তাঁর পুরুষকারের। দ্রুত ধাবমান পৃথিবীর সঙ্গে চলবার ক্ষমতার অভাবে পথে ব'সে গ্রহ এবং দেবতার সাহায্যের জন্য চীৎকার না ক'রে তাঁর গত্যন্তর নাই। আজকের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে তিনি অদৃষ্টবাদসম্মত বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত ক'রে সান্ত্বনা খুঁজে বের করেছেন। তিনি লিখলেন—

"চরমতম অপমান আজ হইয়া গেল। দোষ কাহাকে দিব? দায়ী আমার বাল্যজীবনের কর্মফল এবং দায়ী আমার অদৃষ্ট। আমার মন্দ কর্মের ফলে অদৃষ্ট প্রবল বলশালী হইয়া কঠিন দণ্ড দিল। মহৎ পিতার সন্তান, বাল্যে লেখাপড়া শিখি নাই। বুদ্ধি ছিল, মেধা ছিল; অবহেলার মন্দ মতির মত্ততায় সবই বৃথা হইয়াছে। আজ রোদন করিলে কি হইবে? একমাত্র সান্ত্বনা—আমি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতেছি যে, মন্দ ভাগ্যের ইহাই সম্ভবত শেষ প্রান্ত। শাস্ত্রে বলে—সুখ এবং দুঃখ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হয়; অদৃষ্টচক্রে ঘুরিয়া মানুষ যখন দুঃখ এবং মন্দ ভাগ্যের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয় তখনই তাহার দুঃখের শেষ, তাহার পরই চাকা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। বাল্যকালে গল্প শুনিয়াছিলাম, এক মহাপরাক্রান্ত রাজার এক পরম বিচক্ষণ এবং সাধু মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বিচক্ষণতা শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে কাচমণ্ডিত আলোকশিখার মত স্থির দীপ্তিতে প্রজ্বলিত থাকিত। ভাগ্যও ছিল প্রসন্ন। সকলেই বলিত, এ রাজ্যের মধ্যে সর্বসুখসৌভাগ্যে সুখী এবং ভাগ্যবান ওই একটি ব্যক্তি—এ রাজ্যের মহামন্ত্রী। পরাক্রমশালী রাজা নবীন যুবক,

মহামন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি পর্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে সংবাহন করিতেন। একদা মন্ত্রী এক পুণ্যময় যোগে গঙ্গাস্নান গেলেন। গঙ্গায় স্নান করিতেছেন, এমন সময় গাত্রমার্জনাকালে তাঁহার অনামিকা হইতে অঙ্গুরীয়টি পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গেল। দুর্লভ একটি রত্নখচিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়, রাজভাণ্ডারেও তেমন রত্ন ছিল না। মন্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন। এমন রত্ন—হায়! তাঁহার আক্ষেপ মুখেই থাকিয়া গেল, চরম বিস্ময়ে পরিণত হইল। জলের একটি আকস্মিক আলোড়নে নীচের জিনিস উপরে ভাসিয়া উঠার সঙ্গে সেই অঙ্গুরীয়টিও জলের উপরে ঠিক তাঁহার সম্মুখেই ভাসিয়া উঠিয়া যেন তাঁহার অঞ্জলিতেই নিক্ষিপ্ত হইল। অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া শুধু নিজেকেই প্রশ্ন করিলেন—এ কি হইল? স্বর্ণ এবং রত্ন সকল ধাতুর মধ্যে গুরুভার। রত্নখচিত স্বর্ণাঙ্গুরীয় জলে ভাসিল? কে ভাসাইল? কেন ভাসিল? চিন্তিত মনেই ঘরে ফিরিলেন। গভীর চিন্তার পর উপলব্ধি করিলেন—ভাগ্য! ভাগ্য তাঁহার সৌভাগ্য এবং সুখের চরমতম ঊর্ধ্ববিন্দুতে উপনীত হইয়াছে। সেই হেতুই এমন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিলেন, এইবার চাকা নীচের দিকে নামিবে। তাঁহাকে দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। তিনি মনে মনে প্রস্তুত হইলেন,—বাহ্যিক ব্যবস্থা করিতেও ভুলিলেন না। স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলকে রাজ্যান্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। বহুমূল্য রত্নসম্ভার মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিলেন। ভগবানে মন সমর্পণ করিলেন।

দুর্ভাগ্য আসিল। করালমূর্তিতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অকস্মাৎ শত্রুতে দেশ আক্রমণ করিল। মন্ত্রীর প্রতি ঈর্ষাতুর সেনাপতি মন্ত্রীর পরামর্শগুণেই শত্রুকে পরাজিত করিয়া রাজার প্রীতিভাজন হইয়া উঠিল; এবং সেই সুযোগে সে এক জাল পত্র উপস্থিত করিয়া প্রমাণিত করিল যে, মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রফলেই দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল; সেনাপতির রণপাণ্ডিত্যে এবং নৈপুণ্যেই কোনক্রমে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, শত্রু পরাজিত হইয়াছে। ভাগ্যের চক্রান্ত। মন্ত্রীর প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান রাজা একবার মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করিলেন না, বিচারের প্রবৃত্তি পর্যন্ত হইল না। তিনি আদেশ দিলেন, মহামন্ত্রীকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর এবং তাহার ধনসম্পত্তি রাজভাণ্ডারভুক্ত কর। স্ত্রী পুত্র কন্যা যে আছে, তাহাদেরও কারাগারে নিক্ষেপ কর। মন্ত্রী নিজের বাড়িতে তখন সদ্য প্রাতর্ভোজনে বসিয়াছেন, একটি পাকা আতাফল খাইবার জন্য হাত মুখে

তুলিয়াছেন, এমন সময় সেনাপতি আসিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন।—তুমি বন্দী।

মন্ত্রী নীরবে ক্ষীণ হাস্য করিলেন। প্রতিবাদ করিলেন না, ভীত হইলেন না, রাজাকে বারেকের জন্যও অনুনয় করিলেন না। সংযত ধীর পদক্ষেপে প্রশান্ত মুখে কারাগারের লৌহদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্ধকার কোণে আশ্রয় লইয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলেন, প্রহরী তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। আশ্চর্য ভাগ্যের চক্রান্ত, সমগ্র দেশের যে জনসাধারণ মহামন্ত্রীকে দেবতা জ্ঞান করিত, তাহারা তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারী পিশাচ জ্ঞান করিতে একটি মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করিল না।

মন্ত্রী ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিলেন, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বারো বৎসর চলিয়া গেল।

মহামন্ত্রীর কথাই লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। কারাগারের অন্ধকারে মহামন্ত্রীর দেহ হইয়া গেল কঙ্কালসার, বর্ণ হইয়া গেল পক্ক পত্রের মত, মুখ শ্মশ্রু-গুম্ফে আচ্ছন্ন হইল, মাথার তৈলহীন চুলে জটা বাঁধিল। মন্ত্রীর মনে হইল, ভাগ্যচক্র ফিরিতে ফিরিতে তাঁহার জীবন শেষ হইবে। মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, কি বাসনা আছে তাঁহার।

একটি পাকা আতাফল তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। মনে পড়িল, পাকা আতাফল মুখে তুলিতে গিয়া তিনি বন্দী হইয়াছিলেন, খাওয়া হয় নাই। তিনি কারাগারের প্রহরীকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন বাসনার কথা।

প্রহরী তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিল।

পরের দিন আবার তিনি প্রহরীকে বলিলেন, একজন মরণোন্মুখ বৃদ্ধের শেষ বাসনা পূর্ণ করিলে ভগবান তোমার উপর সদয় হইবেন।

প্রহরী অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, দণ্ডপাণি মহারাজ প্রত্যক্ষ। তাঁহার এক কথায় আমার মুণ্ডচ্ছেদ হইবে বৃদ্ধ। ভগবান কেহ চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তুমি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিলে তাহার ফল তোমার অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিতেছি। সুতরাং ভগবানের দয়ায় আমার কোন প্রলোভন নাই।

পরের দিন তিনি আবার প্রহরীকে বলিলেন, তোমার ভাগ্যপতি তোমার প্রতি সদয় হইবেন। যেহেতু মৃত্যুপথের পথিকের অভীপ্সা পূরণ মহাধর্ম। অচিরে তুমি সৌভাগ্যের মুখদর্শন করিবে।

প্রহরী চুপ করিয়া রহিল সেদিন।

পরের দিন বৃদ্ধ মন্ত্রী আবার নিবেদন করিলেন, তোমার দয়াধর্মের নিকট এই আমার শেষ আবেদন। তুমি প্রহরী হইলেও মনুষ্য।

প্রহরী সেদিন বিচলিত হইল। চিত্ত তাহার আলোড়িত হইল। সে কারাগারের দরজার ছিদ্র দিয়া বৃদ্ধকে একবার দেখিল। দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। চোখে জল আসিল। বহু চিন্তার পর দয়াধর্মই বলবতী হইল। পরের দিন সে বাজার হইতে একটি সুপক্ক আতাফল আনিয়া বৃদ্ধকে ডাকিয়া বলিল, এই লও, ভোজন করিয়া মরিয়া যাও। আমি কয়েক দিন এইখানেই শুইয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া ধন্য হই।

সুপক্ক আতাফলটি লইয়া এককালের মহামন্ত্রী—বহু সৌভাগ্যের অধীশ্বর—বুকে ধরিয়া বসিয়া রহিলেন; কাঙাল স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষা পাইয়াছে। কিছুক্ষণ পর তিনি একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া ফলটি সেখানে রাখিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া নিবেদন করিলেন। নিবেদনান্তে তিনি ফলটি তুলিয়া লইবার জন্য যে মুহূর্তে হাত বাড়াইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ভূগর্ভস্থ কারাগারের ছাদের একটা ফাটল হইতে কিছু একটা বস্তু ঠিক ফলটির উপরেই খসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা অসহনীয় দুর্গন্ধে ভরিয়া গেল, সুগন্ধ ফলটি ফাটিয়া ওই দুর্গন্ধ-যুক্ত বস্তুটির সঙ্গে একেবারে মাখামাখি হইয়া মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল। ভাগ্যহত বৃদ্ধ স্তম্ভিত এবং মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হইয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, খানিকটা ছাদের ভাঙা টুকরা ও তাহারই সঙ্গে কোন রোমশ জন্তুর গলিত দেহ। ভাল করিয়া দেখিলেন, পচা ছুঁচার দেহ। উপরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন একটা গর্ত। সম্ভবত ওই গর্তের মধ্যেই জীবটা মরিয়া পচিয়াছিল এবং এই মুহূর্তটিতে ছাদের ওই ভগ্ন অংশ পড়িবার সময় ওটা সুদ্ধ খসিয়া পড়িয়াছে। পড়িয়াছে কি তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত আতা ফলটির উপর! আশ্চর্য, তিনি বাছিয়া বাছিয়া ওই পড়িবার স্থানটিতেই ফলটি রাখিয়াছিলেন। চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি হাসিলেন। বলিলেন, হইয়াছে। যে রত্নখচিত স্বর্ণাঙ্গুরীয় জলে ভাসাইয়াছিল, সে-ই আজ বহু আকাঙ্ক্ষার—জীবনের শেষ আকাঙ্ক্ষার ফলটির উপর গলিত জীবদেহ নিক্ষেপ করিল। চাকা ঘুরিল। ইহার অপেক্ষা নিম্নতম বিন্দু আর কি হইতে পারে?

তিনি ইষ্টদেবতার ধ্যানে বসিলেন।

অকস্মাৎ অন্ধকার কারাগৃহ আলোয় ভরিয়া গেল। তিনি কি আসিলেন?

তিনি নন, স্বয়ং রাজা লৌহদ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। রাজা নিজে আসিয়া মন্ত্রীর লৌহশৃঙ্খল মোচন করিয়া কহিলেন, হে জ্ঞানবৃদ্ধ পিতৃতুল্য মহামন্ত্রী, আমি আপনার সন্তানতুল্য। আমি মহাভ্রমে পতিত হইয়া মহাপাপ করিয়াছি। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি স্বীয় ষড়যন্ত্রের অপরাধ আপনার উপর আরোপ করিয়াছিল, আমি ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়া আপনার প্রতি অমানুষিক দণ্ডবিধান করিয়া ছিলাম. বিচার করি নাই, বিবেচনা করি নাই—আমি রাজধর্মে পতিত হইয়াছি, আমি মনুষ্যধর্মে পতিত হইয়াছি, যেহেতু না আপনি আমার গুরুতুল্য পিতৃবন্ধু, পরমহিতৈষী, আপনাকে আমি অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছি। আজ সমস্তই প্রকাশ পাইয়াছে। আজই প্রত্যূষে বন্দী শত্রু-সেনাপতি মারা গিয়াছে। এই কারাগৃহের ঠিক উপরের কক্ষেই সে বন্দী ছিল। মৃত্যুকালে সে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিল, আমার নিকট অনুতাপের সঙ্গে অকপটে সমস্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছে। আপনাকে আমি মুক্ত করিতে স্বয়ং আসিয়াছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মন্ত্রী হাস্য করিলেন, বলিলেন, বৎস, তুমি কোন অপরাধ কর নাই। তুমি আমি কে? যে করিয়াছে তাহাকে, এস, তুমি আমি—উভয়েই প্রণাম করি। পরম বিস্ময়ের সহিত রাজা প্রশ্ন করিলেন, কাহার কথা বলিতেছেন? কে তিনি?

ভাগ্য।

মন্ত্রী বাহিরে আসিয়া উপরের কক্ষ অতিক্রমকালে দেখিলেন, মেঝের একটি গর্তে একটি ছুরিকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রশ্ন করিলেন, ওটা কি?

রাজা বলিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি ওই গৃহে প্রবেশ করিয়া ওই গর্তে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া গুপ্ত দলিল উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিল। ওই গর্তে শত্রুসেনাপতি দলিল লুক্কায়িত রাখিয়া ছিল; সৌভাগ্যক্রমে সতর্ক প্রহরী সেনাপতির চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছে। দলিল হস্তগত হইয়াছে; কিন্তু এমন দুর্গন্ধ তাহাতে যে, সে দলিল আমি এখনও দেখিতে পারি নাই। শুনিয়া মন্ত্রী আবার হাস্য করিয়া প্রণাম করিলেন।”

গল্পটি শেষ করে রাধাকান্ত আবার লিখলেন, “আজ আমার এই অপমান কি তদনুরূপ দুর্ভাগ্যের নিম্নতম বিন্দু নহে? ভাগ্য, তোমাকে প্রণাম করিতেছি—কোটি কোটি বার প্রণাম করিতেছি; যদি নিম্নতম বিন্দুতে আমার ভাগ্যফল আজও না আসিয়া থাকে. তবও সে বিন্দু আর খুব দূরে

নয়, তুমি সেই স্থানে আমাকে সত্বর উপনীত কর। এইটুকু করুণা তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি।”

এর পর গৌরীকান্তকে সম্বোধন ক'রে লিখলেন, “বাবা গৌরীকান্ত, যখনই ভাগ্যের দ্বারা পীড়িত হইবে, দুঃখে-কষ্টে মনের মধ্যে গ্লানি উপস্থিত হইবে, তখনই এই গল্পটি স্মরণ করিও। ইহা মিথ্যা নয়। আমাদের শ্রীবৎস রাজার গ্রহ কর্তৃক নিপীড়ন, নলরাজার কলি কর্তৃক নির্যাতন—সবই এক কথা বলে। কিন্তু এই গল্পে ভাগ্যের উর্ধ্বতম বিন্দু এবং নিম্নতম বিন্দুর যে দৃষ্টান্ত, সে দৃষ্টান্তের কথাটিই বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিও। ইহার শুধু একটি স্থানে সংশয় আছে। মহামন্ত্রী মুক্তিকালে রাজাকে বলিয়াছিলেন, তোমার কোন অপরাধ নাই—সবই ভাগ্য। ইহাতেই আমার সংশয়। ভাগ্য দুর্ভোগ আনে, তাহাকে ঠেকানো যায় না। কিন্তু ভাগ্য মন্দকর্মে মতি যখন দেয়, তখন মানুষ স্বকীয় বিচক্ষণতা এবং শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে সেই মতিভ্রম হইতে অবশ্যই বিরত থাকিতে পারে। এক্ষেত্রে রাজার অপরাধ নিশ্চয় হইয়াছে। রাজধর্মে মনুষ্যধর্মে অবশ্যই তিনি পতিত হইয়াছেন। রাজাকে শাস্ত্রে বলে, ভগবানের প্রতিনিধি, সকল দেবতার অংশ হইতে তাঁহার উদ্ভব। তিনি হইবেন বায়ুর মত নিরপেক্ষ। আলোকের মত সকল জটিলতার কুজ্ঝটিকাভেদী হইবে তাঁহার দৃষ্টি। রাজা যদি পক্ষপাত করেন, তাঁহার দৃষ্টি যদি ভ্রমান্ধকারে বদ্ধ হয়, প্রতারিত হয়, তবে প্রজার আশ্বাস কোথায়, শান্তি কোথায়? তুমি এই রাজকুল হইতে সাবধান এ অঞ্চলে বর্গীদের অত্যাচারের পর অমন অত্যাচার স্মরণাতীত কাল হইতেও কখনও হইবে। ইংরাজের অত্যাচারের কথা আমি মাতামহীর কাছে শুনিয়াছি। আমাদের হয় নাই। তবুও শান্তির কালে ইহারা ন্যায়বিচার করে বলিয়া প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে। আজ আমার সে ভ্রমও ভাঙিয়া গেল। ইহারা আমাদিগকে ‘নেটিভ’ ‘নিগার’ বলিয়া ঘৃণা করে, আমাদের ধর্মকে ঘৃণা করে। তাহার উপর দারুণ পক্ষপাতী। ইহারা ধনার প্রতি প্রসন্ন—দরিদ্রের প্রতি প্রচণ্ড অবজ্ঞা ইহাদের। আদালতে ন্যায়বিচারের অভিনয় করে, কিন্তু শাসনের ব্যাপারে ইহারা ন্যায়-অন্যায় মানে না—সে সব ক্ষেত্রে অনুগত ধনীর সাতখুন মাফ; মানুষের বিচার ইহাদের মানুষ হিসাবে নয়, সে বিচার ইহাদের কাহার কত সম্পত্তি, কত অর্থ আছে তাহারই হিসাবে। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করিয়া এই যে আজ দেশব্যাপী আন্দোলন হইতেছে, ইহাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে। এই চৈতন্যোদয় হইয়াছে ইহাদেরই এইরূপ রাজধর্মের আচরণে। বীরত্বের লীলাভূমি ভারতের গৌরবোজ্জ্বল

রাজস্থান একদা বাদশাহ আকবরের মোহে পড়িয়া এইরূপ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। এক মেবারের চন্দ্রবংশকুলতিলক মহামতি মহারাণা প্রতাপসিংহ সে মোহ হইতে মুক্ত ছিলেন, অরণ্যে পর্বতে কন্দরে বহু দুঃখ সহ্য করিয়াও অধীনতা স্বীকার করেন নাই। একদা তিনিও ভাঙিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময় আকবরের সভাকবি পৃথ্বীরাজের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল অনুরূপ ভাবে। নিদারুণ আঘাত, মর্মান্তিক অপমান। নওরোজের মেলায় আকবর পৃথ্বীরাজ মহিষীর অমর্যাদা করিতে উদ্যত হইলেন—রাজপুত-ললনা ছুরিকার সাহায্যে ধর্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া স্বামীর সম্মুখে ক্ষোভে আত্মহত্যা করিলেন। পৃথ্বীরাজ-কবি সেদিন সমগ্র রাজপুত জাতিকে জাগ্রত করিবার সংকল্প করিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহকে কবিতায় পত্র লিখিলেন। মহারাণা প্রতাপ সেই পত্র পড়িয়া সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তে কবির কাব্য পড়িয়া একে একে বহু রাজপুত নরপতির চৈতন্যোদয় হইল। রাজস্থানের দুর্গের পর দুর্গ উদ্ধার হইল। রাজা রাজধর্মচ্যুত হইলেই প্রজার শ্রদ্ধা হারায়। শুধু অনুগত ধনীরা রাজাকে সাহায্য করে। আজ দেশের ঠিক সেই অবস্থা। বাবা গৌরীকান্ত, তুমি কখনও ধনী হইতে চেষ্টা করিও না, ধনী হইলেই রাজ-উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণে রুচি জন্মে। গুণী হইও। সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহস অর্জন করিও। সাহসই শক্তি। আমি দেহের শক্তিতে বিপুল বলশালী, আমি ধনীকে ভয় করি না, দস্যুকে ভয় করি না ;—না, দস্যুকে আমি ভয় করি না, সাধারণ দস্যুকে ভয় না করিলেও সর্বাপেক্ষা বড় দস্যুকে ভয় করি। রাজা—এই বিদেশী রাজাই সর্বাপেক্ষা বড় দস্যু। আমি—"

মনের আবেগে পাতার পর পাতা তিনি লিখে চলেছিলেন। এক সপ্তাহের দিন-লিপির স্থান—এক দিনের লেখাতেই ভ'রে গিয়েছে। তখনও লিখে চলেছেন, গৌরীকান্ত ঘরে এসে প্রবেশ করল।

বাবা !

লেখা রেখে রাধাকান্ত বললেন, কি বলছ বাবা ?

সন্তোষ পিসেমশায় এসেছেন।

সন্তোষবাবু ? কোথায় ?

নীচে।

সে কি ! নিয়ে এস তাঁকে। কই, সন্তোষবাবু ? আসুন ভাই।

সন্তোষবাবু এসে বসলেন। কি বলবেন ! কথা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। বাইরে গোটা গ্রামখানা আজ এই প্রসঙ্গ নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অধিকাংশ জনই এ কথা নিয়ে সান্ত্বনা দিতে লজ্জা বোধ করছে ব'লেই আসতে পারে নি। রাধাকান্তের সকাল-সন্ধ্যায় হাসিতে আলাপে বাদে প্রতিবাদে মুখর বৈঠকখানাটা আজ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। রাধাকান্ত বাড়িতে না-থাকলেও মজলিস বাদ পড়ে না। এ বন্দোবস্ত তাঁর করা আছে। কেবল সন্তোষবাবু থাকতে পারেন নি। বৈঠকখানায় এসে বার-দুয়েক কিছুক্ষণ ব'সে তামাক খেয়ে ফিরে গেছেন। তৃতীয় বারে বাড়ি পর্যন্ত এসেছেন। অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বললেন, দুঃখের ভাগ তো দেওয়া চলে না ভাই রাধাকান্তবাবু, তবু যে যাকে ভালবাসে সে তার দুঃখের ভাগ নিতে চায়। প্রাণটা আকুল হয়ে ওঠে। বার বার নিজেকে বললাম, তুই না-হয় ঘরজামাই, তোর না-হয় অন্য কোথাও ঠাঁই নাই—রাধাকান্তবাবুর এখান ছাড়া ; কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ তো মানতে হয়! তবু পোড়া স্বার্থপর মন মানে না ভাই ;—প্রাণটা সারাদিন মনের কথা প্রাণের কথা না-ব'লে হাঁপিয়ে উঠেছে, ঠেলে নিয়ে এল তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে।

রাধাকান্ত প্রসন্নকণ্ঠে যেন অন্তর ঢেলে ব'লে উঠলেন, বাঁচলাম ভাই। আমিও যেন মনে মনে আপনাকেই ডাকছিলাম। আপনি বোধ হয় সেই ডাকে এসেছেন।

সন্তোষবাবু বিস্মিত হয়ে রাধাকান্তের দিকে চেয়ে দেখছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন না।

রাধাকান্ত আবার বললেন, বসুন।

কি বলছিলে যেন ? মনে মনে ডাকছিলেন, বললে না ?

আপনি আমাকে যে সত্যই ভালবাসেন সন্তোষবাবু।

তা বাসি। নিশ্চয় বাসি। আজ তোমাকে ভাই আরও অনেক বেশি ক'রে ভালবেসে ফেললাম। দেখা হ'লেই বল—আসুন, অন্তরে স্থান গ্রহণ করুন। আজ তা বললে না। প্রথমটা ভাবলাম, অসন্তোষ আজ তোমার অন্তর জুড়ে, তাই ও-কথাটা বললে না। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম কথা শুনে, তোমার মুখ দেখে, দেখি—আমিই তোমায় জুড়ে ব'সে রয়েছি, মুখে চোখে মনে সন্তোষ যেন উপচে পড়ছে। কি ক'রে হ'ল তা জানি না। কিন্তু এর পর তোমাকে আমার অন্তর জুড়ে না বসিয়ে উপায় কি বল ? কিন্তু—। কিছু মনে করবে না তো ?

রাধাকান্ত হাসলেন।—নাঃ। মনে আর কিছু করব না।

কি ক'রে এমন হ'ল ?

শুনবেন ?

শুনব না ?

ডায়েরি লিখছিলাম। প'ড়ে শোনাই শুনুন।

হেসে সন্তোষবাবু বললেন, একটা কথা কিন্তু—

বলুন।

কাশীর বউয়ের কথা থাকলে কিন্তু বাদ দিয়ে পড়তে পারবে না। অন্য কোন কথা যদি ইচ্ছে হয় বাদ দিও।

হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন রাধাকান্ত। হেসে বললেন, না। সব প'ড়ে শোনাব আজ।

পড়তে শুরু করলেন রাধাকান্তবাবু। সন্তোষবাবু চোখ বন্ধ ক'রে শুনে গেলেন। পড়া শেষ ক'রে রাধাকান্ত হাসলেন, বললেন, কি মানুষের সঙ্গে, কি ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে লাভ নেই সন্তোষবাবু।

কিন্তু তবু যুদ্ধ করছ।—হাসলেন সন্তোষবাবু।

না। অনেক করছি। আর না। হার মানলাম। যুদ্ধ শেষ।

উঁহু।—ঘাড় নাড়লেন সন্তোষবাবু।—নতুন যুদ্ধের বীজ পুঁতলে ভাই।

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। বললেন, আমি কি— ? আপনার কথা তো বুঝতে পারলাম না ভাই।

বীজ পুঁতলে ভাই। অঙ্কুর বের হতে দেরি আছে। গৌরীকান্তের বয়স তো সবে ছয়-সাত। পরশুরাম অস্ত্রত্যাগ ক'রে ভীষ্মকে অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি আশীর্বাদ করছি ভাই, তোমার শিক্ষা তেমনই অজেয় হবে। গৌরীকান্ত, এদিকে এস তো বাবা।

গৌরীকান্তের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, গৃহজামাতা পরান্নভোজী, তবু এইটুকু ভরসা—নিত্য ইস্টদেবতাকে পূজা করি। আশীর্বাদ করি, তোমার বাপের দুঃখ-বেদনা তুমি মোচন করতে সক্ষম হও।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, আপনি কি আশীর্বাদ করলেন ভেবে দেখেছেন ?

রাধাকান্তের ইঙ্গিত সন্তোষবাবু মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, স্মরণ হয়ে গেল পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু তিনি অপ্রতিভ হলেন না। বললেন, ভেবে দেখেছি বইকি। পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ং—শাস্ত্রে বলে, এই তো গুরু এবং পিতার পরমকাম্য। সেই তো হবে তোমার সকল জয়ের শ্রেষ্ঠ জয়। জীবনের পরম জয়।

বারো

বাংলা দেশের পল্লীগ্রাম ; মন্থর জীবন। তার উপর নবগ্রামের অধিবাসীদের প্রধান অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার নিয়ে গঠিত। জমিদারেরা ব্রাহ্মণ। আচার-সর্বস্ব বিশ্বাসপ্রধান ধর্ম আর পরস্পরকে বাঁকা পথে মর্মান্তিক আঘাত কববার নৈপুণ্য ও আভিজাত্যসম্মত ভদ্রতার বিচিত্র সমন্বয়ে সৃষ্ট এখানকার মানুষের মন। নিম্নতম স্তরের মানুষেরা সভয়ে এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই লীলা দর্শন করে আর জীবনের বোঝা টেনে চলে। ব্যবসায়বৃত্তিধারীরা কৌতুক এবং ঈর্ষামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখে, সুযোগও গ্রহণ করে ; কিন্তু ব্যবসায়বৃত্তিকে এই এদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত পন্থায় পরিচালিত ক'রে চলে, এবং সতৃষ্ণ অন্তরে এদের জীবনের কোন প্রচণ্ড আঘাতের প্রতীক্ষায় ক্ষণ দণ্ড প্রহর দিন মাস বৎসর গণনা ক'রে চলে। ভাবজীবন এবং কঠোর বাস্তবের বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাতে তারা ভেসে চলে ছোট ছোট ডিঙির মত। জমিদারেরাই এখানকার জমির মালিক এবং তাঁরাই তাদের দোকানদারির প্রধান খরিদ্দার। জমিদারদের বিপদে এরা অন্তরে অন্তরে দুঃখও অনুভব করে, আবার অতি অজ্ঞাতে অন্তরে অন্তরে পুলকিতও হয়। দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে, আবার ভগবানকে অতি সূক্ষ্ম বিচারকর্তা ব'লে অভিনন্দিত করে।

একই সময়ে বিপরীতধর্মী দুই আলোড়ন সমগ্র গ্রাম্য জীবনকে আলোড়িত ক'রে তুললে। রাধাকান্তবাবু হাত জোড় ক'রে গোপীচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছেন, স্বয়ং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেছেন—এ সংবাদ একটি আলোড়ন তুললে। আর একটি আলোড়ন উঠল আগামী সপ্তাহে এখানে হাই ইংলিশ ইস্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হবে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন, জেলার অন্য রাজকর্মচারীরা আসবেন, উকিল মোক্তার ধনী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসবেন। মস্ত বড় সভা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রূপার কর্ণিক হাতে নিয়ে হাল বছরের টাকা-আধুলি-সিকি-দুআনি-ডবলপয়সা-পয়সা-ভর্তি একটা শিল-মোহর-করা বোতল সেখানে রেখে গোলাপ জলে ভেজানো মশলায় ইট গেঁথে ভিত পত্তন করবেন। বড় বড় লোকে বক্তৃতা দেবেন, রাত্রে বাবুদের ছেলেরা থিয়েটার করবেন। এ এক অভূতপূর্ব সমারোহ নবগ্রামে। প্রবল বন্যা যখন আসে,

তখন যেমন ভাটির টানেও নদীর বুকের কাদামাটি জাগতে পায় না, তেমনি ভাবেই সমারোহে অভূতপূর্বতায়, সবিস্ময় উল্লাসের প্রভাবে মানী রাধাকান্তের অবমাননার বিষণ্ণতা নবগ্রামে পরিস্ফুট হতে পেল না।

সে সমারোহের উদ্যোগ দেখে লোকে বললে, রাজসূয় যজ্ঞ।

রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই ব'সে সে দিন বংশলোচন এই মন্তব্যের প্রতিবাদ ক'রে বললেন, মূর্খ, মূর্খ, হস্তীমূর্খ সব। রাজসূয় যজ্ঞ! মূর্খ কি আর গাছে ফলে?

সন্তোষবাবু হেসে বললেন, মূর্খ কোন কালেই ফলের বিশেষণ হয় না লচুকাকা, ওটা মানুষেরই বিশেষণ। মধ্যে মধ্যে আবার পণ্ডিত শব্দটা মূর্খের বিশেষণ হয়। লোকে বলে—পণ্ডিত মূর্খ। কিন্তু মূর্খেরা তো খুব মূর্খের মত বাক্যপ্রয়োগ করে নাই। ব্যাপারটা নবগ্রামে রাজসূয়ই বটে।

রাজসূয়ই বটে?—তামাকের নলটা ফেলে দিলেন একজনকে লক্ষ্য ক'রে।—রাজসূয়ই বটে?

অঃ! করলে কি লচুদাদা, একেবারে চোখের কোণে এসে লাগল নলের মুখটা! অঃ! উত্তেজনাবশে নলটা এমন ভাবে ছুঁড়েছেন বংশলোচন যে, সটকার নলটা একেবারে ছোবলমারা সাপের মত গিয়ে বংশলোচনের জ্ঞাতিভাই মহীন্দ্রের মুখে আছড়ে পড়েছে।

বংশলোচন মহীন্দ্রের কথা গ্রাহ্যই করলেন না। বেচারীর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না, বললেন, মরি মরি মরি, একেই বলে উপমায় কালিদাস। হ্যাঁ, তুমি কালিদাস বটে। কালিদাস যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডাল কাটতে শুরু করেছিলেন দেখে রাজ-অনুচরেরা ধ'রে এনে রাজার গৃহ-জামাতা ক'রে দিয়েছিলেন। তোমার বুদ্ধিও কালিদাসের মত, নবগ্রামের রাজচক্রবর্তী-বাড়ির জামাতাও বটে। বলি, বাপধন, এটা রাজসূয় যজ্ঞ হ'লে গোপীচন্দ্র নিশ্চয় যুধিষ্ঠির, এবং কি বলে, মহা অভিমানী শ্রীমান স্বর্ণকে আমার সুযোধন হতে হবে। তা হ'লে তুমি যে মানিক জয়দ্রথ হবে, তার হিসাব রেখেছ? মুণ্ডটি যে কাটা যাবে কুরুক্ষেত্রে!

বাক্‌পটু বংশলোচনের বাক্যভঙ্গিই এমনি। অর্জুন বাণ নিক্ষেপ ক'রে প্রণাম জানাতেন; সে বাণে অঙ্গ বিদ্ধ হ'ত না; বংশলোচনের বাক্যবাণ আঘাতের জন্যই, কিন্তু সেটা ব্যবহারে ব্যবহারে এমনিই ভোঁতা হয়ে গেছে যে, লোককে বিদ্ধ করতে পারে না। সন্তোষবাবু মৃদু হাসলেন। বললেন, আপনার সঙ্গে আমার শ্বশুর সম্পর্ক। আপনি জয়দ্রথ ব'লে যে গালটা

দিলেন, ওটা আমার-গায়ে লেগেছে। মুণ্ড কাটা যাবে ব'লে নয়, শ্যালকপত্নী দ্রৌপদীর প্রতি সে যে আচরণ করতে উদ্যত হয়েছিল, সেটা পিশাচের আচরণ।

তারপর আবার বললেন, ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে, সেটাকে রাজসূয় বলা অসম্ভব মনে হতে পারে। এক কথায় নাকচও ক'রে দিতে পারেন। তুটো যজ্ঞের হিসাবের খাতা বের ক'রে খরচ দেখলেই আমি হেরে যাব। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, উপমা লোকে ঠিকই দিয়েছে। আরব্য-উপন্যাসের গল্পের আকাশমাথা-ছোঁওয়া দৈত্য আর ছোট-বোতলের-মধ্যে-বদ্ধ দৈত্য যদি একই দৈত্য হয়, তবে খরচের যত তফাতই থাক্, দ্বাপরের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসূয়ে আর কলিতে নবগ্রামের হাইস্কুল স্থাপন-উৎসবে স্বচ্ছন্দে তুলনা করা যায়। লচুকাকা, অনুধাবন ক'রে দেখুন— তুটিরই যজ্ঞফল এক। রাজসূয় ক'রে যুধিষ্ঠির হয়েছিলেন রাজচক্রবর্তী, সকল রাজার কাছ থেকে প্রণাম আদায় করেছিলেন। এ যজ্ঞে নবগ্রামে গোপীচন্দ্র হলেন রাজচক্রবর্তী ; প্রণাম সকলকেই করতে হবে। বিশ্বরূপধারী চক্রহস্ত গোবিন্দের মত বেত্রহস্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন সম্মুখে। তাঁকে সেলাম দিতেই হবে, এবং সাহেব সেলামগুলি সহাস্যে গোপীচন্দ্রকে নিবেদন ক'রে দেবেনই। লোকেরা মূর্খ বটে, কিন্তু তারা পণ্ডিতের মত সূক্ষ্ম কথা বলেছে। আর আয়োজন? সে বোধ আপনার না-দেখা নেই। তু বেলাই ওখানে যান, সে আমি জানি।

বংশলোচন সহজে অপ্রস্তুত হন না। তিনি এতেও অপ্রস্তুত হলেন না, এমন কি নিরুত্তরও হলেন না, তেমনি অপ্রতিভ ভঙ্গিতেই বললেন, বাহবা বাহবা! বলেছ ভাল হে। উকিল হতে হ'ত হে তোমাকে। তা বৎস, শিশুপালটি কে হবে? সভায় মাথাটা কাটা যাবে কার?

স্বর্ণবাবু বললেন, আমার দিকে তাকাচ্ছ কি লচুকাকা? আমি তুর্যোধন হয়েই রইলাম। আমার শেষ হবে কুরুক্ষেত্রে। বিনাযুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যগ্র মেদিনী। শিশুপাল! শিশুপালবধ এ যজ্ঞে আগেই হয়ে গিয়েছে, উদ্যোগপর্বেই রাধাকান্তের শিরশ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। কিছু মনে ক'রো না রাধাকান্তদা, কথাটা বোধ হয় খুব বড় হয়ে গেল। কিন্তু যারা রাজসূয়-রাজসূয় বলছে, এও তাদেরই কথা। লোকে বলছে, রাধাকান্তবাবুর মাথাটা কেটে গোপীবাবু ধুলোয় ফেলে দিলেন।

সন্তোষবাবু সত্য বলেছেন। সেটা প্রমাণিত হয়ে গেল। নবগ্রামে এত বড়, এমন অভিনব সমারোহ এবং এত বিপুল ও এমন বিচিত্র জনসমাগম

অন্তত নবগ্রামের ইতিহাসে বহুকালের মধ্যে কখনও হয় নাই। কেউ কেউ বললে, কোন কালেই হয় নাই।

পল্লীর কাহিনীকারেরা কাহিনী বলেন, রাজা-রাজড়ার বাড়ির উৎসব-সমারোহের কাহিনী বলেন—"সে এক মহাসমারোহ, গোটা দেশে সাড়া প'ড়ে গেল, ঘরে ঘরে মানুষেরা দিন গুনতে লাগল। তারপর দিনটি এল। হেলেতে হাল ছাড়লে, জেলেতে জাল ছাড়লে, কুমোরে চাক ছাড়লে, তাঁতিতে তাঁত ছাড়লে, নাপিতে ক্ষুর ছাড়লে, বদ্যি রোগী ছাড়লে, পোয়াতি পো ছাড়লে, বাসী ঘরে ঝাঁটা পড়ল না, শয়নঘরের 'শিজ' উঠল না, উঠোনে 'ছাঁচ' পড়ল না (নিকানো হ'ল না), উনোনে আঁচ পড়ল না; মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো 'দে-দুয়েরী' (প্রতি ঘরে) ছুটল।" এ উৎসবেও তাই হ'ল বলা যায়। আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভিড় ক'রে দেখতে এল। সত্য-সত্যই সেদিন অনেক চাষার হাল বন্ধ থাকল। সেখমপুর গ্রামের কয়েকজন কুম্ভকার এসেছিল, তাদের চাক বন্ধ থাকল। ডেপুটি, সাবডেপুটি, সাবজজ, মুন্সেফ, পেশকার, নাজির, উকিল, মোক্তার, জমিদার, ব্যবসায়ী, কয়েকটি ইস্কুলের হেডমাস্টার নিয়ে জেলার সম্ভ্রান্ত লোকের সে এক বিরাট সভা। আসেন নাই কেবল জজসাহেব। কলকাতার ব্যাবসায়ী এবং গোপীচন্দ্রের ব্যবসায়ে কর্মচারীদের মধ্যে দুজন সাহেব ছিলেন। গ্রামের সকলেই গিয়েছিলেন। সামাজিক রীতির সঙ্গে সভার আসরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্ব হেতু তাঁদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ক'রে তুলেছিল। গোপীচন্দ্র কালো সার্জের চোগা-চাপকান, সাদা সিল্কের প্যাণ্ট, মাথায় কালো পাগড়ি প'রে বসলেন; দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন মানুষটিকে এই পোশাকে সমস্ত সভার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মনোহারিত্বে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল।

কীর্তিচন্দ্রও এই পোশাক পরেছেন; ছোট ছেলে পবিত্র চাপকান পরে নাই, পেণ্টলুন কোট টাই-এর সঙ্গে মাথায় পাগড়ি পরেছে। অমরচন্দ্রের পোশাক খাঁটি সাহেবী, তিনি হ্যাট মাথায় দিয়েছেন। বিরাট জনতা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছিল। থানার কন্‌স্টেব্‌ল, চৌকিদার, জমাদার—এরা সে গণ্ডগোল সংহত করবার চেষ্টায় ঘুরছে, তাদের সঙ্গে ঘুরছে পবিত্রের সঙ্গীরা—মঙ্গল, শূলপানি, ওড়ম্বা, ওদের সঙ্গে অমূল্য ভূপতিও আছে। ওরা দুজনে মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে গোপীচন্দ্রকে গালাগালও দিচ্ছে আবার গোলমাল থামাবারও চেষ্টা করছে। দু-চারজনকে ধাক্কাও দিচ্ছে। সমগ্র জনসমাজ দেখতে পেলে আজ গোপীচন্দ্রের বিরাট রূপের যথার্থ মহিমা।

তিনি যে এতবড় মানুষ—এ কথা লোকে ভাবতে পারে নাই। ডেপুটি, মুনসেফ, উকিল কয়েকজন থেকে আরম্ভ ক'রে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত বক্তৃতা ক'রে বললেন, নবগ্রামের বহু তপস্যার ফলে, এখানকার অধিবাসীদের অসীম সৌভাগ্যের বলেই গোপীচন্দ্রের মত কীর্তিমান সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে এখানে। গোপীচন্দ্রের এ কীর্তি অক্ষয় কীর্তি। নবগ্রাম সে কীর্তিকে বক্ষে ধারণ করে গৌরবান্বিতা হ'ল। আরও অনেক কীর্তিই নবগ্রাম তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এবং সে প্রত্যাশা অচিরে পরিপূর্ণ হবে। কীর্তির্যস্য স জীবতি কীর্তিবলে গোপীচন্দ্র নবগ্রামে অমরত্ব লাভ করলেন।

সাহেব বক্তৃতা করলেন ইংরেজীতে। বাংলা বলতে পারেন না, বেহার প্রদেশের অভিজাত বংশীয় মুসলমান, হিন্দীও ভাল বলতে পারেন না। উর্দু বলতে পারেন, কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে ইংরেজীতে বক্তৃতা করাই বিধি। তাঁর বক্তৃতা অধিকাংশ লোকেই বুঝতে পারে নাই। সে কথা অমরচন্দ্র সাহেবকে জানিয়ে বাংলায় অনুবাদ ক'রে বলবার অনুমতি চাইলেন তাঁর কাছে। সাহেবের অনুমতিক্রমেই অনুবাদ ক'রে দিলেন অমরচন্দ্র অনুবাদ শেষ ক'রেই কিন্তু থামলেন না তিনি। ব'লে গেলেন নিজের কথা। বললেন, আজ আমরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জাতি। অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিমজ্জিত, আত্মকলহে অহরহ মগ্ন এবং মত্ত। পশু অপেক্ষাও অধম হয়েছি আমরা। দেশ-বিদেশ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মন নিয়ে কুসংস্কার বর্জন ক'রে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করছে, তখন আমরা টিকি আন্দোলিত ক'রে পঞ্জিকা খুলে তিথি নক্ষত্র ত্র্যহস্পর্শ দগ্ধা অশ্লেষা মঘা বারবেলা যোগিনী দিক্‌শূল প্রভৃতি বিচারের কচকচি ক'রে চুপচাপ ব'সে আছি। আজ বেগুন খেতে আছে কি না, কাল মুলো খাওয়া নিষিদ্ধ কি না—এই বিচারে ব্যস্ত। ইংরেজকে ছুঁলে আমরা স্নান করি, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কেউ বিলাত গেলে তাকে আমরা পতিত করি। পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে চন্দ্র এসে প'ড়ে সূর্যে ছায়া পড়লে, সূর্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী এসে প'ড়ে চন্দ্রের ছায়া পড়লে, বিশ্বাস করি—রাহু এসে হাঁ করে গিলে ফেলছে সূর্যকে চন্দ্রকে। এমন কি, যে মানুষ মরছে, তাকে আমরা মরবার জন্য, ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে তুলসীতলায় শুইয়ে দিয়ে তার কানে চীৎকার ক'রে বলি—হরি বল, তুমি মরছ। কাউকে কাউকে ঠেলে পাঠিয়ে দিই গঙ্গাতীরে কিংবা কাশীতে। আঁতুড়ের ছেলে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে, আমরা বলি—পেঁচোয় পেয়েছে।

আমাদের বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য, শ্যাওড়াগাছে পেত্নী, অন্য গাছে ভূত থাকে—অশিক্ষা কুশিক্ষার ভূত। এসব থেকে মুক্ত হবার জন্য আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষার। নূতন ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজই আজ শ্রেষ্ঠ জাতি। এতবড় যে ফরাসী জাতি, সে পর্যন্ত তার কাছে পরাভূত হয়েছে তাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করেছে। আমাদের চরম অধঃপতনের সময় বিধাতা যে সেই ইংরেজকে ভারতের সিংহাসন দান করেছেন, এর জন্য আমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দিই। ইংরেজের কল্যাণেই আমরা রেলওয়ে পেয়েছি, টেলিগ্রাফ পেয়েছি, ডাক্তারী শাস্ত্র পেয়েছি, মুদ্রাযন্ত্র পেয়েছি। ইংরেজের কাছে আমাদের অনেক শিখতে হবে। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। শান্তিপূর্ণ ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণে একে একে সে সব করতে পারব আমরা।

গোপীচন্দ্র এই সময় উঠে অমরচন্দ্রের কানে কানে কয়েকটি কথা বললেন।

অমরচন্দ্র আবার বললেন, ইস্কুল হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বোর্ডিং-হাউস স্থাপন করব এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করব। এ বিষয়ে আমরা মহামান্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি, সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সাধুবাদে সমস্ত সভা ভ'রে গেল। সভা শেষ হ'ল। এর পর পান-ভোজন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সাহেবী হোটেলের বাবুর্চিদের ব্যবস্থায় কেউ খেলেন না। সেখানে বসলেন ডেপুটি, সাবডেপুটি, মুনসেফ এবং উকিলেরা কেউ কেউ। কলকাতার ব্যবসায়ীবা সকলেই সেখানে বসলেন। সাবজজবাবু স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেশী ব্যবস্থায় জলখাবার-চায়ের আসরে এলেন। স্বর্ণবাবু আজ অত্যন্ত ধীর। তিনিও বসলেন। বংশলোচন বিলিব্যবস্থা করছিলেন। রাধাকান্ত সাবজজবাবুর পাশে বসলেন, কিন্তু খেলেন না। বললেন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সান্ধ্যকৃত্য না সেরে তো—। একটু হাসলেন।

গোপীচন্দ্র ঠিক এই সময়ে এলেন সেখানে। অতিথিদের আপ্যায়নের প্রয়োজন আছে, সে কথা তিনি ভোলেন নাই। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

দূরে চাষীরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। সন্ধ্যার পর বাঈনাচের আসর বসবে। সে দেখে তবে তারা যাবে।

এবারৎ হাজী সালেবেগকে বললে, সরকার থেকে গোপীবাবুকেই ই ঠেনের রাজা খেতাব দিবে, এমুনি মালুম হচ্ছে মেরজা।

হাঁ। খোদা যাকে রাজা করে, সরকার তাকে রাজা ব'লে মানবে না কেনে, কও? আলবৎ খেতাব দিবে।

খাওয়ার টেবিলে ব'সেই সাহেব ডাকলেন দারোগাকে। মৃদুস্বরে কি বললেন।

দারোগা ব্যস্ত হয়ে এসে রাধাকান্তকে বললেন, সাহেব আপনাকে ডাকছেন। তারপর স্বর্ণবাবুর দিকে ফিরে মৃদু হেসে বললেন, আপনাকেও। ওঁর পরে আপনি যাবেন।

রাধাকান্ত অন্তরে অন্তরে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন। কে জানে, আরও কি ভাগ্যে আছে তাঁর!

ধীরে ধীরে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন সাহেবের সামনে। প্রথামত ঝুঁকে সেলাম করলেন। সাহেব কাঁটায় আটকে এক টুকরো খাদ্যের উপর ছুরি চালাচ্ছিলেন। তিনি মুখ তুলে দেখে আবার মুখ নামিয়ে খাবার টুকরাটা কাটতে মনোনিবেশ করলেন। সে টুকরাটা বেটে আর এক টুকরায় কাঁটা বিঁধলেন।

রাধাকান্ত দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর পা কাঁপতে লাগল। ভয়ে নয়, ক্ষোভে।

সমস্ত লোকের দৃষ্টি গিয়ে তাঁর উপর পড়েছে। বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে যে, সাহেব তাঁকে অপমানিত করবার জন্যই এমন ভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

রাধাকান্ত অবশেষে অধীর হয়ে বললেন, হুজুর, আমি অসুস্থ, আমাকে—

সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, হোয়াট?

সাধ্যমত ইংরেজী ক'রে রাধাকান্ত বললেন, আমি অসুস্থ।

অসুস্থ। হুঁ। তুমি তো রাধাকান্তবাবু?

হ্যাঁ হুজুর, আমিই সেই হতভাগ্য।

হোয়াট? হোয়াট ইজ হটভাগ্যা?

অমরচন্দ্র হেসে ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলেন।

সাহেব বললেন, আইসি। তোমার মন্দ ভাগ্যের প্রতিকার আমার হাতে নেই। আমি দুঃখিত। ওয়েল, তুমি গোপীচন্দ্রবাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ?

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন রাধাকান্ত—তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঝিমঝিম করছে। কণ্ঠস্বরও পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে যেন।

ব্যস্ত হয়ে গোপীচন্দ্র এগিয়ে এলেন, বললেন, হ্যাঁ সার্, উনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

সাহেব কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পূর্বেই রাধাকান্ত বললেন—তাঁর অসহনীয় ক্ষোভ বোধ হয় মাত্রা অতিক্রম করেছিল—বললেন, আপনার সামনে সর্বজন-সমক্ষে আবার আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনি রাজপ্রতিনিধি, পৃথিবীতে দেবশক্তির পরই প্রবলতম শক্তি—রাজশক্তি, সেই শক্তির বলে আপনি যখন আদেশ করছেন, তখন আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি কোনও অন্যায় করেছি ব'লে মনে করি না। কিন্তু আপনার আদেশ অমান্য করবার মত শক্তি আমার নাই—সাহস আমার নাই। গোপীচন্দ্রবাবু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রাধাকান্তের কণ্ঠস্বরে, তাঁর শেষ কথা কয়টিতে সমস্ত সমারোহের উল্লাসের সুর যেন কেটে গেল। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিস্মিত বিস্ফারিত নেত্রে সকলে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। রাধাকান্ত টলছিলেন। টলতে টলতেই সেলাম ক'রে তিনি বেরিয়ে আসবার জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু শক্তি নাই যেন তাঁর। তিনি খুঁজছিলেন একটি আশ্রয়—কারও সাহায্য। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কেউ উঠল না—কেউ হাত বাড়াল না। স্বর্ণবাবু পর্যন্ত না।

রাধাকান্ত আত্মবিস্মৃত হয়ে ডাকলেন, গৌরীকান্ত! গৌরী!

অকস্মাৎ দূরে সমবেত জনতার মধ্য হতে দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ কিশোর দ্রুতপদে এগিয়ে এসে রাধাকান্তের হাত ধ'রে বললে, শরীর কি খুব খারাপ বোধ হচ্ছে দাদা?

রাধাকান্ত বিহ্বলের মত প্রশ্ন করলেন, কে?

আমি কিশোর।

আঃ, ধর তো ভাই হাত।

তিনি বেরিয়ে গেলেন। সকলে নিষ্পলক হয়ে ব'সে রইল, শুধু দৃষ্টির সঙ্গে চোখের তারা দুটি রাধাকান্তের অনুসরণ-প্রচেষ্টায় তিল তিল ক'রে তির্যক ভঙ্গীতে স'রে স'রে যাচ্ছিল।

শুধু একজন উঠল—সে ডাক্তার।

* * * *

বাড়িতে এসে রাধাকান্ত বললেন, এইবার আমি সুস্থ হয়েছি। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমাকে ভাবতে দাও। কেউ না—কেউ না। কাশীর বউ, তুমিও না।

বহুক্ষণ টেবিলের উপর মাথা রেখে তিনি ব'সে রইলেন।

তারপর টেনে নিলেন নিজের ডায়রি।

গৌরীকান্তকে সম্বোধন ক'রে আজকার বিবরণ লিখে শেষ করলেন। তারপর আবার লিখলেন—"নবগ্রাম দশমহাবিদ্যার মত এক হতে আর এক রূপ গ্রহণ করছে। গোপীচন্দ্রের সেবায় মা বোধ হয় ভুবনেশ্বরী রূপ গ্রহণ করছেন। শেষ রূপ 'কমলারূপ' কবে কার সেবায় গ্রহণ করবেন কে জানে?"

বহুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে হঠাৎ তিনি উঠে এসে দাঁড়ালেন বাইরের বারান্দায়। অন্ধকার সমস্ত। গ্রাম নিস্তব্ধ। কোলাহল ভেসে আসছে গোপীচন্দ্রের কীর্তিস্থল ওই প্রান্তর থেকে। সেখানে এখন বাঈনাচ হচ্ছে। হাসলেন তিনি।—মা মুখ ফেরালেন আজ। এর পর গ্রামের কলরব ওখানে ভেসে গিয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনের সাড়া তুলবে না। ওখানকার সাড়া এসেই এখানকার স্তিমিত পল্লীর মানুষদের অভয় দেবে। যুগ চ'লে যাবে। আবারও পরিবর্তন ঘটবে। কে ঘটাবে? তিনি থাকবেন না। তাঁর বংশ? তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার হাসলেন। মায়া! বংশের মায়া!

জীবন-যুদ্ধে পরাজিত রাধাকান্ত মায়াবাদের আশ্রয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলেন অন্ধকারের দিকে চেয়ে। হঠাৎ আবার একটা কলরব ভেসে এল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ফিরে এলেন। ডায়রি খুলে লিখলেন—

"মৃত্যুর রূপ অন্ধকার। শাস্ত্রেও বলিয়া থাকে, মনে মনে যুক্তির দ্বারাও তাই অনুভব করি। কারণ মৃত্যুর অন্যতম লক্ষণ দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি। মৃত্যুর স্পর্শ গাঢ়তম হিমবৎ। কারণ মৃত্যুর লক্ষণে দেহ হিমবৎ শীতল হইয়া যায়।

"রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে সে স্পর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠে। চণ্ডীর মধ্যে আছে, কালরাত্রিরূপে মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে দেখা দিয়াছিলেন। তবে কি—? মৃত্যুর কায়া না হোক, রাত্রি মৃত্যুর ছায়া। মৃত্যু সম্ভবত দিনান্তে পৃথিবীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার ছায়া পড়ে পৃথিবীর উপর। সেই রাত্রি। আজ রাত্রিকে কাঁপিতে দেখিলাম। অন্যে দেখিয়াছে কি না জানি না, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। শব্দতরঙ্গ বহিয়া গেল। রাত্রি কম্পিত হইল। ছায়া কাঁপিল, ছায়া যখন কাঁপিল, তখন নিশ্চয় কায়াও কাঁপিয়াছে। জীবনের জয়ধ্বনিতে মৃত্যু কি কম্পিত হয়?"

ভাবপ্রবণ রাধাকান্ত ভাবাবেগের এই বিচিত্র সান্ত্বনাকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত রাত্রি স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

কাশীর বউ বললেন, শোবে না ?

না। একটু চিন্তা করছি।

শোন—

কি ?

একটু চুপ ক'রে থেকে কাশীর বউ বললেন, একটা কাজ করবে ?

কি ?

এখানে একটা মেয়েদের ইস্কুল আর একটা লাইব্রেরি কর। একা না হয়, দশজনে চাঁদা ক'রে কর।

গভীর রাত্রি তখন।

কাশীর বউ ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর পাশে গৌরীকান্ত ঘুমুচ্ছে।

রাধাকান্তের বিছানা স্বতন্ত্র। গৌরীকান্তের জন্মের পর থেকেই তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঘুমের অভিনয় করেছেন। কাশীর বউ মাথার শিয়রে ব'সে ছিলেন, বাতাস করছিলেন। সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য তন্দ্রাও এসেছিল। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে উঠেছিল, সেই দেখেই কাশীর বউ পাখাখানি রেখে অত্যন্ত সন্তর্পিত ভাবে উঠে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়েছিলেন। গৌরীকান্তও ঘুমের ঘোরে হাত বাড়িয়ে তাঁকে খুঁজছিল ; তাঁকে না পেলে হয়তো উঠে পড়বে, ভয় পেয়ে কেঁদেও উঠতে পারে—এই আশঙ্কাতেই তিনি স্বামীর শিয়র ছেড়েছিলেন, নইলে হয়তো উঠতেন না। বিছানায় উঠে গিয়েও গৌরীর গায়ের উপর হাত রেখে ব'সে ছিলেন ; রাধাকান্তের ঘুম ভাঙে কি না লক্ষ্য করছিলেন। রাধাকান্ত ছিলেন গাঢ় চিন্তায় মগ্ন। হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে মানুষ মগ্ন হয় যেমন ভাবে, তেমনই ভাবে নিস্পন্দ হয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। তার সঙ্গে অভিপ্রায়ও ছিল, এ ভাবনার কথা তিনি স্ত্রীকে জানতে দেবেন না। অমর্যাদার প্রচণ্ড আঘাতে অভিমান তাঁর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত একটি প্রশ্নই তাঁর অন্তরলোকে ধ্যানের অনন্ত অসংখ্য প্রতিধ্বনি তুলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "এ অপমানিত জীবনে প্রয়োজন কি ?" "প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন কি ?" সে প্রতিধ্বনির যেন শেষ নাই।

কয়েক দিন আগেও তিনি গৌরীকান্তকে বুকে ক'রে কাশীর বউকে বলেছিলেন, আমার জীবনের সমস্ত হবি আহুতি দিয়ে গৌরীকান্তের জীবন

হোমাগ্নির মত প্রজ্বলিত করব আমি। কিন্তু আজ সে সংকল্পও ভেঙে গিয়াছে। জীবনে আর আশা নাই, ভরসা নাই—চারিদিক নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ভ'রে উঠেছে, তার যেন পারাপার নাই, এ যেন অনন্ত রাত্রি, দিগন্ত নাই, উদয়াচল নাই ; পারাপারহীন তমসার মধ্যে তাঁর ইষ্টদেবতা পর্যন্ত নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছেন মাটির প্রতিমার মত। শুধু থরথর ক'রে অন্তরে অন্তরে কাঁপছেন তিনি।

তিনি উঠলেন।

অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুললেন। বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন পথের উপর। একবার আকাশের দিকে চাইলেন। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

নিস্তব্ধ সুষুপ্ত সারা গাঁ।

নবগ্রামের মানুষ আজ প্রত্যাশার সুখস্বপ্ন দেখছে। কর্মজীবনেব নূতন তোরণ-দ্বার মুক্ত হ'ল আজ। তারা স্বপ্ন দেখছে, ওই তোরণ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎপুরুষেরা চলবে রাজপথের দিকে—জীবনের মহানগরের দিকে। শুধু তিনি লাঞ্ছিত হয়ে গৃহত্যাগ ক'রে চলেছেন। হয়তো স্বর্ণও আজ বিনিদ্র হয়ে রাত্রিযাপন করছে। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। মনকে সংযত করলেন। মনে মনে বললেন, তোমার কল্যাণ হোক গোপীচন্দ্র, তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর ; তোমার আক্রোশ বিদ্বেষ বিদূরিত হোক। নবগ্রাম নবজীবন লাভ করুক তোমার তপস্যায়।

মনশ্চক্ষে তিনি স্পষ্ট দেখলেন নবগ্রামের গ্রামলক্ষ্মীকে। তিনি রাজ-সিংহাসনে বসেছেন, গোপীচন্দ্র তাঁকে চামর ঢুলিয়ে বাতাস দিচ্ছে।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল, একটা বিচিত্রশব্দ সর্পিল কিছু, সরীসৃপ-জাতীয় কিছু অত্যন্ত দ্রুত চ'লে আসছে। সামনের দিক থেকে আসছে। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলেন বাইসিক্ল আসছে। তিনি পাশের বাড়ির অন্ধকারে আত্মগোপন করলেন। সম্ভবত গোপীচন্দ্রের বাড়ির কেউ। তাঁর বাড়ির তো সকলে জেগে থাকবেই। তাদের ঘুমুলে চলবে কেন? আজ অনেক অতিথি তাঁর বাড়িতে। সভাশেষে সন্ধ্যায় বাঈনাচ হয়েছে। এখনও তার জের চলছে।

হয়তো কোন বরাত নিয়ে কেউ বাড়ি থেকে স্কুলডাঙার দিকে চলেছে।

অত্যন্ত দ্রুতপদে গাড়িখানা বেরিয়ে গেল।

মৃদুস্বরে গান গেয়ে চলেছে আরোহী।

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন তিনি। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে

গিয়েছিল, দেখলেন, দীর্ঘদেহ তরুণ চলেছে। কিশোর! এ তো কিশোর।

কিশোর জেগে রয়েছে এত রাত্রে? এত দ্রুতবেগে সে কোথায় চলেছে? বিস্মিত হলেন তিনি।

কিশোর চ'লে গেল, মিলিয়ে গেল, মিশে গেল যেন।

তিনি আবার চলতে শুরু করলেন।

কোথায় গেল কিশোর? পিছন ফিরে আর একবার দেখলেন। সম্ভবত সাত মাইল দূরবর্তী স্টেশনে গেল ট্রেন ধরতে।

তিনি চলেছেন হাঁটা-পথে। গ্রাম পার হয়ে এসে দাঁড়ালেন। গ্রাম-দেবতার, একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ অট্টহাসের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে প্রবেশ ক'রে দেবতাকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে গেলেন, পথে পথে গ্রামকে পিছনে রেখে। ধূলিসমাকীর্ণ প্রান্তর। এ দিক দিয়ে মানুষ আজকাল বড় একটা হাঁটে না। সেই প্রান্তরের উপর তাঁর বলিষ্ঠ পায়ের ছাপ ফুটে রইল। কিন্তু তাঁর সন্ধান পাবে কি? এদিকে আসে না কেউ। সে ভাবনা তিনি ভাবেন নি। তবে এটা ভেবেছিলেন যে, সকালে উঠে সকলেই তাঁর সন্ধানে ছুটবে কিশোর যে পথে গিয়েছে সেই পথে। এ পথে কেউ সন্ধান করবে না। এ পথে গ্রাম থেকে যায় সাধারণত শবদেহ নিয়ে শ্মশানে, বা দশ ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গাতীরের ঘাটের পাশের শ্মশানে। তিনি সেই পথে চললেন। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে।

তেরো

শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে কাশীর বউ নিজের বিছানা থেকেই খাটের দিকে তাকালেন। ঘরের কোণে হ্যারিকেন জ্বলছিল ক্ষীণ শিখায়, তার উপরে একখানা বই খুলে সে দীপ্তিটুকুকেও ঢেকে দেওয়া হয়েছিল, উপরের ছাদে প্রতিফলিত আলোর আভা ঘরের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অস্পষ্ট হ'লেও দেখা যায় সমস্ত কিছু। চমকে উঠলেন কাশীর বউ। খাটের বিছানা শূন্য; স্বামী নাই। তিনি চকিতে উঠে বসলেন। শূন্য বিছানা। দরজার দিকে তাকালেন, দরজা খোলা। মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন, কি ঘটেছে! পরক্ষণেই শিউরে উঠলেন, চরমতম দুর্ভাগ্যের আশঙ্কা মনের ভিতর জেগে উঠল।

আত্মঘাতী ? মনের মধ্যেও প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত উচ্চারিত হতে গিয়ে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীর বিছানার কাছে এসে বালিশ ওল্টালেন। কিছু নেই সেখানে ; ছুটে গেলেন দেওয়ালের কাছে, তলোয়ারখানা তেমনিই ঝুলছে, কোণে বন্দুকটা যথাস্থানে রয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দরদালানে, তাকালেন ছাদের কড়ির দিকে ; সেখান থেকে ছুটে গেলেন ছাদে ; ছাদ থেকে নেমে দ্রুতপদে নেমে গেলেন নিচের তলায় ; নিচের তলায় দরদালানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ; সামনেই দরদালানের দরজা খোলা, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে উঠানের ওদিকে বাড়ির সদর দরজাও খোলা হাঁ-হাঁ করছে। আর কোন সন্দেহ রইল না তাঁর। আত্মঘাতী তিনি হন নি, নবগ্রাম ছেড়ে চ'লে গেছেন। কাশীর বউ মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেলেন। দরদালানের দরজাব বাজুটা ধ'রে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কতক্ষণ তা তাঁর খেয়াল ছিল না। নিচের তলায় ওদিকের ঘর খুলে কে বেরিয়ে চমকে উঠে শঙ্কিত প্রশ্ন করলে, কে ? কে ওখানে ?

ষোড়শী। ষোড়শী বেরিয়েছে ঘর থেকে। সে আবার প্রশ্ন করলে, কে ? মা ?

কাশীর বউ এবার সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, হ্যাঁ।

কি মা ? বাবা কেমন আছেন ? এই বাত্রে ? এখনও যে খানিকটা রাত্রি রয়েছে গো।

কাশীর বউ ভেবে পেলেন না কি উত্তর দেবেন। নীরবে সদর-দরজার ওপাশে বাইরের পৃথিবীর গাঢ় অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন।

ষোড়শী আবার প্রশ্ন করলে, মা ? কি হ'ল মা ?

কাশীর বউয়ের মুখে এসে গেল কথাটা, বললেন, বাবু কাশী গেলেন মা। ভোরের ট্রেন ধরবেন।

ষোড়শী এবার খোলা দরজার দিকে তাকালে। তারপর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে, কাশী !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কাশীর বউ। বললেন, যে কষ্টের উপায় মানুষের হাতে নেই, সেই কষ্ট যখন মানুষ পায় তখন ভগবানের আশ্রয় ছাড়া মানুষ পরিত্রাণ কি ক'রে পাবে মা ?

ষোড়শীও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, তা ভালই

করেছেন মা। শুধু তো ভগবানই নয় মা, শ্বশুর-শাশুড়ী—এঁরাও মা-বাপের তুল্য, তাঁদের কাছে গিয়েও জুড়োবেন তিনি।

তারপর সে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্রুদ্ধ কঠিন স্বরে ব'লে উঠল, অমনি ক'রে মানুষটাকে যারা এতবড় অপমান করলে মা—

অগ্নিশিখার স্পর্শে বারুদের মত জ্বলে উঠে ফেটে পড়লেন কাশীর বউ। আকাশের দিকে তাকিয়ে নিম্ন কঠিন স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, সে অপমান দেনার মত আমার স্বামী-পুত্রের ঘাড়ে বোঝার মত চেপে রইল। শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে বোঝা সুদ চেপে আরও ভারী হোক, বাড়ুক। শোধ যদি করতে না পারে, তবে তারই চাপে তাদের মৃত্যু হোক। ভগবানের কাছে বিচার আমি চাইব না।

কাশীর বউয়েব চোখের তারা দুটি পিঙ্গল, অন্ধকারে তাঁর চোখের পিঙ্গলতা প্রদীপ্ত হয়ে উঠে সত্য সত্যই জ্বলে উঠল।

অকস্মাৎ যে কথাটা তাঁর মুখে এসে গিয়েছিল. যে কথাটা তিনি ষোড়শীকে বলেছিলেন, সে কথাটা যেন ভগবান তাঁকে যুগিয়ে দিয়েছেন ব'লে কাশীব বউয়েব মনে হ'ল। মিথ্যা তাঁর বলা হয় নি, অথচ মর্মান্তিক লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হয়ে তাঁর গৃহত্যাগের লজ্জা, সে লজ্জাও ঢাকা পড়বে। কাশী তাঁর বাপের বাড়ি, লজ্জায় বেদনায় পীড়িত হয়ে রাধাকান্ত কাশী গিয়েছেন, শ্বশুর-বাড়িতে উঠেছেন। অপমানেব ভয়ে গেরুয়া প'রে ঘর ছেড়ে পালানোর অপবাদ থেকে রক্ষা পাবেন রাধাকান্ত, এবং কাশীর বউ নিজেও রক্ষা পাবেন স্বামী-পরিত্যক্তার লজ্জা থেকে। মর্মান্তিক বেদনার মধ্যেও তিনি লোকলজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ পেয়ে বুকে খানিকটা বল পেলেন। ভোরবেলা হতেই তিনি বাইরের বাড়িতে গিয়ে চাকর বিষ্টুকে ডেকে তুলে বললেন, বাবা বিষ্টু, উনি কাল রাত্রে কাশী গেছেন। ফিরতে তাঁর কিছুদিন দোর হবে। বাবুরা সব আসবেন, চা ক'রে দিয়ো তাঁদের, আর কথাটা ব'লে দিয়ো, হঠাৎ মনস্থির করলেন, বললেন—এই রাত্রেই যাব আমি। তোমাদের কাউকে পর্যন্ত ডাকলেন না. ডাকতে দিলেন না।

বিষ্টু অবাক হয়ে গেল। শুধু বলল, একা গেলেন ইষ্টিশান? হেঁটে গেলেন তিন কোশ পথ?

তাই গেলেন বাবা। বললেন—আমি বিশ্বনাথের পায়ে জুড়োতে যাচ্ছি,—আমি হেঁটেই যাব, এক কাপড়েই যাব, সেখানে গেলে তো অভাব কিছুর হবে না; শ্বশুরমশায় আছেন। বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন।

বিষ্টুর দৃষ্টিতে প্রশ্ন উদ্যত হয়ে উঠেছে। দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। মুহূর্তে অভিমান জেগে উঠল স্বামীর উপর। মনে মনে বললেন, এ কি অবস্থায় ফেলে গেলে আমাকে ? কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। রুদ্ধ আবেগ সংযমের বাঁধ ভেঙে তাঁকে অধীর ক'রে তুললে, আব কোন কথা বলতে পারলেন না। দ্রুতপদে বাড়ি ফিরে এলেন, যেন পালিয়ে এলেন বাইরের পৃথিবীর সম্মুখ থেকে। বাড়ি ফিরে উপরে উঠে গিয়ে স্বামীর বিছানার উপর মুখ গুঁজে লুটিয়ে পড়লেন। বিছানায় এখনও তাঁর গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন তিনি।

গৌরীকান্ত বিছানায় জেগে উঠেছিল। সে ডাকলে, মা !

কাশীর বউ ঘাড় নাড়লেন, না—না।

সম্ভবত বললেন—ডাকিস নে, এখন ডাকিস নে।

* * * *

দশ দিন পরে পত্র পেলেন কাশীর বউ। রাধাকান্ত দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। লিখেছেন, "এ ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। নবগ্রামে বাস করিয়া এই অপমানিত জীবন বহন করিবার মত শক্তি বা ধৈর্য আমাব নাই। আমি কাপুরুষ, আমি দুর্বল, আমি অযোগ্য আমি অক্ষম। তবু পরমপিতার অসীম দয়াগুণে আত্মঘাতী হওয়ার মতিচ্ছন্নতা হইতে রক্ষা পাইয়াছি। গৃহত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসিয়া গঙ্গাতীরে 'এক-পা'-বাবার আশ্রমে কয়েকদিন বাস করিলাম। তাঁহার কৃপায় সান্ত্বনা কতকটা পাইয়াছি। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন।"

'এক-পা'-বাবাকে কাশীর বউও জানেন। এখান হতে পনেরো-ষোল ক্রোশ উত্তর-পূর্বে গঙ্গার তটভূমিতে তাঁর আশ্রম। এ অঞ্চলে 'এক-পা' বিখ্যাত সন্ন্যাসী। একটি পা অকর্মণ্য ব'লে তাঁকে লোকে বলে—'এক-পা'-বাবা। প্রবাদ—দীর্ঘকাল 'এক-পদ' হয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরারাধনা করার ফলে একটি পা তাঁর পাকিয়ে গেছে। কাঠের একটা ঠেঙো বগলে লাগিয়ে তিনি চলাফেরা করেন। পায়ের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু হাসেন, কোনও জবাব দেন না। পূর্বে পূর্বে তিনি বৎসরে এক-আধবার নবগ্রামের মহাপীঠে তীর্থভ্রমণে আসতেন। রাধাকান্তের সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগের জন্য তাঁর বাড়িতে আতিথ্যও গ্রহণ করতেন। কাশীর বউকে তিনি বড় স্নেহ করতেন। তার হেতু, কাশীর বউ সুন্দর হিন্দী বলেন এবং ছাতু-ভরা রুটি তৈরী করেন চমৎকার। পশ্চিম-প্রদেশের লোক কাশীর বউ জানেন, সন্ন্যাসীর বাস ছিল লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর কাছাকাছি—তাঁর উর্দু ভাষার বুলি

শুনে তিনি অনুমান করেছিলেন। ইদানীং প্রায় আট-দশ বৎসর তিনি আর নবগ্রামে আসেন নাই। বয়সের জন্য আসতে পারেন না। এ অঞ্চলে তাঁর বয়স সম্পর্কে অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত। লোকে বলে—তাঁর বয়স আড়াই শো। যাঁরা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও বলেন—নব্বুই-পঁচানব্বুই হবে। বিচিত্র মানুষ 'এক-পা'-বাবা। রাধাকান্ত কতবার তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, আমার এ দুর্ভাগ্যের কবে অন্ত হবে বলতে পারেন বাবা? 'এক-পা'-বাবা উত্তর দিয়েছেন, উ হামি জানে না বাবা। সেরেফ্ একটি বাত হামি জানে। দিন আসে, উ যায়; ফিন দিন আসে বাবা, উসকে সাথ সব কুছ বদল যায়। বাস্। হেসে বলতেন, হামি বাবা দিল্লীকে বাদশাকে দেখিয়েসি, শাহনশা বাদশা দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। বিচিত্র হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠত, বলতেন, বাদশাকে আম-দরবারে তখ্ত-তাউসে বসতে দেখেছি। শেষ বাদশা। আবার দেখেছি বাবা তাঁর দুই ছেলেকে ফিরিংগী ইংরেজ খুন ক'রে দিল্লীর রাস্তায় দু দিন ধ'রে রেখে দিলে। তাদের সৎকার করতে দিলে না। নিজের চোখে দেখেছি বাবা। তারপর শুনেছি, বাদশাকে ধ'রে পাঠিয়ে দিলে রেঙ্গুন। বাবা, মুসলমানের বাদশাহী গেল। চোখে দেখলাম, আংরেজ ভারতকে রাজলক্স্মীকে নিয়ে কলকাতা চালান করলে, তাও চোখে দেখলাম। ওহিসে আমার মালুম হয়ে গিয়েসে বাবা কি, দিন যাতা হ্যায়, উসকে সাথ সব কুছ বদল যাতা হ্যায়। বাস্। চুপ ক'রে ধৈর্য ধ'রে থাক, বদলে সবই যাবে। তবে তোমার ভাগ্য ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা আমি জানি না।

রাধাকান্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন এ কথা শুনে। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, তা হ'লে বাবা, এ সংসারে পূর্বজন্মের কর্মফলের কি খণ্ডন নাই? ভগবানকে ভজনা ক'রে, ধর্মকে আশ্রয় ক'রে থেকে মানুষের ইহজন্মে কি কোন ফল নাই?

'এক-পা'-বাবা হেসে বলেছিলেন, তুই যে বাবা এমন ফুলবাগান করেছিস, ওতে কোন ফল ফলে বাবা? ভগবানকে ভজনা, ধরমকে আশ্রয় ও দুটোই হ'ল ফুলবাগিচার গাছ। ওতে ফল হয় না। ওর রঙের বাহারে, খুসবয়ের আরামে খুশি হওয়াটাই সব। আরও একটু আছে, মধু আছে বাবা। সে মধু মৌমাছিতে সংগ্রহ ক'রে চাক বাঁধে, তখন চাক ভেঙে এনে সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু গুরুগিরি তো তুই করতে পারবি না বাবা।

রাধাকান্ত তবুও ক্ষান্ত হন নাই, প্রশ্ন করেছিলেন, ফুলের গাছ ফল দেয় না বাবা, কিন্তু বীজ তো তার আছে!

আছে বাবা, আছে। আছে, জরুর আছে। এইবার তুই ঠিক ধরেছিস। ফুল গন্ধ দেয়, কিন্তু বীজ রেখে যায়। আঁটির মধ্যে বীজ, ফুল থেকে হয় পাপড়ির গোড়ায় বীজ। সে বীজ তোর থাকবে বাবা। তোর চরিত্র—তোর পিপাসা পাবে তোর লেড়কা।

এমনি ধাবার অনেক আলোচনা তাঁর সঙ্গে হ'ত। বড় ভাল লাগত কাশীর বউয়ের। তাঁর উপর 'এক-পা'-বাবার স্নেহ গভীর। তিনি বলতেন, বেটিয়া, আগে এখানে আনতাম শুধু চণ্ডীমায়ীকে দর্শন করতে। এখন আরও একটা টান বেড়েছে মা। সন্ন্যাসী হ'লে কি হবে, মানুষ তো। তোর হাতের ওই যে সত্তু ভরা রোটি—ওই খাবার জন্যেও আসি। যখনই মনে করি, চণ্ডীমায়ীব দববাবে যাব, তখনই মনে পড়ে বেটিয়ার হাতের পাকানো রোটি। আর কাশীব ভাষা-বুলি সে বড় মিঠে লাগে মা। বাঙ্গালা বুলি মিঠে আছে মা, তবে সে কি হামার দেশের বুলির মত মিঠি!

ব'লেই বলতেন, গোস্যা করিস নে যেন মায়ী।

কাশীব বউ একবার তাঁকে বলেছিলেন, বাবা, আমি কখনও আপনাকে অদৃষ্ট ফিরিয়ে দেবার জন্মে বলি নে। কিন্তু আমাব স্বামীর মনের দুঃখ মধ্যে মধ্যে অসহ্য হয়ে ওঠে বাবা। যত মন্দ হোক, আমাকে যদি ব'লে যান—

'এক-পা'বাবা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বেটী, আমার কথা বিশ্বাস করবি?

আপনাকে কখনও অবিশ্বাস করেছি বাবা?

করিস বইকি মা। আমি যা জানি, যা বুঝি, তা তো বলি, বার বার বলেছি। কিন্তু তোরা তো মনে করিস, আমি জানি, বলি নে। আমি অদৃষ্ট গুণতে জানি না, আমি অদৃষ্ট ফেরাতেও পারি না। দেবতা বল, ভগবান্ বল, কারও দেখা পাই নি। 'ভাল হোক' ব'লে আশীর্বাদ করলেই ভাল হয় না মা। বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, সেও আমার এতটুকু। বেদ পড়ি নি, শাস্ত্র পড়ি নি, পড়বার মধ্যে পড়েছি তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস। আর গুরুর মুখে শুনেছি জ্ঞেয়ান, উপদেশ। বাস্। বেটী, ঝুট বাত বলি না। আমার এই যে পাঁও, এইটে যে এমন ভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—লোকে বলে, এক পাঁও পর খাড়া হয়ে আমি ভগোয়ানের তপস্যা করেছি, তাইতে এটার এমন দশা। আমি হাসি, হ্যাঁ বলি না, না বলি না; বলার রুচি নাই, তাই বলি না। ব'লে ফ্যাসাদ বাড়ে, তাই বলি না; তোর কাছে বলছি মা,

তপস্যা আমি করি নাই ; ওই তোর স্বামীর মতই মনের আগুনে পুড়ছিলাম, হঠাৎ একদিন—

বলতে গিয়ে থেমে পড়েছিলেন 'এক-পা'-বাবা। কিছুক্ষণ পর হেসে বলেছিলেন, বেটী, সে কথা সংসার ত্যাগ ক'রে গুরুকে বলেছিলাম, আর কাউকে বলি নি। গুরু বলতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন—বেটা, তোর দুঃখ তোর থাক্, কাউকে বলিস না কখনও। মানুষকে বললেই ভগবানকে বলবার জন্যে তোর বাসনা তোলপাড় করবে। ভগবান কারও দুঃখ ঘোচান না, কারও বোঝা তিনি মাথায় তোলেন না। তিনি মনের মধ্যে আসেন, তাতেই দুঃখ ঘুচে যায়, তাতেই শান্তি পায় মনে। দুঃখ ঘোচাতে এস—ব'লে ডাকলে তিনি আসেন না। দুঃখ ভুললে তিনি আসেন। তোর স্বামী তাকে দুঃখ ঘোচাবার জন্যে ডাকে, তাই সেও আসে না, দুঃখও ঘোচে না। ও দুঃখ পাবে, অনেক দুঃখ পাবে। ওর ধরম আছে, করম নাই। সংসারের দুঃখ যদি ঘোচাতে চায়, তবে করম করতে বল্।

দীর্ঘকাল হয়ে গেল—আট-দশ বৎসর 'এক-পা'-বাবা এ দিকে আসেন নাই।

রাধাকান্ত পথে বেরিয়ে স্টেশনের পথ ছেড়ে হাঁটা-পথ ধরেছিলেন। স্টেশনের পথে গ্রামের মুখে ইস্কুলডাঙা ; সেখানে সেদিন রাত্রে তখন সমারোহ চলছিল। বাঈনাচ হচ্ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ জনতার সৃষ্টি ক'রে সরকারী পাকা রাস্তার উপর পর্যন্ত আসর জমিয়ে ব'সে ছিল। আসরে জ্বলছিল গ্যাসেব আলো অর্থাৎ কারবাইডের আলো। রাধাকান্ত হাঁটা-পথে পূর্বমুখে চলতে শুরু করেছিলেন, কোথায় যাবেন স্থির ছিল না। শুধু লজ্জায় ক্ষোভে নবগ্রাম ত্যাগ ক'রেই চলেছিলেন, কোথায় শান্তি, কোথায় প্রতিকার—এ প্রশ্নও মনে ওঠে নি। কিছু দূর যাবার পর মনে প্রশ্নটা উঠল। উদয়দিগন্তে তখন আলোর আভাস জাগতেও শুরু করেছে। মনে পড়ল 'এক-পা'-বাবার আশ্রমের কথা। এই দিকে—এই তাঁর আশ্রমের পথ। দিনে গ্রামে আশ্রয় নিয়ে, রাত্রে আবার হাঁটতে আরম্ভ ক'রে ভোরবেলা তাঁর আশ্রমে এসে পৌঁছেছিলেন।

রাধাকান্ত লিখেছেন, "বাবা আমার মুখ দেখিয়াই অন্তর্যামীর মত বলিলেন—'কি বাবা, পূর্ণ হয়ে গেল দুঃখের বোঝা? ভার বইতে আর পারলি না? পালিয়ে এলি?' আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলাম। তিনি বলিলেন—'দুঃখের বোঝা মাথা থেকে ফেলে দিয়েছিস, এইবার তাঁকে

পাবি বুকের মধ্যে, সুখও পাবি সঙ্গে সঙ্গে।' আমি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। তাঁহার চোখ দুইটা প্রখর হইয়া উঠিল। তিনি বললেন—'বেটা, তোর অপমানের দুঃখ বুঝতে আমি পারছি। তোকে আজ আমার শিষ্য ক'রে নিলাম, তাই তোকে বলি, তোর চেয়ে অনেক বেশি অপমান আমি সহ্য করেছি। শুন্ রে বেটা, আমি ছিলাম রাজার ঘরের ছেলে। ছোট রাজ্য অবিশ্যি। দিল্লীর নগিজে ছিল আমার বাদশাহী সনদের জায়গীর। ফিরিঙ্গী আংরেজ আমার বাবার জায়গীর নিলে কেড়ে। দোষ কি? না, বাবা গুলি চালিয়েছিলেন এক বেয়াদপ আংরেজ কাপ্তেনের উপর। শিকার করিতে গিয়ে উহ্ কাপ্তেন বাবাকে খারাপ গালি দিয়েছিল। জায়গীর গেল, বাবা অপমান সইতে না পেরে মারা গেলেন; আমি গেলাম আংরেজ দপ্তরে আমার তনখার জন্যে। সে যে বেইজ্জতি করেছিল আমাকে, সে মনে হ'লে রাধাকান্ত, আজও আমার বুকে আগ্ জ্ব'লে যায়। তোর মত আমি ভগোয়ানকে ডাকতে শুরু করলাম, বললাম, হে ভগোয়ান, তুমি তো পাপের দমন কর, তুমি তো আসবে একদিন বিলকুল বিধর্মী লোককে কোতল করবার জন্যে, ধরমকে রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে, কিন্তু ততদিন কি আমি বাঁচব! তুমি এস। তুমি এস। গনৎকার বললে—দিন এসেছে। শও বরিষ পূর্ণ হয়ে গেল কোম্পানির রাজ্যের। ওদের অত্যাচার উঠেছে চরমে। দাঁতে টোটা কাটিয়ে হিন্দু-মুসলমান সবারই ধরম নাশ করতে চাইছে। তোমরা সব উঠে পড়ে লেগে যাও। বাস্, তিনিও দেখা দেবেন। আরম্ভ হ'ল মিউটিনি। রাধাকান্ত, ওহি মিউটিনিতে আমার পায়ে লাগল গুলি। প'ড়ে রইলাম জখম হয়ে। ওদিকে আংরেজ মিউটিনি দমিয়ে দিলে। খুঁজতে লাগল আমাদের মত লোককে, ধ'রে ধ'রে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে। জখম পা নিয়ে পালিয়ে গেলাম, লুকিয়ে রইলাম জঙ্গলে, জঙ্গল থেকে পাহাড়, সেখান থেকে আর একখানে। পা উঠল ফুলে, প্রচণ্ড জ্বর। সেই অবস্থায় দেখা হ'ল গুরুর সঙ্গে। তিনিই আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা করলেন। তিন মাস পরে পায়ের ঘা শুকাল, সঙ্গে সঙ্গে পা খানাও শুকিয়ে গেল। আমার গুরুর পায়ে ধ'রে বললাম, 'বল, এর প্রতিকার কি নাই?' ঠিক আমারই মতই তিনিও প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, 'এক-পা'-বাবা আমাকে তাহাই বলিলেন। বলিলেন—'ভবিষ্যতে কবে কি ঘটবে, তা আমি জানি না। তবে ঘটবে। দুনিয়ায় যা ঘটে, তা কখনও বৃথা যায় না। আজ যা ঘ'টে গেল, মনে হ'ল, এ কাণ্ডের এই খতম হয়ে গেল। চ'লে গেল কত বৎসর। মানুষ ভুলে গেল সে

ঘটনার কথা। ভগবানকে কত দোষ দিল; এমন সময় হঠাৎ একদিন ঘটে ওই ঘটনার জের টেনে একটি ঘটনা, সুদে আসলে শোধ তুলে কারবার নতুন ক'রে জাগিয়ে তুললে।' 'এক-পা'-বাবা বলিলেন—'এইটুকু আমি তোকে বলতে পারি, তাই বললাম। তুই বেটা সংসার থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিস আমার মত, আমার কথা শুন্, সংসারে আর ফিরিস নে, ভগবানকে ডাক্, দুঃখের বোঝা ফেলে দে, সুখ পাবি, শান্তি পাবি। বিশ্বাস রাখ্, যা ঘটল তা হারাল না, কারবার খতম হ'ল না, এর জের চলবে, যে টানবার সে টানবে, তার হুকুমে টেনে চলবে দুনিয়া।' তুমি আমাকে মার্জনা করিও। গৌরীকান্তকে বলিও আমার দুঃখের কথা, অপমানের কথা। এখন আর আমার কোন লজ্জা নাই। আমি তোমাকে যেমন পত্র দিলাম, তেমনিই পত্র দিলাম সন্তোষ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ। আর জানাইলাম স্বর্ণকে। বৈষয়িক প্রয়োজনে জানাইলাম। জানি, আমি যে লজ্জাকে পিছনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলাম, তাহার গ্লানি তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কি করিবে? আমি অক্ষম, আমি কাপুরুষ, আমি পীড়িত, আমি ক্লান্ত। দুর্যোধন যে লজ্জায় দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়াছিল, আমি সেই লজ্জায় 'এক-পা'-বাবার আশ্রমে আত্মগোপন করিলাম। এখান হইতেও নবগ্রামের ধিক্কার-কলরব আমি শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু দুর্যোধনের মত মৃত্যুপণে যুদ্ধের সংকল্প করিয়া আত্ম-প্রকাশের সাহস ও শক্তি আমার নাই। আমি মরিব, জলতলেই একদা আমার মৃত্যু হইবে, জলচরেরাই আমার দেহ ভক্ষণ করিয়া সৎকার করিবে।"

* * * *

নিঃশব্দে কাঁদলেন কাশীর বউ। নিশ্বাসে প্রশ্বাসেও কোন আবেগ সঞ্চারিত হ'ল না। শুধু চোখের জলের দুটি ধারা নেমে এল। গাল বেয়ে নেমে এসে চিবুকের প্রান্ত থেকে টপটপ করে মাটিতে ঝ'রে পড়ল।

ষোড়শী ঘরে ঢুকল, তার মুখখানাও থমথম করছে। সেও যেন কিছু বলতে এসেছিল, কিন্তু কাশীর বউয়ের মুখ দেখে সে ঈষৎ চকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল, মুখের কথা মুখেই আটক রইল। পর-মুহূর্তেই তার দৃষ্টি পড়ল হাতের চিঠির উপর। সসঙ্কোচে সে আবার প্রশ্ন করলে, বাবার চিঠি মা?

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল কাশীর বউয়ের মুখে, ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

ষোড়শী বললে, চোখ মুছুন মা। এমন করে কাঁদতে নাই।

এতক্ষণে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাশীর বউ চোখ মুছলেন।

ষোড়শী সাহস পেয়ে এবার জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখেছেন বাবা? কবে আসবেন? দেহ ভাল আছে?

উত্তর দিতে গিয়ে চোখ বুজলেন কাশীর বউ। সম্ভবত ষোড়শীর মুখের দিকে চেয়ে সত্য কথা বলতে লজ্জা পেলেন তিনি, তিনি ফিরবেন না মা।

ফিরবেন না?—চমকে উঠে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল ষোড়শী।

চীৎকার করিস না ষোড়শী। মনের দুঃখে, লজ্জায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন মা।

সন্ন্যাসী!

হ্যাঁ, সেদিন রাত্রে—। কথা বলতে গিয়ে আবার তাঁর চোখ থেকে নেমে এল জলের ধারা। কথা অসমাপ্ত রেখে স্তব্ধ হয়ে আত্মসম্বরণ ক'রে আবার আরম্ভ করলেন, আবার নামল চোখের জল। বার বার থেমে আত্মসম্বরণ ক'রে ষোড়শীকে সব কথা প্রকাশ ক'রে বললেন। সমস্ত নবগ্রামের মধ্যে এই সর্বজননিন্দিতা মেয়েটি ছাড়া আপনার জন আর কাউকে তিনি খুঁজে পেলেন না। পরিশেষে বললেন, আমি কি করব, তা যে বুঝতে পারছি না ষোড়শী।

ষোড়শী বললে, তাই তো মা, এই নির্বান্ধব পুরী, ওই শিশু ছেলেকে নিয়ে আপনি বাস করবেন কি ক'রে?

কিন্তু বাস যে আমাকে করতেই হবে।

না মা, আপনি বাপের বাড়ি চলুন। কাশী চলুন মা, আমি আপনার সঙ্গে যাব, এক মুঠো ভাত আর দুখানা কাপড় আমাকে বছরে দেবেন, মাইনে আমি চাইব না। আমিও আর এখানে থাকতে পারছি না মা।

জলমগ্ন মানুষ কোন রকমে জলের উপর মাথা তুলে উঠে যে ভাবে নিশ্বাস নিয়ে মাথা নাড়ে, সেই ভাবে ষোড়শী মাথা নেড়ে উঠল।

কাশীর বউ বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, কেন ষোড়শী? এ কথা বলছিস কেন?

সেই কথা বলতেই এসেছিলাম মা; কিন্তু আপনার মুখ দেখে, চোখে জল দেখে বলতে পারি নি। আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে মা। আজ সাতদিন বাবা চ'লে গিয়েছেন, সাতদিন পথে বার হওয়া দায় হয়ে উঠেছে। যারা একবার আমার পিছনে লেগেছিল, পথ আগলেছিল তারা আবার উঠে-প'ড়ে লেগেছে। তা ছাড়া আরও আছে মা। গাঁয়ে থিয়েটারের দল

হয়েছে, ময়রা-বাড়িতে আড্ডা তার, ও-পাড়ার উরুবাবু এ-পাড়ার মঙ্গলবাবু— সে এক দল মা। ষোড়শী শিউরে উঠল।

একটু পর সে আবার বললে—এবার চোখ দুটো তার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, বললে, সতী আমি ছিলাম না মা। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিলাম, গাঁয়ে স্বজাতের ছোঁড়ারাই আমাকে নষ্ট করেছিল; তারপর মা, একবার ও দোষ ঘটলে নিস্তার থাকে না, আমিও পাই নি মা। এই গাঁয়ের নষ্ট ভদ্রলোকের ছেলেরা আমার খোঁজ শুরু করলে। ভোরবেলা না হতে বন্দুক ঘাড়ে গাঁয়ে গিয়ে পুকুরের পাড়ে পাড়ে, পাড়ায় পাঁদাড়ে পাঁদাড়ে ঘুরতে লাগল। গাঁয়ের লোকে, জমিদারবাবু, ব্রাহ্মণের ছেলে এদের কিছু বলতে পারলে না, লাগল আমার ওপর। বলে—ওই পাপকে দূর কর, তা হ'লেই গাঁ ঠাণ্ডা হবে। কথা সত্য মা, পচা জিনিস ঘরে রাখ, মাছি জুটবে, শেষ-মেষ পচা জিনিসের গায়ের পোকায় ঘর ছেয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন আমার বড় রাগ হয়েছিল, মনের দুঃখে বেরিয়েছিলাম মা যে, গাঁ থেকে চ'লে যাব, বর্ধমান। শুনেছি, সেখানে রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে যারা খায়, তাদের বসত আছে, পাড়া আছে। এই গাঁয়েই মা খেমটা-নাচ দেখেছি, যারা নাচতে আসত তাদের বেশভূষা দেখেছি, গহনা দেখেছি, বাবু-ভাইদের কাঙালপনা ভরা দৃষ্টি দেখেছি, শুনেছি মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে তাদের চরণে ধ'রে বাবুরা গড়াগড়ি যান। মনের দুঃখে, মনের ঘেন্নায় তাই ভেবেছিলাম, যাব, তাই যাব, এ গাঁয়ের বাবুরা যদি যায়, চরণে ধরলে—

কথাটা আর শেষ করলে না ষোড়শী, মুখে তার আটকে গেল। সে বলতে চেয়েছিল বোধ হয়—চরণে ধরলে মুখে লাথি মারব। কিন্তু অকস্মাৎ কাশীর বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে প'ড়ে গেল, কার সামনে সে এ সব কথা বলছে! সে থেমে গেল, উত্তেজনাবশে এক নিশ্বাসে এত কথা একসঙ্গে ব'লে হাঁপাতে লাগল, চোখ তার জ্বালা করছে, জল আসছে।

কাশীর বউ বললেন, আমি সব জানি ষোড়শী। তিনি আমাকে সব বলেছিলেন।

কেঁদে ফেললে ষোড়শী, বললে, ওই কিশোরবাবু। আঃ, মা, ওঁর সঙ্গে সেদিন যদি দেখা না হ'ত, তবে যা হবার আমার কপালে তাই ঘ'টে যেত। পথে অমূল্যবাবু, ভূপতিবাবু, ওই স্বর্ণবাবুর ভাগ্নেরা মা, পথ আগলে আমাকে জবরদস্তি বাগান-বাড়িতে আটক করবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় এলেন কিশোরবাবু। দেখে শুনে আগুনের মত জ্ব'লে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আপনার বাড়িতে ঠাঁই ক'রে দিলেন।

বাবার ভয়ে এতদিন কেউ আর বিরক্ত করে নাই। আমার নিজের, মা, আপনার চরণ পেয়ে আমি শান্তি পেয়েছিলাম, আমার মন জুড়িয়েছিল, আপনার ছেলেটিকে বুকে ক'রে আমার বুক জুড়িয়েছিল। কিন্তু বাবা গিয়েছেন আজ সাত দিন, আজ আর রক্ষক নাই আমার, কিশোববাবু গাঁয়ে নাই, আবার আমার পিছনে লেগেছে মা। এবার শুধু অমূল্যবাবু ভূপতিবাবু নয় মা, থিয়েটার-দলের মঙ্গলবাবু, উরুবাবু, বেনেপাড়ার ছোকরারা—ওই যশোদা দত্ত, কাশী চন্দ—

কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল ষোড়শীব। আবার সে হাঁপাতে লাগল। একটু থেমে সে কাশীর বউয়ের পা দুটো চেপে ধ'রে বললে, চলুন মা, কাশী চলুন, তা হ'লে আমি হয়তো বাঁচব। আপনি—আপনিও বাঁচবেন মা। এখানে আপনিও থাকতে পারবেন না। ওরা সব জানে মা, বলাবলি করে, আমাকে তামাশা ক'রে বলে কি-- তোর বাবা পালিয়েছে ? সন্ন্যেসী হয়েছে, না রে ?

ওরা জানে ?—চমকে উঠলেন কাশীর বউ।

জানে মা, ওই কথা বলে আমাকে ' পাষণ্ড মা, পিচাশ সব। এত বড় মানুষটার এই অপমান হ'ল, বিবাগী হলেন তিনি, আর লোকে বলে মা—

কি বলে ষোড়শী ?

বলে মা—। ওই বেনেপাড়ার মণি দত্ত, মজলিস ক'রে পাঁচজনকে নিয়ে হা-হা ক'রে হেসে বলে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হবে না ? এক বংশের সাজা হ'ল, এখনও তিন বংশ বাকি। তার মধ্যে এক বংশের হতে আরম্ভ হয়েছে। দেখব, আমরা দু চোখ মেলে দেখব আর হা-হা ক'রে হাসব।

নবগ্রামের গন্ধবণিকেরা দেশবিখ্যাত; তারাই এখানে বসিয়েছিল ব্রাহ্মণদের। ওই সরকারবাবুদের পূর্বপুরুষেরা এখানে আসত গুড় বেচতে। দিন কারুর সমানে যায় না। গন্ধবণিকদের অবস্থা খারাপ হ'ল, বামুনেরা উঠল। কিন্তু মানীর মান তা ব'লে যায় না। সেই মানী গন্ধবণিকদের প্রধান ব্যক্তির অপমান সদর-রাস্তার ওপর, সে ধর্ম সহ্য করবে কেন ?

শিউরে উঠলেন কাশীর বউ। মনে প'ড়ে গেল তাঁর। অনেক—অনেক দিন পূর্বের ঘটনা। এ বাড়িতে তিনি আসবার অনেক দিন আগে, তাঁর স্বামী রাধাকান্তের জন্মেরও পূর্বে। তাঁর শ্বশুর স্বর্ণবাবুর বাপ, সরকার-বাড়ির দুজন প্রধান গরমের দিন স্বর্ণবাবুদের কাছারি-বাড়ির সামনে সদর-রাস্তার উপর চেয়ার পেতে মজলিস ক'রে ব'সে ছিলেন। গল্পে আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠেছিল ঠাঁইটা। হঠাৎ একটি লোক পাশ দিয়ে যাবার সময়

ঈষৎ নত হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে পার হয়ে গেল। বাবুরা তখন হাসছিলেন কোন রস-রসিকতায় উচ্ছল হয়ে। হঠাৎ একজন হাসি বন্ধ ক'রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কে? কে গেল?

মুহূর্তে সকলেই সোজা হয়ে বসলেন, গম্ভীর স্তব্ধ হয়ে গেল মজলিসটা।

বৈকণ্ঠ দত্ত। গন্ধবণিকদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। বৈকুণ্ঠ দত্ত দাম্ভিক, সে আজও সেই পূর্বকালের সমৃদ্ধির অহঙ্কারে অহঙ্কৃত। মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, বৈকুণ্ঠ দত্ত ব্রাহ্মণ সন্তানের, ব্রাহ্মণ-গৃহস্থ পরিবারের অসম্মান করেছে। আজ সে গ্রামের সর্বপ্রধান ব্যক্তি, জমিদাব-ব্রাহ্মণদের অসম্মান না হ'লেও ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান না দিয়ে চ'লে গেল।

স্বর্ণবাবুর বাপ সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীকে ডেকে বলেছিলেন, ডাক্, ওই লোকটাকে ডাক্। না আসে গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে আসবি।

বৈকুণ্ঠ দত্ত নিজেই এসেছিল। সে বুঝতে পারে নি, কি অপরাধ হয়েছে। বাবুরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি কি রাজার ছেলে বৈকুণ্ঠ?

আজ্ঞে?

রাজার ছেলেরা প্রণাম জানে না। দেবতাকে প্রণাম করতে হ'লেও নমস্কার করে। বলে—আমি যে রাজার ছেলে, প্রণাম নাহি জানি, কেমন ক'রে করব প্রণাম দেখিয়ে দাও হে তুমি। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ। শুধু ব্রাহ্মণ নই—জমিদার, আমরা নিজে প্রণাম ক'রে দেখাই কি ক'রে বল? সামনে কোন দেবতা থাকলেও না হয় প্রণাম ক'রে দেখাতাম। এখন তোমাকেই প্রণাম করিয়ে শিখিয়ে দিই কেমন ক'রে প্রণাম করতে হয়। ওহে ঠাকুর, দাও তো হে ওর ঘাড় ধ'রে মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে আর কানে ধ'রে ব'লে দাও—ব্রাহ্মণ জমিদারকে এমনি ক'রে প্রণাম করতে হয়।

দত্তকর্তার কপালটা ঠুকে দিয়েছিল স্বর্ণবাবুদের পাচক ব্রাহ্মণ। রাস্তার বালির মধ্যে ছিল কাচের টুকরো। টুকরোটা কপালে বিঁধে গিয়েছিল। সে ক্ষতের দাগ আমরণ বহন ক'রে গিয়েছে বৈকুণ্ঠ দত্ত।

এ কথা সেই কথা।

শিউরে উঠলেন কাশীর বউ।

ষোড়শী বললে, আপনি তো শুধু শিউরে উঠলেন মা, আমি থর-থর ক'রে কেঁপে উঠেছিলাম। কেষ্ট চন্দ মশায়ের দোকানে জিনিস নিচ্ছিলাম, চন্দ মশায়ের দোকানের সামনে ওনার ভাইপোর দোকান,—দোকান তো নাই,

উঠে গিয়েছে, সেখানে বণিক মশায়দের ছেলেছোকরাদের আড্ডা ; সেই আড্ডায়, মা, পাড়া গোল ক'রে সেই সব কথা বলে মা। পোস্তদানার ঠোঙাটা হাত কেঁপে প'ড়ে গেল মেঝেময় ছড়িয়ে। চন্দ্র মশায় আমার মুখের দিকে চেয়ে বকলে, বললে—ফেললে ? তারপরেতে উঠে বাইরে গিয়ে ছোকরাদের বকলে, বললে—এ সব কথা কি ? তা ছোকরারা, মা, আলান সাপের ডেঁকার মত ফোঁস ক'রে উঠল।

বাধা দিয়ে কাশীর বউ বললেন, থাক্ ওসব কথা ষোড়শী।

ষোড়শী আবার মাথা নেড়ে উঠল—জলমগ্ন মানুষ কোন রকমে জলের উপরে মাথা তুলে নিশ্বাস নিতে গিয়ে যে ভাবে মাথা নেড়ে ওঠে, সেই ভাবে বললে, না না মা, হেলা ক'রে অগ্রাহ্যি ক'রো না মা। আমার কথা শোন মা তুমি, এখানে তুমি থেকো না। থাকতে পারবে না তুমি ; তুমি মেয়েছেলে, তোমার এই শিশু ছেলে, তুমি চল এখান থেকে।

কাশীর বউ এবার দৃঢ়তার সঙ্গে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার ক'রে মৃদু ধীর স্বরে বললেন, না। এখান ছেড়ে আমি যাব না ষোড়শী। তিনি চ'লে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও যদি চ'লে যাই, তবে আর কখনও এ ভিটেতে ফিরতে পারবে না গৌরীকান্ত।

কিন্তু—

কিন্তু কিছু নেই মা এর মধ্যে। আমি থাকব। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ প্রাণ দিয়ে এ বাড়ির মান-মর্যাদা বজায় রেখে চালিয়ে আমি যাব।

বলতে বলতে তাঁর পিঙ্গল চক্ষুতারকা দুটি তীব্রতায় দীপ্ত হয়ে উঠল। সে দৃষ্টি দেখে ষোড়শী ভয়ও পেলে, আবার যেন ভরসাও পেলে। কাশীর বউয়ের এ মূর্তি সে এই প্রথম দেখলে, বললে, মা !

কাশীর বউ বললেন, ওদের ওই কথাই যদি সত্যি হয় ষোড়শী, তবে আজ আমার স্বামীর যে অপমান হ'ল, তারও শোধের পালা একদিন আসবে। আমার গৌরীকান্তকে তো সেই দিনের জন্যে তৈরী ক'রে তুলতে হবে। এখান ছেড়ে চ'লে গেলে গৌরীকান্ত মানুষ হয়তো হবে ; কিন্তু সেদিন তাকে যা করতে হবে, তা করবার মত মতি ওর হবে না !

তারপর আবার বললেন, ভয় আমি কাউকে করি না। আমি ঘোমটা খুলে দাঁড়াব, যে আমার সীমানায় পা দেবে তাকে আমি এমন ঘা মারব—। আমি যাব না ষোড়শী, তোর সাহস যদি না থাকে, তুই যদি যেতে চাস কোথাও, আমি বারণ করব না।

ঠিক এই সময়ে বাড়ির বাইরে থেকে বিষ্টু চাকর ডাকলে, মা !

সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন কেউ গলার সাড়া দিলে। বিষ্টুর সঙ্গে আরও কেউ আছে।

ষোড়শী অবাক হয়ে কাশীর বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল ; কাশীর বউ জড়তাশূন্য পরিষ্কার কণ্ঠে সাড়া দিলেন, কি বিষ্টু ?

বিষ্টু বাড়ির মধ্যে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে বললে, সন্তোষবাবু এসেছেন মা, বললেন—দেখা করবেন। গৌরীদাদা বাগানেব গাছতলায়—

বিষ্টুকে কথা শেষ করতে দিলেন না কাশীর বউ, বললেন, ডাক, ঠাকুরজামাইকে ডাক ভেতরে। আগে আসন পাত।—ব'লে নিজেই তিনি এগিয়ে গেলেন সদর-দরজার মুখে, দেখলেন, গৌরীকান্তকে কোলে নিয়ে সন্তোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কাঁধেব উপর মাথা রেখে গৌরীকান্ত সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। বিস্মিত হবার কথা, কিন্তু বিস্ময়কে দূরে সরিয়ে কাশীর বউ বললেন, আসুন ঠাকুরজামাই, আসুন।

সন্তোষবাবুর মুখে প্রথমে ফুটে উঠল বিপুল বিস্ময়, দেখতে দেখতে সে বিস্ময় পরিণত হ'ল শ্রদ্ধায়। স্বল্প একটু হাসি এ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনিই ফুটে ওঠে, আলোর সঙ্গে উত্তাপের মতো হাসি শ্রদ্ধার সঙ্গে সহজাত। সন্তোষবাবু বললেন, এলাম। একটুখানি রাগ ক'রেই এসেছি, তিরস্কার করতে এসেছি।

করবেন তিরস্কার, অন্যায় ক'রে থাকলে তিরস্কার নিশ্চয়ই করবেন ; কিন্তু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নয়, ভিতরে আসুন।

একটু ইতস্তত করলেন সন্তোষবাবু। নবগ্রামের ব্রাহ্মণ-জমিদারদের সমাজ। নবাবী বাদশাহী এবং আভিজাত্যের অনুকরণ এখানে। পাখার অহঙ্কারে পতঙ্গেরা জটায়ু সম্পাতির ভূমিকায় অভিনয় করে। রাধাকান্ত নিজেও এ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না। এখানকার মেয়েরাও মুক্ত নয়। এখানকার বধূরাণীরাও বেগম সেজে আনন্দ পান। কন্যারাও প্রায় শাহজাদী। তাদের পিত্রালয়ের পোষ্য জামাতারা অসময়ে অন্দরে এলে তাঁরাও ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে থাকেন, এ কি বেতরিবতের সহবত তোমাদের ! যখন-তখন হট্ ক'রে বাড়ির মধ্যে চ'লে আস ! এ কি তোমাদের উড়ো কুলীনের বাড়ি ?

ব্রাহ্মণত্বের চেয়ে এদের জমিদারত্বই বড়। কিন্তু এই মেয়েটি বিচিত্র। এখানকার সমাজ ও রাধাকান্তের এই বাড়ির ধারা-ধরনের প্রভাব একে হজম করতে পারে নি।

কাশীর বউ বুঝলেন সন্তোষবাবুর সঙ্কোচ। তিনি বললেন, তাঁর চিঠি পেয়েছি আজ। লিখেছেন—আপনাকেও লিখেছেন। পেয়েছেন ?

পেয়েছি। কি যে বলব—

কি বলবেন? এর উপরে আপনার হাত ছিল না, আমারও হাত ছিল না, আমি শুধু কথাটা তুললাম এই কথাটা বলবার জন্যে যে, এ অবস্থায় আপনার সঙ্গে এই ভাবে ঘোমটা খুলে কথা না ব'লে আমার উপায় নাই। আর কথা যখন বলতে হবে, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা না ব'লে বাড়ির ভিতর ধীরে সুস্থে কথা বলাই ভাল।

হেসে সন্তোষবাবু বললেন, সকল সঙ্কোচ আমার কেটে গেল। আরও দরকার আছে। এসেছিলাম তিরস্কার করতে। এসে মনে হ'ল, সম্পর্কেই শুধু নয়, সত্যিই আপনি আমার প্রণম্য। প্রণামটাও জানিয়ে যাব।

কাশীর বউ বললেন, আমি আপনাকে প্রণাম করব ব'লে যে ব'সে আছি। সেই জন্যেই বেশি ক'রে ডাকছি। নির্বান্ধব পুরীতে যে অবস্থায় পড়লাম, এতে বন্ধু পূজনীয় কেউ না থাকলে স্নেহ পাব কোথা থেকে? কিন্তু গৌরীকান্তকে আমায় দিন। ওকে আপনি কোথায় পেলেন?

সেই জন্যেই তিরস্কার করব আপনাকে। ওর কানটা দেখেছেন?

কাশীর বউ দেখে শিউরে উঠলেন। গৌরীকান্তের কান দুটি লাল হয়ে রয়েছে, একটু যেন ফুলেও উঠেছে। কেউ নিষ্ঠুর পেষণে কান ম'লে দিয়েছে।

আগে ওকে শুইয়ে দিন। বড় কেঁদেছে বেচারী। ফুলে ফুলে সে কি কান্না ওর! আমি কোন মতে শান্ত করতে পারি না। শেষে বললাম— গল্প বলি শোন।

কিন্তু কি হয়েছিল? কি করেছিল গৌরীকান্ত? এমন ভাবে কান ম'লে দিলে কে?

সন্তোষবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কান ম'লে দিয়েছেন কীর্তিচন্দ্রবাবু।

কাশীর বউ ছেলেটিকে নিজের কোলে নিতে গিয়ে বললেন, আসুন বাড়ির ভিতর।

* * * *

গোপীচন্দ্রের ঠাকুর-বাড়ি এবং কাছারির সামনেই একটি স্বতন্ত্র ছোট বাংলো-ধরনের বাড়িতে পবিত্র থিয়েটার-দলের মহলাখানা বসিয়েছে। পবিত্রের বন্ধুবান্ধব এবং গ্রামের যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ওইখানে মজলিস জমিয়ে বসে। গান-বাজনার আসর বসে, নাটক পড়া হয়। পবিত্র কবিতা লেখে, তাও পড়ে। কখনও গ্রামোফোনের গান হয়। দিবারাত্রির

মধ্যে দরজা বন্ধ হয় না। গ্রামের সাধারণ লোক বাংলোটার উঠানে ভিড় জমিয়ে দাঁড়ায়, গান-বাজনা শোনে। পবিত্র আজ দিন কয়েক হ'ল প্রকাণ্ড একটা টেবিল-হারমোনিয়ম এনেছে। মোটা খাদের সুরের সঙ্গে মিশানো এই যন্ত্রটির সুরও যত মিষ্ট, চকচকে পালিশ করা যন্ত্রটি দেখতেও তত সুন্দর, তার হাতে-বেলো টানার বদলে পায়ে-বেলো করার পদ্ধতি অভিনব। গৌরীকান্ত বেরিয়েছিল, কিছু যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বাবা তাব কাশীতে আছেন—এ কথা তার মা তাকে বলেছেন। মা বলেছেন—তিনি গিয়েছেন বিশ্বনাথের কাছে আশীর্বাদ আনতে। কিন্তু তাতে তার মনেব শান্তি হয় নাই। মনটা যেন তার ফাঁকা হয়ে গেছে। বাধাকান্ত অহরহ ছেলেকে কাছে কাছে বাখতেন, তাঁর অভাবে ছেলেটির মন যেন প্রিয়তম সঙ্গীটিকে হারিয়ে ফেলেছে। ঘুবতে ঘুরতে সে চলেছিল, তার বাবাব নিজের হাতে তৈরি কবা গ্রামপ্রান্তের বাগানের দিকে। পথে ঐ থিয়েটারের মজলিসের সামনে এসে সে বাংলোটা জনশূন্য দেখে সেখানে উঠে উঁকি মেরে দেখে। ঘরের মধ্যে ঢুকে ওই টেবিল-হারমোনিয়মটি বাজিয়ে দেখবার কৌতূহল সম্বরণ করতে পারে নি, পায়ে টিপে কেমন ক'রে ওটা বাজে?

সন্তোষবাবু গোপীচন্দ্রবাবুর মজলিসেই ছিলেন। রাধাকান্তবাবু নাই, তাই এখানে ওখানে সময় কাটাবার জন্য গিয়ে থাকেন। হঠাৎ বাংলোটার ভিতব থেকে বেসুরে হাবমোনিয়মটা বেজে উঠতেই কীর্তিচন্দ্র উঠে গিয়ে গৌবীকান্তকে বের ক'রে এনে সর্বসমক্ষে কান দুটি সজোরে ম'লে দিয়ে বলেছেন, হবে না তো কিছু, নবগ্রামের বাবুলোকের সন্তান! অকালে লেখাপড়া ছাড়বে, পৈতৃক সম্পত্তি বেচবে, নেশা করবে, গানবাজনা করবে, নাচবে। তা হোক না আরও কিছু বয়স। এখন থেকে কেন? বালকের মুখখানা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। ওর মুখের সে যে কি অবস্থা হয়েছিল, না দেখলে অনুমান করা যায় না। আপনি মা, আপনিও পারবেন না।

সন্তোষবাবু থামলেন। কাশীর বউয়ের মুখের অবস্থা দেখে তিনি থেমে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ ক'রে কাশীর বউ হাত বাড়ালেন, দিন, গৌরীকান্তকে দিন।

তাঁর কোলে ছেলেটিকে তুলে দিয়ে সন্তোষবাবু বললেন, আপনার ছেলে বড় হবে। ওর আজ যা সহ্যশক্তি দেখলাম, আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। জানেন, যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছেন,

কীর্তিচন্দ্র নিজেও কেমন হয়ে গেলেন এইভাবে কথা ব'লে কান ম'লে দিয়ে। ব্যাপারটা যে কতটা কটু হয়ে যাচ্ছে বা গেল, প্রথমটায় বংশগত বিদ্বেষে বুঝতে পারেন নি কীর্তিচন্দ্র, যখন হয়ে গেল—হাতের তীর বেরিয়ে গিয়ে যখন আঘাত করল তখন উপায়ও ছিল না, আর তখনই বুঝতেও পারলেন ব্যঙ্গ-বাণ মনের আগুনের ছোঁয়াতে বহ্নিবাণ হয়ে বালকের বুকখানাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সর্বাগ্রে অবশ্য উঠে এলেন গোপীচন্দ্রবাবু। তিনি এসে গৌরীকান্তের হাত ধ'রে বললেন, অন্যায়, এ তোমার অন্যায় কীর্তিচন্দ্র। কীর্তিচন্দ্র উত্তর দিতে পারলেন না। গোপীচন্দ্র একটু কৌশলে মূল অন্যায়টাকে ঢেকে নিয়ে বললেন, টেবিল-হারমোনিয়মটা ফেটে গিয়েছে, মেরামত করাতে হবে, তা না হয় হবেই—ব'লে ওকে কোলে তুলে নিতে গেলেন। গৌরীকান্ত নিজেকে সামলে নিয়েছিল এরই মধ্যে, বেশ সহাস্য মুখেই বললে, না, আমার পায়ে ধুলো আছে, হাতও নোংরা, আপনার কাপড়-জামা ময়লা হয়ে যাবে। গোপীবাবু বললেন, হোক। আমি ছেড়ে ফেলব কাপড়জামা। ও বললে, না, বাবা-মা বারণ করেছেন। আমি তো এখন বড় হয়েছি, কোলে চাপতে গেলে আপনার গায়ে পা ঠেকবে। গোপীচন্দ্রবাবুও কথা বলতে পারলেন না, গৌরীকান্তই বললে, আমি গান গাইতে যাই নি। ওটার পাশে তো চামড়ার হাওয়া দেবার সেটা নেই অথচ কেমন ক'রে বাজে, আর—আর বাজনাটার সুর ভারি মিষ্টি কিনা, তাই—। এতক্ষণে ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল মুছে ফেলে হেসেই বললে, আমি যাই। এতক্ষণ সকলেই আমরা হতবাক হয়ে ছিলাম, এবার আমার সম্বিত ফিরল, আমি উঠে বললাম, চল গৌরী, আমিও যাই। হাত ধ'রে খানিকটা এসে আমাকে বললে, হারমোনিয়মটা ভেঙে যায় নি। কোন শব্দ হয় নি। ভেঙে গেলে তো শব্দ হয়। হয় না? আমি বললাম, না, খারাপ হয় নি। তবে উনি বোধ হয় ভেবেছিলেন খারাপ হয়েছে। আর ওখানে ঢুকো না। ওটা থিয়েটারের আসর তো। ওখানে ছেলেদের ঢুকতে নাই। ওখানে গেলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়। চল, বাড়ি চল। গৌরীকান্ত বললে, আমি এখন বাড়ি যাব না। আমি মা-কালীকে প্রণাম করতে যাব। আমি শিউরে উঠে বললাম, সে কি, গ্রামের বাইরে সেই তোমাদের বাগানে? সেখানে একলা যাবে? না না। সাপ আছে, বড় বড় শেয়াল আছে, নেকড়ে আছে। গৌরী বললে, বাবা বলেছিলেন—গৌরী, মাকে যেন রোজ প্রণাম ক'রো। বাবা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতেন। বাবা কাশী গিয়েছেন,

আমি একলাই রোজ যাই। ভয় করে না তো। আমি যাই।—ব'লে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বাধা দিতে পারলাম না। আমিও সঙ্গে গেলাম। বেচারী ঘুরতে লাগল আর দেখাতে লাগল, এই গাছটা বাবা কবে পুঁতেছিলেন, কি বলেছিলেন! বুঝলাম, ও ওই গাছগুলির মধ্যে বাপের কথা মনে করে। আমার চোখে জল এসেছিল। ভোলাবার জন্য গল্প বললাম, ধ্রুবের গল্প শুরু করলাম। ও বললে—জানি, মায়ের কাছে শুনেছি। প্রহ্লাদের গল্প, তাও বললে—শুনেছি। আমি তখন বিব্রত হলাম, বললাম, তুমি তো তা হ'লে সবই শুনেছ, কি বলব তোমাকে? বললে—না, সব শুনি নি, মা এখনও অনেক জানেন। আমি বললাম, তবে তুমিই আমাকে একটা গল্প বল। তুমি তো অনেক শুনেছ মায়ের কাছে। লজ্জা পেলে, বললে—আমি তো মায়ের মত ভাল ক'রে বলতে পারব না। বললাম, বল শুনি। ভাল যদি না লাগে, তবে আমি তখন বলব—হচ্ছে না ভাল। বললে—ঠিক বলবেন তো? প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল। তারপর গল্প শুরু করলে সত্যপ্রিয়ের কাহিনী।

হাসলেন সন্তোষবাবু, বললেন, গল্প বললে, বেশ বললে। তারপর আমিও একটা গল্প বললাম। শুনতে শুনতে বেচারা ঢুলতে লাগল, কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথা কোলে রেখে হাত বুলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে গেল।

কাশীর বউ বোধ হয় কথা শুনছিলেন না, তিনি একমনে ভাবছিলেন।

চৌদ্দ

ঘরের মধ্যে ব'সে সন্তোষবাবু ভাবছিলেন। ধ্যানমগ্নের মত নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন ভাবনায়। ভাবছিলেন নবগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির কথা। নিতান্তই নিস্পৃহ দর্শকের মত তিনি দীর্ঘদিন ধ'রে নবগ্রামের জীবন-দ্বন্দ্ব দেখে আসছেন,—এখানে তিনি ঘর জামাই। লোকে তাঁকে বাইরে সম্মান করে, স্নেহ করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণা করে, সে তাঁর অগোচর নাই। তিনি সেকালের পেশাদার কুলীন জামাই। ঠিক এই কারণেই এ গ্রামে দীর্ঘদিন বাস ক'রেও তিনি বিদেশী। এখানকার উত্থান-পতনের আনন্দ-দুঃখ তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করে না। অতীত কালের গল্পও শুনেছেন নিছক শ্রোতার মত। তিনি নিরাসক্তভাবে ঘটনাগুলি

সাজিয়ে দেখে বিচিত্র আনন্দ অনুভব করেন। তবে রাধারাণুকে তিনি ভালবাসতেন। কাশীর বউয়ের সঙ্গে দুদিন আগে যে কথাগুলি হয়েছে, তা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছে। তাই তিনি ভাবছিলেন, ভেবে দেখছিলেন।

গোপীচন্দ্র উঠলেন গিরিচূড়ার মত। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল জীর্ণ খ'ড়ো চালের নীচে মাটির মেঝের উপর। বর্ষার জল, দ্বিপ্রহরে সূর্যের রৌদ্রচ্ছটা, শীতের রাত্রির হিম—শৈশবে তাঁর শিশুদেহের উপর পড়েছে। যৌবনের প্রারম্ভে যাত্রা করেছিলেন তিনি, দুঃসাহসিক অভিযান—সামান্য পথিকের মত। নবগ্রামের গ্রাম্যজীবনে বহুকাল পূর্বে সরকার-বংশের একটি সন্তান গিয়েছিলেন রাজনগরে নবাব-দপ্তরের অভিমুখে, তিনি ফিরেছিলেন সম্পদ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে। আবারও কিছুকাল পরে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন সরকারদের ভাগিনেয়-বংশ। তাঁরাও ফিরেছিলেন সম্পদ-সম্পত্তি অর্জন ক'রে। সরকারবাবুরা এখানে জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন. পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন—সংস্কৃত বাংলা উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ভাগিনেয়-বংশের স্বর্ণবাবুর বাপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এম. ই. স্কুল। তিনিও পুকুর কাটিয়েছেন, দেবকীর্তি করেছেন। কিন্তু এবার যা হ'ল, এ অভিনব।

হাই-ইংলিশ স্কুল।

নবগ্রামের গ্রাম্য পরিধিতে কখনও কোন কালে এর চেয়ে আর বড় কিছু ধরবে না। যতদূর দৃষ্টি যায়, নবগ্রামের ভাবাকালের আকাশ ও উত্তরমেরুপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরসীমায় মিলিত দিগন্ত পর্যন্ত, ততদূরের মধ্যে আর কোন অভ্যুদয় সম্ভাবনা দেখা যায় না। পক্বকেশ গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় গোপীচন্দ্র এই দিগন্ত মধ্যে তুষারমণ্ডিত মহিমায় গিরিচূড়ার মত দাঁড়িয়ে আছেন। এত উচ্চতায় কোন কালে নবগ্রামের কোন ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নাই। তার প্রমাণ পেয়েছে নবগ্রামের অঞ্চলের মানুষেরা। হিমালয়ের উচ্চতার মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে দেবলোক সেখানে নেমে আসেন। গোপীচন্দ্রের মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে রাজ-প্রতিনিধিরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন; নবগ্রামে তাঁরা সমবেত হয়ে একবাক্যে সেই সত্য স্বীকার করে গেছেন।

শুধু অভ্যুদয় গোপীচন্দ্রেরই একা হ'ল না।

গোপীচন্দ্র উত্থিত হলেন আপন শক্তিতে, উৎক্ষিপ্ত হ'ল পুরাতন শৃঙ্গগুলি, গোপীচন্দ্রের বলে ধরিত্রীর বিদীর্ণ বক্ষপথে উঠল আরও অনেক পাথরের খণ্ড। প্রাচীন প্রধানদের পতন এবং এই নূতন প্রধানের অভ্যুদয়ের সঙ্গে

সঙ্গে এ অঞ্চলের সাধারণ অবস্থার মানুষের সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড জীবনালোড়নের সৃষ্টি হ'ল। দীর্ঘকাল পরে এখানকার বিত্তহীন ব্রাহ্মণ কায়স্থ গন্ধবণিক, আশপাশের গ্রামের চাষী গৃহস্থ সমাজ নূতন ভরসায় অভিনব আনন্দে উঠে দাঁড়াল। গোপীচন্দ্র একদা তাঁদেরই একজন ছিলেন,—বেশিদিন আগে নয়, দশ বৎসর পূর্বেও তিনি ছিলেন গৃহস্থ ঘরের সন্তান, আরও বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন আরও সামান্য অবস্থার ব্যক্তি। আজ তিনি উঠলেন একটা বিপ্লব ঘটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে হ'ল, তারাও মুক্তি পেলে। আজ সকলের মাথার উপরে গোপীচন্দ্র—তিনি একান্তভাবে তাদের, তাদেরই একজন।

প্রদীপের শিখায় জ্যোতিরও ঊর্ধ্বে ওঠে কালি, তাদের এই আনন্দের সঙ্গে শিখার কালির মত বোধ হয় স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়েছিল দীর্ঘকাল পূর্বের অপমানের ক্ষোভে পরিতৃপ্তির বিকৃতি। ওটুকুর নিচে সত্যই ছিল আশা-ভরসার আনন্দ এবং প্রেরণা। গন্ধবণিক সমাজেই এ আনন্দ-চাঞ্চল্য বেশি।

মণি দত্ত বণিক-সমাজের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। বয়স তার অল্প, ইংরেজী লেখাপড়াও সে কিছু শিখেছে, সাপ্তাহিক ইংরেজী খবরের কাগজ পড়ে, দেশ-দেশান্তরের খবর রাখে; সাধারণ গন্ধবণিকদের মত তার ব্যবসার গণ্ডী নবগ্রামের পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে বৃহত্তর পরিধির সন্ধানে এর থেকে সাত মাইল দূরে রেল-স্টেশনে কাপড়ের বড় দোকান করেছে। বেশভূষায় সে গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা বজায় রেখে বেশভূষা করে। একালের ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট-বড় ক'রে চুল ছাঁটে, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি গোঁফ রেখেছে; সাধারণত সে থাকে তার ব্যবসার স্থানে ওই রেল-স্টেশনের ছোটখাটো আধা শহরটিতে। এ গ্রামে তাদের সমাজে অনেক প্রবীণ আছেন, সামান্য ব্যবসাদার হ'লেও সঞ্চয়ের পারদর্শিতায় মণি দত্ত অপেক্ষা অর্থশালীও বটে; তবু মণি দত্তই এখানকার বণিকসমাজের প্রধান। তরুণ বণিকসমাজ তার প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষাতুর, নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে মণি দত্তের তারা বিরোধিতাও করে। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের, বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিদের সঙ্গে বিরোধিতায় মণি দত্তই তাদের অবিসম্বাদী নেতা। সরকারী ব্যাপারে বণিকদের কারও কোন প্রয়োজন থাকলে মণি দত্তের পরামর্শই তারা গ্রহণ ক'রে থাকে।

মণি দত্তের নেতৃত্বেই সেদিন কেষ্ট চন্দ মশায়ের ভাইপোর দোকানে বণিকপাড়ার তরুণেরা পাড়া গোল ক'রে উল্লাস প্রকাশ করেছে।

এই মণি দত্তই সেই লাঞ্ছিত বৈকুণ্ঠ দত্তের বংশের সন্তান। ওই লাঞ্ছনার ক্ষোভ তার বংশের শিক্ষায় দীক্ষায়, বোধ করি রক্তধারার মধ্যেও মিশে ছিল। তাই এই নূতন আশা, নূতন ভরসার পবিত্র আনন্দের মধ্যেও শিখার উপরের কালি ও ধোঁয়ার মতই তাদের ক্ষোভে পরিতৃপ্তির উল্লাসটুকু মানুষের চোখে পড়ল সর্বাগ্রে, আত্মপ্রকাশও করলে সর্বাগ্রে। বণিকসমাজের প্রধানেরা মাথা হেঁট না ক'রে পারলেন না, বিশেষ ক'বে কৃষ্ণ চন্দ মহাশয় ছি-ছি ক'রে সারা হয়ে গেলেন।

মণি দত্তের নেতৃত্বে তরুণ গন্ধবণিকেব দল একটা মজলিস ক'রে স্থির ক'রে ফেললেন, ওই অধঃপতিত বাবুদেব বাড়ির যে সব মাতাল চরিত্রহীন ছেলে গ্রামের মধ্যে বেলেল্লাগিবি কবে, তাদের আর ব্রাহ্মণ বা জমিদারের বাড়িব আত্মীয় ব'লে খাতির করবে না।

লক্ষ্য তাদের স্বর্ণভূষণবাবুর দুজন ভাগ্নে—অমূল্য এবং ভূপতি। সরকার-বাড়িবও জনকয়েক ছেলে আছে। তাদেব অসংযমের সত্যই অন্ত ছিল না। কিন্তু সেদিন যে উপলক্ষ নিয়ে কথাটা উঠল, সে উপলক্ষ যোড়শী। কাশী চন্দ প্রভৃতি কয়েক জন তরুণ যোড়শীর দিকে কটাক্ষপাত করতে গিয়ে চমকে উঠেছিল। কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল অমূল্য এবং ভূপতি।

অমূল্য মাতাল হ'লেও প্রচণ্ড শক্তিশালী। সেই দুই হাতের আঙুলগুলোকে বঁড়শীর মত বেঁকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘ'ষে ভূপতিকে বলার ছল ক'রে বলেছিল, চোখ তুলে নোব। বুঝলি ভূপতি, চোখ—চোখ—ট্যারা চোখে মেয়েদের দিকে তাকাবার সাজা হ'ল তাই।

ভয় পেতে হয়েছিল কাশী চন্দের দলকে।

মণি দত্ত একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। সে জানে, খুব ভাল ভাবে জানে। সপ্তাহে একদিন দুদিন সে বাড়ি আসে, গভীর রাত্রে সে তার বাড়ির পাশের রাস্তায় শুনতে পায় এই অধঃপতিত ব্রাহ্মণ-সন্তানদের মত্ত কণ্ঠের বীভৎস চীৎকার, ওই পথেই যেতে হয় মদের দোকান, ওই পথেই তার বাড়ির অদূরে বাস করে দুজন পিতৃমাতৃহীনা তরুণী স্বৈরিণী।

সঙ্গে সঙ্গে সে হাসলেও। কটু তিক্ত হাসি। কিছুদিন আগে এমনই একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান ওই স্বৈরিণী দুটির আনুগত্যের অভাবের জন্য বিরক্ত হয়ে সমাজ ও গ্রামের কল্যাণের জন্য মেয়ে দুটিকে নির্বাসনে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল। তাদের ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাবে আশা দিয়ে একদা রাত্রে তাদের নিয়ে গ্রাম ত্যাগ ক'রে ওই সাত মাইল দূরের রেল-স্টেশনে ট্রেনে

চাপিয়ে দিয়ে নিজে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল। হতভাগিনী দুটি তবু নির্বাসিত হয় নি, রেল-কর্মচারীদের দেহমূল্য দিয়ে কোন রকমে ফিরে এসেছিল। গভীর রাত্রে রেল-স্টেশনে নেমে তারই দোকানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, তাদের পাড়ার মধ্যে খিড়কির এবং স্নানের পুকুরের আশেপাশেও এদের মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বন্দুক হাতে মিথ্যা পাখির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

এতদিন এর প্রতিবিধানের চেষ্টা হয় নি এমন নয়, কিন্তু সে হয়েছে অন্যভাবে। স্বর্ণভূষণবাবু রাধাকান্তবাবু বংশলোচনবাবুর দরবারে প্রধানেরা যেতেন, সবিনয়ে বলতেন, আপনারা যদি ওদের শাসন না করেন বাবু, তবে আমরা যাই কোথা বলুন?

তাঁরা মিষ্ট কথাই বলতেন। ভরসাও দিতেন, শাসন করবেন। কখনও কখনও ক্ষিপ্ত হয়েও উঠতেন বিনত অভিযোগকারীর উপরেই। চীৎকার করে বলতেন, ঘর সামালো গিয়ে, ঘর সামালো।

মজলিসও মধ্যে মধ্যে হ'ত।

আজকের মজলিসে অকস্মাৎ কথাটা উঠে পড়ল। শুরু হয়েছিল রাধাকান্তের কাশী যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে। যে অপমানে অপমানিত করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, সে অপমান যে কতখানি নিষ্ঠুর, কতখানি মর্মান্তিক, আলোচনার প্রারম্ভ তারই পরিমাণ-নির্ণয় নিয়ে। তার মধ্যে ছিল সহানুভূতি।

অন্যায় হয়েছে। কাজটা উচিত হয় নি। গোপীচন্দ্রবাবু—

গোপীচন্দ্রকে দোষ দিতে মন তাদের সায় দেয় নি।

গোপীচন্দ্রবাবু কি করবেন? তিনি তো সাহেবকে বললেন—

তিনি কথাটা সাহেবের কানে না তুললেই পারতেন।

তিনি কখনও তোলেন নি কানে। তিনি পারেন না তুলতে, সে মানুষই নন তিনি। আমি জানি। আমি শুনেছি। থানা থেকে শুনেছি।

এ কথাটা সকলেই স্বীকার করে। সাহেবের কানে কথা তোলবার মত ব্যক্তি তিনি নন। তবু একজন প্রশ্ন করে, তবে কি বাতাসে গেল কথাটা?

তাই যায় হে, তাই যায়। যখন কাল বিরূপ হয়, অদৃষ্ট মন্দ হয়—

মণি দত্ত অকস্মাৎ বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ল, ব'লে উঠল, না, কাল নয়,—অদৃষ্ট নয়, ভগবানের শাস্তি।

সমস্ত মজলিসটির চেহারা মুহূর্তে পাল্টে গেল। সকলের বুকের মধ্যে যেন উঠে পড়ল কালবৈশাখীর ঝড়। আয়োজন সব প্রস্তুতই ছিল। প্রায় একশো বৎসর দীর্ঘ একটি দিনের উত্তাপ জমা হয়ে ছিল। একশো বছর ধ'রে ওই কয়েকটি বংশ এখানকার সমাজকে শাসন ক'রে এসেছে। ব্রাহ্মণ জমিদার। কিন্তু ব্রাহ্মণের তপস্যা-ত্যাগ-বিবর্জিত শুধু ক্রোধ আর অহঙ্কার-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ, উনবিংশ শতাব্দীর আমিরী ও নবাবী প্রভাবিত ভোগলোলুপ ভ্রষ্টচরিত্র জমিদার। উদারতা ছিল না এমন নয়, দানও ছিল, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি ছিল শাসনের কঠোরতা, শোষণও দিল অপরিমিত। তার ফলে উত্তপ্ত হয়েছিল জীবন পৃথিবী। তৃতীয় প্রহরে সূর্যের প্রখরতম উত্তাপের জ্বালার মত দত্ত সমাজপতির কপালে কাচ-ফোটার স্মৃতি হয়েছিল অসহনীয়। তখন থেকেই নবগ্রামের দিগন্তে বাতাসে উঠেছিল এক টুকরো কালো মেঘ। উত্তপ্ত লঘু বায়ুমণ্ডল, দিগন্তে মেঘের টুকরো—আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল। অকস্মাৎ বাতাস বইল। মেঘ প্রসারিত হ'ল, পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ফুলে উঠল, বাতাসে লাল ধুলো উড়ল, বিদ্যুৎ চকিত হয়ে উঠল। কাল দিনান্ত ঘোষণা করবার পূর্বেই পৃথিবীর বুক থেকে ধুলো ওড়ে। আকাশ-মণ্ডলে মেঘ সঞ্চারিত হয়ে অস্তোন্মুখ সূর্যকে ঢেকে দিয়ে ঘোষণা করলে, উত্তপ্ত অসহনীয় সূর্য, আয়ু তোমার আমরা হরণ করলাম।

ভাবতে ভাবতে সন্তোষবাবু শিউরে উঠলেন। মনে প'ড়ে গেল তাঁর পুরাণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত। কত মহামহিমময় বংশ এই ভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

দুটি হাত জোড় ক'রে তিনি প্রণাম করলেন।

ভগবানকে নয়, ইষ্টদেবতাকে নয়, মানব-প্রকৃতিকে প্রণাম করলেন।

মুখুজ্জে!

সন্তোষবাবু এমনই নিমগ্ন ছিলেন নিজের চিন্তায় যে, দরজার ওপারে ডাক শুনে তাঁর মনে হ'ল, কেউ যেন বহু দূর থেকে তাঁকে ডাকছে। চোখের পাতা চকিত হয়ে উঠল, তারা দুটি একবার চঞ্চল হয়ে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরল, তিনি যেন তাঁর অন্তরলোক দৃষ্টিপাত ক'রে বুঝতে চাইলেন, এ কণ্ঠস্বর শুনে কাকে মনে পড়ে? কে?

ঘরে ঢুকলেন স্বর্ণবাবু।

সন্তোষবাবু এবার সচেতন হয়ে উঠলেন, হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তুমি?

গোঁফে তা দিয়ে স্বর্ণবাবু বললেন, সংশয় হ'ল কেন?

এবার সন্তোষবাবু হাসলেন, বললেন, সংশয় নয়। ধ্যান করছিলাম, তুমি ডাকলে, ঠিক বুঝতে পারলাম না কার গলা।

হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন স্বর্ণবাবু—অসময়ে এমন জামা গায়ে দিয়ে বিছানার উপর ব'সেই ধ্যান! কি রকম ধ্যান হে? ভগবানের না মানুষের?

তুমি ঠিকই ধরেছ স্বর্ণবাবু। মানুষের ধ্যানই করছিলাম। তোমাদের নবগ্রামে এসে ভগবানকে ধ্যান করা ভুলেই গেলাম একরকম।

আমি জানি তুমি কার ধ্যান করছিলে। তারই কথাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

সন্তোষবাবু শঙ্কাচঞ্চল হয়ে উঠলেন মুহূর্তে। স্বর্ণবাবুর প্রকৃতি তিনি জানেন।

স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, রাধাকান্তের স্ত্রী তোমার সঙ্গে ঘোমটা খুলে কথা বলেছে? তুমি রাধাকান্তের বাড়ি গিয়েছিলে, তোমায় সমাদর ক'রে আসন পেতে বসিয়েছে রাধাকান্তের স্ত্রী?

সন্তোষবাবু স্থির দৃষ্টিতে স্বর্ণবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন স্বর্ণবাবু। বললেন, কাজটা তোমার উচিত হয় নি মুখুজ্জে।

এবার ধীর কণ্ঠে সন্তোষবাবু জবাব দিলেন, আমি তোমাদের ঘরজামাই স্বর্ণবাবু, তোমরা আমাকে পোষ্য মনে কর, কথাটা সত্যও বটে। সুতরাং এর জবাবদিহি তুমি চাইতে এসেছ। কিন্তু ভাই, তোমাদের পোষ্য যখন, তখন এর ঠিক সত্য জবাবটা আমি তো দিতে পারব না। কারণ জবাবটা একটু কঠোর হবে। তুমি বরং এর জবাবটা ওই ভদ্রমহিলাটির কাছে চাইলে ঠিক জবাব পাবে স্বর্ণবাবু।

চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু।—বলছ কি মুখুজ্জে?

আমি তাঁর ছেলেটিকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। রাধাকান্তকে ছেড়ে বেচারী কখনও থাকে নি। আজ দশ-বারো দিন রাধাকান্ত চ'লে গেছেন, ছেলেটি উদাসীর মত ঘুরে বেড়ায়। আজ থিয়েটারের মহলার ঘরে বড় টেবিল-হারমোনিয়ামটি—

আমি শুনেছি সে কথা।—স্বর্ণবাবু গোঁফে তা দিলেন।

শুনেছো? ভাল। ওখান থেকে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম, একটু সান্ত্বনা দেব ভেবেছিলাম। ছেলেটি ব'সে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কোলে নিয়ে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিতে

গেলাম, তা রাধাকান্তবাবুর স্ত্রী ঘোমটা খুলে বেরিয়ে এলেন। আমি তোমাদের কথা তো জানি, বিব্রত হয়ে ছেলেটিকে দিয়ে পালাতে চাইলাম, তা বললেন—আমার স্বামী আর ফিরবেন না—

ফিরবেন না?—চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু।—আমারও সন্দেহ হয়েছিল, রাধাকান্তদা গৃহত্যাগ করেছেন।

হ্যাঁ। বললেন—তিনি গিয়েছেন, কিন্তু আমি যাব না নবগ্রাম থেকে। এইখানে থেকে আমি আমার ছেলেকে মানুষ করব। তাকে রক্ষা যখন করতে হবে, তখন ঘোমটা না খুলে আমার উপায় কি? তাই ঘোমটা খুলেছি। তুমি যাও, গেলে ঘোমটা খুলেই তিনি তোমার কথার জবাব দেবেন।

স্বর্ণবাবু তা-দেওয়া গোঁফের সুচোলো অগ্রভাগ টেনে এবার দাঁত দিয়ে টিপে ধরলেন। একটি তরুণী বধূ এই নবগ্রামের সমাজের মত সমাজে এমন ভাবে সাহস ধ'রে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে? গ্রামের কন্যারা পারে, কুলীন-সমাজের কন্যাদের অধিকার অবাধ। বধূরা পারে প্রৌঢ়াবস্থায়। তাও যদি ছেলেরা অনুগত হয় তবে, অথবা তিনি যদি নিজেই স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী হন তবে। কিন্তু এই বধূটি! হয়তো কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেছে মাত্র।

সন্তোষবাবু প্রশ্ন করলেন, আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না স্বর্ণবাবু?

ভাবছি।—কিছুক্ষণ পর বললেন, বিচিত্র মেয়ে! কিন্তু—

কিন্তু আবার কি?

ভাবছি! মুখুজ্জে, এখানকার এই কুরুক্ষেত্রে, এই ভীষণ রণতাণ্ডব-কোলাহলের মধ্যে ওই মেয়েটি কি ভাবে কি করবে? শুনেছি, এমন মিষ্ট ভাষা নাকি শোনা যায় না, চীৎকার কেউ কখনও শোনে নি। আমাদের রজনীদিদি লেখাপড়াও জানে, কথা-বার্তাও গুছিয়ে বলতে পারে—। স্বর্ণবাবু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে এবার বললেন, আমাদের বাড়ির মেয়ে, আমারও দিদি, তাঁকে ওই মেয়েটির বয়সেও দেখেছি। এতদিনে তিনি সমাজের মধ্যে কথা বলতে পারেন, কিন্তু চীৎকার ক'রে বলতে হয়। ছোটলোকদের সঙ্গে কথা বলতে 'হারামজাদা' ব'লে গাল দিতে হয়। 'চোপ রও' ব'লে ধমক দিতে হয়। বখা বোনপো ভূপতি অমূল্য মাতাল হয়ে বাড়ি এসে সেদিন দরজায় প'ড়ে গিয়েছিল। কে ওঠাবে? রজনীদিদি গিয়েছিলেন তুলতে। অমূল্য চুলের মুঠি ধ'রে টানতে শুরু করেছিল, রজনীদিদি অমূল্যর গালে ঠাস ক'রে

চড় মেরেছিলেন। তাই তো ভাবছি মুখুজ্জে, এ মেয়ে দাঁড়াল বটে, কিন্তু—

সন্তোষবাবু হেসে বললেন, কিন্তু কিছু নাই স্বর্ণবাবু। ওরা হ'ল শক্তির জাত। দশমহাবিদ্যার মত ওদের রূপ কল্পনা করা যায় না ভাই। শিবের ঘরে শান্তশিষ্ট বধূরূপা সতী, তার মধ্যে ছিন্নমস্তা ধূমাবতী রূপ কি ক'রে লুকিয়ে ছিল বলতে পার? মেয়েটি শহরের মেয়ে, নতুন কালের অনেক কিছু ওর মধ্যে আছে ভাই। কয়েকটা কথা ব'লেই বুঝেছি আমি। বুঝেছ না।—ঘাড় নেড়ে যেন পরম উপভোগ ক'রে বললেন, কালী তারা দেখেছ ভাই, এবার বগলা মাতঙ্গী দেখ।

স্বর্ণবাবু বললেন, তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলবে একটা কথা?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সন্তোষবাবু শুধু মুখের দিকে তাকালেন।

ব'লো, আমার উপদেশ নিয়ে চললে ওঁর কোন চিন্তা নাই। রাধাকান্তদাকে আমি ভালবাসতাম সন্তোষবাবু। মনে মনে অনেক আঁকষা-আঁকষি ছিল, কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন সে আর সংসারে সংসারী যারা, তাদের মধ্যে কার না হয়! তবু সে-ই ছিল আমার হিতৈষী বন্ধু।

সন্তোষবাবু বলতে গেলেন, ও-মেয়েকে যতটুকু চিনেছি স্বর্ণবাবু, তাতে কারও পরামর্শে চলবার মেয়ে ও নয়। কিন্তু আত্মসম্বরণ করলেন, বললেন, বলব। যদি দেখা—

থাম তো মুখুজ্জে।—চকিত হয়ে স্বর্ণবাবু উঠে উত্তর দিকের জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন, জানলাটা খুলতে খুলতেই বললেন, কে কাঁদছে?

সত্যিই কেউ কাঁদছে। নারীকণ্ঠের আর্তবিলাপ। কে? কাশীর বউ? ঘাড় নাড়লেন সন্তোষবাবু। রাধাকান্তের মৃত্যু-সংবাদও যদি এসে থাকে, তবে কাশীর বউ মাটির উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে থাকবে, নিথর হয়ে প'ড়ে থাকবে, দেহখানি পর্যন্ত আবেশে কাঁপবে না।

স্বর্ণবাবু বললেন, কিশোরদের বাড়িতে কান্না। কি হ'ল?

ও-জানলাটা থেকে স'রে এসে পাশের ঘরে গিয়ে আর একটা জানলা তিনি খুলে ফেললেন, ওখান থেকে কিশোরদের বাড়ির উঠানটা স্পষ্ট দেখা যায়।

কি হ'ল? একজন মহিলা আর্তস্বরে কাঁদছেন, ওরে, তুই কি করলি রে?

ও তো কিশোরের মা।

উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কিশোরের কাকা। কিশোরের বাপ বিদেশে, সরকারী চাকুরে তিনি। ও কে বেরিয়ে আসছে মাথা হেঁট ক'রে?

ডাক্তার। এখানকার পাগল ডাক্তারটি।

স্বর্ণবাবু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলেন। সন্তোষবাবু বললেন, দাঁড়াও হে স্বর্ণবাবু, আমিও যাব। কিন্তু ব্যাপাব কি বল তো? কিশোর—! কিশোর তো কলকাতায়! তার কিছু হ'লে বাড়ি সুদ্ধ লোক—

স্বর্ণবাবু বললেন, মনে হচ্ছে কিশোরের মামার বাডির কেউ এসেছিল; তারই বোধ হয় কিছু হয়ে থাকবে। ডাক্তাব মাথা হেঁট ক'বে বেরিয়ে গেল দেখলে না! অথচ একা কিশোরের মা ছাড়া কেউ কাঁদছে না।

সম্ভবত। তোমার বুদ্ধি বড তীক্ষ্ণ স্বর্ণবাবু।—অকপটে স্বীকার কবলেন সন্তোষবাবু।

*　　　*　　　*　　　*

স্বর্ণবাবুর কাছারির বারান্দা থেকে খানিকটা উত্তরেই কিশোরদের বাড়ির বাইরের দরজা। কাছারিতে উঠেই স্বর্ণবাবু ঘবখানাকে অতিক্রম ক'রে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার এবং ঠেস-দেওয়া বেঞ্চি সাজানো থাকে। ভারী ভারী সেকালের চেয়ার, বাগানের উৎকৃষ্ট শিশুকাঠ থেকে মিস্ত্রী দিয়ে বাডিতে তৈরি করানো আসবাব। এই বারান্দাতেই সাজানো থাকে, গরমেব সময় সামনে রাস্তার উপর জল ছড়িয়ে ওখানেই নামানো হয়। এইখানকার মজলিসেই দত্তপ্রধানের সেই মর্মান্তিক অপমান হয়েছিল। আজ বারান্দার একখানা চেয়ারে ব'সে ছিল মণি দত্ত। মণি দত্ত স্বর্ণবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়াল। স্বর্ণবাবুব ওদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না, তিনি এসে বারান্দার ধাবে দাঁড়িযে রাস্তার দিকে তাকালেন। ওই ডাক্তার চ'লে যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, ডাক্তার! ডাক্তার!

মণি দত্ত এসে পাশে দাঁড়িয়ে তার পূর্বপুরুষ যতখানি হেঁট হয়ে নমস্কার জানিয়ে বলেছিল—প্রণাম, তার চেয়ে অনেক কম হেঁট হয়ে নমস্কার করলে, মুখে কোন কথা বললে না।

স্বর্ণবাবু ফিরে তাকালেন। ভ্রূ দুটি তাঁর কুঞ্চিত হযে উঠল। কপালে শিরা ফুলে উঠল। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল গোঁফে তা দিতে। গোঁফে তা দিতে শুরু করলেন। দৃষ্টি তির্যক তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। মুখে শুধু বললেন, কি?

হেসে মণি দত্ত বললে, একটু দরকার আছে।

স্বর্ণবাবু সবিস্ময়ে দেখছিলেন মণি দত্তকে। আধুনিকতম ভদ্র বেশভূষা তার সর্বাঙ্গে। সাদা শক্ত কফওয়ালা শার্ট, কালাপেড়ে ধুতি কোঁচা উল্টে পরেছে, পায়ে পাশে-স্প্রিংওয়ালা বার্নিশ-করা জুতো, কাঁধে চাদর। ঠিক এই ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ধত ব'লে মনে হ'ল। হঠাৎ রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে প'ড়ে গেল দীর্ঘকাল আগের কাহিনী। চোখে আগুন জ্ব'লে উঠল।

চোখে আগুন মণি দত্তেরও জ্ব'লে উঠল। ঠিক একই মুহূর্তে তারও ঠিক এই কথা মনে প'ড়ে গেছে।

ঠিক এই মুহূর্তে ডাক্তার এসে রাস্তার উপরে দাঁড়ালেন। বললেন, আমায় ডাকলেন?

কি ব্যাপার ডাক্তার? ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে, কে—বোধ হয় কিশোরের মা কাঁদছে—

হ্যাঁ, কিশোর বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়ে মিশনে সন্ন্যাসী হয়েছে।

স্বর্ণবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিস্ময়ে। সন্তোষবাবু সামনের রাস্তাটার দিকে, রাস্তাটা যেখানে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাঠে পড়েছে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। মণি দত্ত শুধু ব'লে উঠল, এর জন্য আপনিই কিন্তু দায়ী ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার উত্তর দিলেন না, মণির মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন—ম্লান হাসি। অপরাধ যেন স্বীকার ক'রে নিলেন। মণি দত্ত বললে, দরিদ্রনারায়ণ, সেবাধর্ম—এই সব ঢোকালেন ওর মাথায়—। আক্ষেপে আর কথা বলতে পারল না সে, বার বার ঘাড় নেড়ে নিজের আবেগটুকু প্রকাশ করল।

এবার স্বর্ণবাবু প্রশ্ন করলেন, কি ডাক্তার?

ডাক্তার একখানি পত্র বের ক'রে হাতে দিলেন। কিশোরের পত্র। স্বর্ণবাবু পড়লেন পত্র। গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর লেখা। তাঁদের আমলের মত টানা লেখা নয়। স্বর্ণবাবু বললেন, ছেলেটি লেখাপড়ায় খুব ভাল শুনেছিলাম, কিন্তু হাতের লেখা এমন কাঁচা কেন? এখনও পাকা টান আসে নি!

স্বর্ণবাবুর বিস্ময় কেটে গেছে। মণি দত্ত সম্পর্কে সচেতন তিনি, মনের মধ্যে আভিজাত্যের হিসাববোধ জেগে উঠেছে, আবেগ বিস্ময় সমস্ত কিছুকে বেঁধে ফেলেছেন, চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্লেষ-মিশ্রিত কৌতুক, কপালে কয়েকটা রেখা দাঁড়িয়েছে ব্যঙ্গহাস্যদ্যোতক প্রশ্ন-চিহ্নের মত, কণ্ঠস্বরে

ফুটে উঠছে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ঔদাসীন্য। কয়েক লাইন প'ড়ে ডাক্তারের দিকে চিঠিখানা বাড়িয়ে বললেন, নাও। 'এ যেন আমার জীবনদেবতার নির্দেশ'। 'জীবনদেবতা' আবার কে হে? অ্যাঁ? বুঝতে পারলাম না। ভাষাই বুঝলাম না আদ্ধেক।

কিশোর লিখেছে—

আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। আপনিই আমার পিপাসায় ভোগবতীর কূলের পথ দেখাইয়াছিলেন। আপনি আমার পথপ্রদর্শক। সেবা-সমিতি গড়িয়া আপনার সঙ্গে কাজ করিতে করিতে কতদিন ভাবিয়াছি, জীবন সার্থক হইবে আমার। নবগ্রামের চারিদিকে একটি অঞ্চল জুড়িয়া এই মহাধর্ম পালন করিয়া যাইব; একদিন বলিতে পারিব—

'পেয়েছি আমার শেষ
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
আমার জীবনে জীবন লভিয়া
জাগ রে সকল দেশ।'

যেদিন সমিতির গণ্ডি বাড়াইয়া জগন্নাথের স্ত্রীকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলাম, মনে আছে আপনার সেদিনের কথা? জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রান্তরের মধ্যে বন্দে মাতরম্ গান গাহিতে গাহিতে মনে হইয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ এবং আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র—দুইটি দীপ্ত গ্রহ আমার জীবনাকাশে এক হইয়া মিশিয়া গিয়া সূর্যের মত রূপ ধারণ করিয়া উদিত হইলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সব উলোট-পালোট হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে কুক্ষণে গোপীচন্দ্র-বাবুর চোখে পড়িয়াছিলাম। তিনি আপনার কাছে আসিলেন; আপনি সাগ্রহে তাঁহাকে লইয়া সমিতিকে বৃহৎ আকার—মহৎ রূপ দিতে গেলেন। আমার মন সায় দেয় নাই। কিছু মনে করিবেন না, আপনি ভুল করিয়াছিলেন। সমিতি কেমন ভাবে সমারোহের ঐকতান-বাদনের উচ্চধ্বনির মধ্যে উপবাসী পুরোহিতের কণ্ঠোচ্চারিত পূজামন্ত্রের মত ডুবিয়া গেল দেখিলেন? আপনার মনের দুঃখ আমি জানি। আমার দুঃখ-বেদনাও আপনি অনুভব করিতে পারেন। স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দিন সমিতিরও সভা হইবার কথা ছিল। আমি জানতাম, সভা হইবে একটা বাক্‌সর্বস্ব অনুষ্ঠান। তাই থাকিব না বলিয়া পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু থাকিতেও পারি নাই। সেদিন সভার শেষে আমি যখন অপমানিত রাধাকান্তদাদাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসি, আপনি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আমি থাকিব না সঙ্কল্প করিয়া নবগ্রাম হইতে চলিয়া আসিয়াও

কিন্তু থাকিতে পারি নাই। ফিরিয়া গিয়াছিলাম। মনে মনে কতবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, যদি আমারই ভুল হইয়া থাকে, যদি সার্থক হইয়া উঠে! পুণ্যবান কীর্তিমান গোপীচন্দ্রবাবুর সংস্পর্শেরও তো একটা কল্যাণ আছে, শক্তি আছে। তাই ফিরিয়া গিয়াছিলাম। পথে পথে ঘুরিয়া যখন গ্রামে ঢুকিলাম, তখনই দেখিলাম, সাহেবের টেবিলের পাশে দাঁড়াইয়া রাধাকান্তদা কাঁপিতেছিলেন। আমি থাকিতে পারিলাম না। অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম। আপনিও উঠিয়া আসিলেন। কিন্তু আপনাকে বলিতে কিছু পারিলাম না। রাধাকান্তবাবু বিনা কারণে অপমানিত হইয়াছেন, দুঃখ সেই জন্য। অন্যথায় তাঁহার জন্য কোন বেদনা নাই। বেদনা অবশ্য কাশীর দিদির জন্য হয়। কিন্তু সমস্ত বেদনা-দুঃখকে ছাড়াইয়া দুঃখ হইল—সমিতির কিছু হইল না। গোপনে গোপনে আমরা কাজ করিতাম, একটি বীজ হইতে নির্গত অঙ্কুরের মত বাড়িত, আমরা জল দিতাম, পরিচর্যা করিতাম, স্বপ্ন দেখিতাম, একদিন বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হইবে। আজ সেই গাছ রাজার বাগানে গিয়ে স্থান পাইল। মালীর হাতে রাজার হুকুমমত তাহার পরিচর্যা হইবে। আমি বেশ বুঝিলাম, ও-অঙ্কুরের মৃত্যু হইল। গাছও যদি হয়, তবে রাজার রুচিমত ডালপালা ছাঁটিয়া হয়তো মন্দিরের মত বা গম্বুজের মত অথবা বরাতমত কোন সুদৃশ্য আকার ধারণ করিবে, উহার স্বাভাবিক ছায়াদানের, ফলদানের মহিমা ভ্রষ্ট হইবে। প্রাণে অসহ্য যাতনা অনুভব করিলাম। সমস্ত সন্ধ্যা ভাবিয়া মনে হইল, আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ আমার জীবনদেবতা পথনির্দেশ করিলেন। বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্ত্রে সত্য সত্য দীক্ষা লইব। এই আমার পথ। এই পথেই আমার মুক্তি। সেই রাত্রেই সাইকেল করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মঠে আশ্রয় লইয়াছি। দীক্ষা লইব কাল। আপনাকেই শুধু জানাইলাম। বাড়িতে জানাইবেন। মা লিখিতে পড়িতে জানেন না, জানিলে তাঁহাকে পত্র লিখিতাম। এখান হইতে সাধনা করিয়া একদিন নবগ্রামে স্বামীজীর মন্ত্র—মিশনের পতাকা বহন করিয়া লইয়া যাইব। সেদিন কিন্তু আপনাকে চাই। ইতি

প্রণত
কিশোর

ডাক্তার পত্রখানি নিয়ে সযত্নে পকেটে পুরে বললেন, আমি যাই।

মণি দত্ত হঠাৎ বারান্দা থেকে নেমে পড়ল, বললে, চলুন, আমিও যাব।

স্বর্ণবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, কি হে, কি দরকার ছিল—না ব'লেই চ'লে যাচ্ছ!

ও, হ্যাঁ।—মণি দাঁড়াল।—দরকার অনেকই ছিল। তা—। একটু ভেবে বললে, বড় দরকারের কথাটাই ব'লে যাই। বাকিগুলো পরে হবে। আপনার এম. ই. ইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটীতে আমি গার্জেনদের তরফ থেকে মেম্বর আছি। ও-পদে আমি ইস্তফা দিচ্ছি।

পকেট থেকে একখানা কাগজ বের ক'রে স্বর্ণবাবুর হাতে দিয়ে বললে, হাই ইস্কুলের কমিটীতে আমাকে নিয়েছেন কিনা। গোপীবাবুকে আমি প্রণাম করতে গিয়েছিলাম হাই ইস্কুল করেছেন—দেশে একটা মহাকীর্তি। তা বাবু বললেন—তোমাকে আমার কমিটীতে নিচ্ছি দত্ত।

মণি হাসলে।—দু জায়গায় মেম্বর থেকে কাজও হবে না, আর—আর ঠিকও হবে না। আচ্ছা—

স্বর্ণবাবু ঠোঁট দুটিতে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে কাগজখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

মণি দেখেও দেখলে না, চ'লে গেল ডাক্তারের পিছনে।—ডাক্তারবাবু!

সন্তোষবাবু চেয়ে রয়েছেন পথের দিকে। পথ যেখানে গিয়ে প্রান্তরে মিশেছে সেইখানের দিকে সেই তেমনিই ভাবে চেয়ে রয়েছেন।

স্বর্ণবাবু হঠাৎ পথে নামলেন।

তাঁর বাপের প্রতিষ্ঠিত এম. ই. স্কুল ওই অদূরে। আগে কলরব উঠত, ছেলেরা কলরব ক'রে পড়ত। আজ স্তিমিত কলরব ক্ষীণ ভাবে বাইরে আসছে। তিনি এগিয়ে গেলেন সেই দিকে। বাড়িখানা জীর্ণ হয় নি, মলিন হয়েছে, অনেক দিন চুনকাম হয় নি, ভেঙেও অবশ্য গিয়েছে কিছু কিছু জায়গা।

রাধাকান্তের মত দেশ ছেড়ে পালালে কেমন হয়? পরিত্রাণ পেয়েছে রাধাকান্ত। লোক ভাল ছিল। মনে পড়ল, একদিন রাধাকান্তের বৈঠকখানায় গিয়েছিলেন, রাধাকান্ত ছিলেন না, তাঁর ডায়রিখানা টেবিলের উপর প'ড়ে ছিল। খুলে পড়েছিলেন সেদিনের শেষ পৃষ্ঠার লেখা—

"হে আশুতোষ, সম্মুখে আবার মহাসমস্যা। এ সমস্যায় তুমি আমার কর্তব্য নির্দেশ কর। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি পরের কীর্তি লোপ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী। গোপীচন্দ্র স্বর্ণের পিতার কীর্তি লোপে উদ্যত হইয়াছে। আবার শাস্ত্রে রহিয়াছে, পুণ্য কীর্তি করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া বা সাহায্য না করিয়া যে ব্যক্তি পুণ্য কীর্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত জন্মায়, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মদ্বেষী। গোপীচন্দ্র যে কীর্তি করিতে উদ্যত, সে মহা পুণ্য কীর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কর্তব্য কি?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্বর্ণবাবু। সে তাঁর সত্যই বন্ধু ছিল। ইস্কুল-ঘরে ঢুকতেই ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। হেডমাস্টার কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ব'সে ছিলেন। চকিত হয়ে তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন।

স্বর্ণবাবু চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বললেন, একটা এস্টিমেট করুন দেখি!

এস্টিমেট?

এই সব মেরামতের। মেরামত করানো দরকার।

সরকার থেকে পত্র লিখেছে, দেখেছেন?

কই! না।

পত্র তো আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। কালই তো ফেরত দিয়েছে নায়েব।

আমি দেখি নি।

ঘর মেরামতের জন্য সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করা হয়েছিল, লিখেছে—ওখানে হাইস্কুল হচ্ছে, এম. ই. স্কুলে সাহায্য দেওয়ার সার্থকতা গভর্মেণ্ট দেখতে পাচ্ছেন না।

তা হোক। আমিই দোব টাকা।

হেডমাস্টার ধীরে ধীরে চেয়ারেব কাছ থেকে বেরিয়ে এলেন, বাইরের দিকে পা বাড়ালেন, মুখে না ব'লেও স্বর্ণবাবুকে বাইরে নিয়ে যাবার অভিপ্রায় তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ইঙ্গিত জানাল। স্বর্ণবাবু বুদ্ধিমান, তিনি বুঝলেন, এমন কিছু বলবেন যা এই ছাত্রমণ্ডলীর সামনে বলা উচিত হবে না। এই ছেলেরা—

স্বর্ণবাবু মুহূর্তে বিচলিত হয়ে উঠলেন।

মনের ধীরতা স্থিরতা সব যেন চ'লে গেছে তাঁর জীবন থেকে। তিনি যেন অহরহ অগ্নিশিখার মত জ্বলছেন, সমান্য বায়ুপ্রবাহে কেঁপে যান, নিবে যাবার ভয়ে প্রবলতর শিখায় জ্ব'লে উঠে নিজেকে দগ্ধ ক'রে যান। মুহূর্তে তাঁর মনে হ'ল, কি অকৃতজ্ঞ এই ছেলেগুলি! এতকাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে এই গ্রাম কত উপকৃত হয়েছে, সে কথা মনে হয় না ওদের, নিজেরা আজও পড়ছে—সেও মনে করে না, তাঁর ইস্কুলের নিন্দাবাদ প্রচার ক'রে বেড়ায়, নিত্য বিকালে ছুটে যায় গোপীচন্দ্রের ইস্কুলডাঙায়, দেখতে যায় প্রকাণ্ড বড় পাকা ইমারত উঠছে। বড় বড় জানলা বসছে, বড় বড় গোল থাম দেওয়া বারান্দা, প্রশস্ত ঘর দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে। গোপীচন্দ্রের প্রশংসায় ভ'রে দেয় নবগ্রামের আকাশ। তারা প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে কবে হাই-ইংলিশ ইস্কুলের দ্বারোদঘাটন হবে, তারা সেখানে গিয়ে ভর্তি হবে। ভর্তি

হ'লেই সপ্তম স্বর্গের অধিকারী হবে তারা, জীবনের সকল দুঃখ ঘুচে যাবে, সকলেই হবে মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ। নবগ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা হবে মহা-মানব। তাঁর ইচ্ছে হ'ল, এই মুহূর্তে ছেলেগুলোকে বের ক'রে দিয়ে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে দেন। একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেন ইস্কুল-ঘরের খড়ের চালে। সেই আগুন গোটা গ্রামে ছড়িয়ে দেন। গোপীচন্দ্রের পাকা বাড়ি —পাকা ইস্কুল-ঘর পুড়বে না, থাকবে। থাক্। শুধু ওই গোপীচন্দ্র আর তার কীর্তিগুলিই থাক্, সে ভোগ করতে যেন কেউ না থাকে নবগ্রামে। ছারখার হয়ে যাক তাঁর কীর্তি অগ্নিশিখার উত্তাপের স্পর্শে।

হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলেন স্বর্ণবাবু। হেডমাস্টার বিস্মিত হলেন। কি হ'ল? তিনিও দ্রুত অনুসরণ ক'রে বাইরে এসে বললেন, শিক্ষকদের মাইনে বাকি পড়েছে তিন মাসের উপর। আগে—

থমকে দাঁড়ালেন স্বর্ণবাবু।

আগে সেইগুলি দরকার। সকলেই চেষ্টা করছেন ও-ইস্কুলে চাকরির জন্যে।

ইস্কুল আমি বন্ধ ক'রে দিলাম। মাইনে আমার যখন হবে দেব।

চ'লে গেলেন তিনি হনহন ক'রে।

হেডমাস্টার ম্লান হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে এসে বসলেন নিজের আসনে। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করলেন। গোপীচন্দ্রের লেখা ছোট্ট এক টুকরো চিঠি। তাঁকে আজ ছুটির পর ইস্কুলের ডাঙায় গিয়ে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।

চিঠিখানি পকেটে পুরে তিনি আবার উদাস নেত্রে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। এ ইস্কুলে তিনি আজ পঁচিশ বৎসর চাকরি করছেন। আজ মনে পড়ছে এ ইস্কুলের সমৃদ্ধির—সমারোহের দিনের কথা। গুঞ্জন ক'রে পড়ছে ছেলেরা, তিনি পড়াচ্ছেন।—

"ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।"

মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন—তোমরা জান না। এটি হ'ল একটি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ।

কিশোর সেবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে সদ্য, সে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, জানি সার। ব'লেই আবৃত্তি করেছিল—

"Tell me not in mournful numbers
Life is but an empty dream."

কিশোর ইস্কুল থেকে বৃত্তি পেয়েছিল। ওঃ, সে দিন যে কি আনন্দ হয়েছিল তাঁর, স্বর্ণবাবুরও সে কি আনন্দ! গোটা ইস্কুলের ছেলেদের মিষ্টি খাইয়েছিলেন।

বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। মাস্টার ছেলেদের ধমক দিয়ে বললেন, চুপ চুপ। পড়। তিনি জানেন গোপীচন্দ্রের লোক এসেছে। সাইকেল এখানে একমাত্র পবিত্রর আছে।

মুখ বাড়িয়ে হেডমাস্টার দেখলেন, পবিত্র নিজেই এসেছে। সাইকেলের উপর চেপেই একটা পা বারান্দায় নামিয়ে কিছু ভাবছে। সম্ভবত নামবে অথবা তাঁকে ডাকবে, তাই ভাবছে।

মাস্টার নিজেই উঠে এলেন। গোপীচন্দ্রবাবুই পবিত্রকে পাঠিয়েছেন—তাঁর কাছেই পাঠিয়েছেন, তাতে তাঁর সন্দেহ রইল না। গোপীচন্দ্রবাবুর জ্ঞাতি তিনি, গোপীচন্দ্রবাবু তাঁকে ভালবাসেন, কৃতী কর্মী ভাগ্যবান গোপীচন্দ্রকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। কতবার গোপীচন্দ্রবাবু তাঁকে বলেছেন, তুমি এ মাস্টারি ছেড়ে দাও, আমার কলকাতার অপিসে চল, এ চাকরিতে জীবনে কি পাবে তুমি?

মাস্টার কিন্তু তা পারেন নি। প্রতিবারই মাথা চুলকে বলেছেন, ভেবে দেখি।

ভেবে দেখতে গিয়ে এ চাকরি কিছুতেই ছাড়তে পারেন নি। এত ছাত্র, তাদের শ্রদ্ধা, গোটা নবগ্রাম অঞ্চলের অভিভাবকদের সম্মান; তা ছাড়া বিদ্যার্জন এবং বিদ্যাদানের একটা নেশা, না, নেশা নয়—একটা আনন্দ পরিতৃপ্তি, এ ছেড়ে কিছুতেই তিনি ব্যবসায়ীর আপিসে চাকরি নিতে পারেন নি। নিজের মনেই বলেছেন, নাঃ। আমার দুঃখ কিসের দেখে এরা, কে জানে! আমি তো বুঝি নে কিছু। কিসের দুঃখ? নিজেই আবৃত্তি করেন—

> "Tell me not in mournful numbers
> Life is but an empty dream."

আজও আবৃত্তি করতে করতেই উঠে এসে বললেন, কি সংবাদ পবিত্রচন্দ্র?

পবিত্র অপ্রতিভ হয়ে বাইসিক্ল থেকে নেমে বললে, আপনার কাছেই এসেছি।

সে জানি। এবং তোমার বাবা পাঠিয়েছেন তাও জানি।

আজ্ঞে, বাবা নন, আমি এসেছি আপনার কাছে। আমরা থিয়েটার-

পার্টি করেছি, তার সঙ্গে একটি লাইব্রেরি করব। দুই মিলিয়ে ক্লাব করব। আজ একটি সভা হবে; আপনাকে যেতে হবে। বাবার সভাপতি হবার কথা ছিল। তা বাবার হঠাৎ কোমরে একটা এমন ব্যথা ধ'রে গেল যে, তিনি উঠতেই পারছেন না। অমরদাদা বললেন—আপনাকে সভাপতি হতে হবে।

প্রণাম মাস্টারবাবু। প্রণাম ছোটবাবু।

দুজনেই মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, গোপীচন্দ্রের কর্মচারী নবীন ঘোষ এসে দাঁড়িয়েছে কখন।—কর্তাবাবু পাঠালেন আপনাব কাছে। আপনাকে আজ দেখা করবার জন্মে বলছিলেন—

—হ্যাঁ। আমি যাব। পাঁচটার পরে যাব। পবিত্রর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের সভাও তো ইস্কুল-ডাঙাতেই হবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঘোষ বললে, আজ্ঞে, কর্তাবাবু আজ—। একটু ইতস্তত ক'রে বললে, আজ কেন, বোধ হয় চার-পাঁচ দিন নড়তে পাববেন না। ডাক্তার মানাও ক'রে গেল। কোমরে খচ ক'বে এমন খচকি ধরেছে। তাই বললেন, বাড়িতে দেখা করতে।

এবার মাস্টার প্রশ্ন না ক'বে পারলেন না, কি ক'রে এমন বেদনা হ'ল? হঠাৎ—

একেবারে হঠাৎ। এই তো কিছুক্ষণ আগে—। পবিত্র বললে, হঠাৎ কিশোরদের বাড়িতে কিশোরের মা কেঁদে উঠল, বাবা সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, উনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কে কেঁদে উঠল? 'কিশোর' ব'লে কাঁদছে, না?

বিলাপের মধ্যে এই নামটা কানে যেতেই তিনি চমকে উঠেছিলেন—কিশোর! কিশোর!

বিদ্যুতের দীর্ঘ আঁকাবাঁকা প্রতিফলনের মধ্যে কত ছবি তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠল। সাপের মুখের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কিশোর, শ্মশানের অর্জুন গাছের নীচে দেখলেন কিশোরকে, বর্ষার দূরাগত মেঘধ্বনির মত কিশোরের কণ্ঠের গানও তাঁর কানে বেজে উঠল। তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল নবীন সতেজ শিশু বনস্পতির উপর আকাশস্পর্শী বিরাট বনস্পতির যে স্নেহচ্ছায়া প্রসারিত হয় তেমনই স্নেহচ্ছায়াময় দৃষ্টি। তিনি কেঁপে উঠলেন, দ্রুত পদক্ষেপে নীচে নামতে গিয়ে একটা সিঁড়ি লঙ্ঘন ক'রে পা ফেলতেই কোমরে একটা আকস্মিক তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট শব্দ ক'রে ব'সে পড়লেন।

মাস্টারও চমকে উঠলেন।—কিশোর! কিশোর সন্ন্যাসী হয়েছে! রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষা নিয়েছে। আর তিনি কথা বলতে পারলেন না, গোপীচন্দ্র সম্পর্কে আর কোন কুশল-জিজ্ঞাসা কর্তব্য ছিল, কি ছিল না, সে প্রশ্নও তাঁর মনে উঠল না। স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিশোর! তাঁর ইচ্ছা ছিল কিশোর বিদেশ যায়, জাপান যায়। রুশ-বিজয়ী জাপান।

দ্বিপ্রহর শেষ হয়ে আসছে।

এলোমেলো গরম বাতাস মধ্যে মধ্যে এক-একটা দমকায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—গাছের পাকা পাতা ঝ'রে পড়ছে দুটো চারটে ক'রে। ধুলো উড়ছে, যেখানে গ্রামের পথ গ্রাম পার হয়ে খোলা মাঠে প্রান্তরে গিয়ে পড়েছে, সেখানে ঘূর্ণি উঠেছে। মাস্টার সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। কিশোর সন্ন্যাসী হয়ে গেল! বিচিত্র মতি এ দেশের মানুষের!

আরও খানিকটা দূরে স্বর্ণবাবুর কাছারির বারান্দায় সন্তোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও সেই ক্ষণটি থেকে শুরু ক'রে এখনও পর্যন্ত ওই স্থানটির দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন এই সংবাদটি শুনে ওই পথ ও প্রান্তরের সংযোগবিন্দু ছাড়া আর কোনখানে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, আবদ্ধ হয় না, হতে পারবে না।

ওই সংযোগস্থল থেকে যাত্রা শুরু ক'রে চ'লে যাচ্ছে কিশোর। সন্ন্যাসী কিশোর—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, হাতে দণ্ড। চ'লে যাচ্ছে—চ'লে যাচ্ছে—চ'লে যাচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসী সন্তোষবাবু মনে মনে মহাভারত রামায়ণ সন্ধান করছিলেন উপমার জন্য। পরমতত্ত্বের সন্ধানে, প্রাণের ব্যাকুলতায়, দুঃখের তাড়নায়, শান্তির প্রত্যাশায় দ্বাপর-ত্রেতার মন্দির ও অরণ্যময় ভারতের পটভূমিতে চ'লে গেল কত সন্ন্যাসী, কত যোগী, কত ব্রহ্মচারী, কত যতী, কত দণ্ডী, কত মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধভিক্ষু, কত জৈন তপস্বী, কত বাউল, কত বৈষ্ণব, কত শৈব, কত শাক্ত তান্ত্রিক বামাচারী, কত অবধূত—তাদের সঙ্গে রাধাকান্তকেও চ'লে যেতে দেখলেন; কিন্তু তাদের মিছিলের সঙ্গে তিনি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারলেন না কিশোরকে।

নূতন কালে কলিযুগের ভারতোপাখ্যানে কিশোরের উপমা মিলবে। সে উপাখ্যান তাঁর জানা নাই। তবে তার পথ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে আর্ত পীড়িত মানুষের পল্লীর মধ্য

দিয়ে তার পথ। সেখানেই তার সাধনক্ষেত্র,—যেখানে বেদনার্ত মানুষ, সেইখানেই তার দেবতা।

বিবেকানন্দের বার্তা তিনি শুনেছেন। কিছু কিছু পড়েছেন।

মাস্টারের চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে আসছে ধীরগতিতে, দীর্ঘ রেখায়, প্রান্তে শুধু টলমল করছে দুটি অশ্রুবিন্দু।

তাঁর পঁচিশ বৎসরের সেবা সার্থক হয়েছে। কিশোর এই ইস্কুলের ছাত্র, এ ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল ক'রে সে বৃত্তি পেয়েছিল একদিন। আজ সে চলল সন্ন্যাসী হয়ে। তাঁর মনে হ'ল, জীর্ণ মলিন ইস্কুল-বাড়িটা যেন ঝলমল করছে। এ ইস্কুল উঠে যাবে তিনি জানেন। বোধ হয় নেববার আগে প্রদীপের মত একবার উজ্জ্বল হয়ে জ্ব'লে উঠল। বলে, আমার আলো আমি পাঠিয়েছি আলোক-উৎসের অভিমুখে। এবার আমি নিবব। যাক নিবে।

এ পৃথিবীর, এ দেশের মনীষীদের তপস্যার্জিত জ্ঞানভাণ্ডার—তাঁদের আদর্শ তাঁদের প্রেরণা নিয়ে নবগ্রাম সাধনা ক'রে এসেছে, ঋণ ক'রে এসেছে। আজ বোধ হয় এ দেশের এ বিশ্বের সৃষ্টির রাজসভায় নবগ্রামের প্রথম রাজকর প্রেরিত হ'ল। কিশোর নিয়ে গেল বহন ক'রে।

দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অপরাহ্নের শান্তস্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হচ্ছে আকাশ মৃত্তিকা পরিব্যাপ্ত ক'রে। ঘোষণা জানিয়ে কলকল ক'রে ধ্বনি দিয়ে উঠল দ্বিপ্রহরের অবসাদগ্রস্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন বিহঙ্গমেরা।

মাস্টার সচেতন হয়ে উঠলেন।

সন্তোষবাবু তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

মাস্টার ডাকলেন, সন্তোষবাবু!

সন্তোষবাবু একটু হাসলেন।

শুনেছেন? কিশোরের সংবাদ?

শুনেছি।—ব'লেই সন্তোষবাবু বাড়ির দিকে ফিরলেন। ভাবলেন, স্বর্ণবাবুর ঘরে যাবেন, বলবেন, উঠে যাক ইস্কুল তোমার, দুঃখ ক'রো না। যে যজ্ঞ প্রজ্বলিত করেছিলে তার চরু উঠেছে। আর কেন? নিবিয়ে দিয়ে শান্তির জল নাও।

কিন্তু না। এ কথা স্বর্ণবাবুকে ব'লে লাভ নাই। শান্তি সন্তোষ স্বর্ণের ভাগ্যে নাই। ও জ্বলবে, অঙ্গারে পরিণত হবে।

সন্তোষবাবু নিজের ঘরে ঢুকলেন।

পনেরো

ইস্কুলের নতুন বাড়ি শেষ হয়েছে। বোর্ডিঙের বাড়ির গাঁথনি চলেছে। নতুন বাসুদেব দীঘি টলমল করছে। দূরে ভাটায় ইট পুড়ছে। স্কুলের আর এক দিকে একটি পুকুর, সেটি বৎসর কয়েক আগে কাটানো। তার চারি-দিকে বাগানটি বেশ জ'মে উঠেছে। নবগ্রামের নব প্রতিমার মুখমণ্ডল গঠন হচ্ছে। শত শত ছেলের কোমল কচি মুখের লাবণ্য তাতে ফুটে উঠেছে। ইস্কুলের ছেলে এককালের পরিত্যক্ত প্রান্তরকে জীবন-গুঞ্জরণে মধুচক্রের মত সুন্দর এবং রসসমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। তাদের শুভ্র উজ্জ্বল আশাপ্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টি সমষ্টিভূত ক'রে এই গ্রামলক্ষ্মী-প্রতিমার চক্ষুপদ্ম প্রস্ফুটিত হবে; দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হবে, সেখানকার চিকিৎসিত শত শত রুগ্ন লোকের ভরসায় ঈষৎ করুণ হাস্য ফুটে উঠবে দুটি ওষ্ঠাধরে। অপরূপ সে প্রতিমা! ভাগ্যবান গোপীচন্দ্র।

সন্তোষবাবু ঘরের মধ্যে ব'সে একখানি চিঠি পড়ছিলেন। কয়েক বারই চিঠিখানি পড়েছেন। প'ড়ে রেখে দিয়েছেন, আবার বার ক'রে পড়েছেন। আবার রেখেছেন, আবার পড়েছেন।

রাধাকান্তের পত্র। মধ্যে একদিন রাত্রে রাধাকান্ত নবগ্রাম এসেছিলেন। লিখেছেন, "মা মহাদেবীকে প্রণাম করিতেছি—এইরূপ স্বপ্ন কয়েক দিনই দেখিয়া গুরুকে নিবেদন করিলাম। গুরু বলিলেন, মা তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন কি না জানি না, তবে তোমার অন্তর মাকে প্রণাম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সংকল্প তুমি প্রত্যক্ষভাবে না করিলেও অজ্ঞাতে সংকল্প চিত্তের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং তুমি যাইয়া প্রণাম করিয়া আইস।"

রাধাকান্ত এসেছিলেন। দীর্ঘপথ এসে গ্রামান্তরে দেবস্থানে সন্ন্যাসী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর রাত্রে এসেছিলেন অট্টহাসে।

অট্টাহাস এককালের সমৃদ্ধ তীর্থস্থল।

সাধু সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীতে দেবস্থলের চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। অট্টহাসের নিকটেই ছিল সে আমলের সমৃদ্ধ বণিকপল্লীর বাজার। সেখানে আশ্রয় নিত তীর্থযাত্রীরা। নদীতে ছিল বন্দর ঘাট, সেখানে বন্দর-টিপির উপর সারি সারি দোকানে জ্বলত বড় বড় প্রদীপ। এক-একটা প্রদীপে আধ

সের তেল ধরত। তাতে দেওয়া থাকত দশি-কাটা অর্থাৎ তন্তুবায়দের তাঁত থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া কাটা সুতোর মোটা গুছি, চৌকো লণ্ঠনের মধ্যে ঝুলত সেই আলো। আশে-পাশে নদীর পাড়ের উপর গাছতলায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, চারি পাশে দেশ-দেশান্তরের মানুষ ঘিরে ব'সে থাকত—তীর্থযাত্রী, নৌকার নাবিক, ব্যবসায়ীর দল। অট্টহাসের জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সন্ন্যাসী-সাধকের ধুনি জ্বলত। জঙ্গলের মধ্যে সন্ন্যাসীরা আসন বাঁধতেন—পঞ্চমুণ্ডির আসন, পঞ্চরত্নের আসন, পঞ্চ ওষধির আসন। এখানে শেষ সাধনা ক'রে গেছেন রঘুবর গোস্বামী, পঞ্চতপা ক'রে গেছেন তিনি। রাধাকান্ত নিজে রঘুবরের ভক্ত ছিলেন। বৈশাখের প্রভাতে পাঁচটি অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার ভিতরের স্থানটুকুতে আসন বেঁধে তিনি উদয়াস্ত ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। রাধাকান্ত এবার এসে দেখে গেছেন, অট্টহাস প্রায় নিস্তব্ধ। পাঁচ-সাত জন পরিব্রাজক এবং অল্প কয়েকজন যাত্রী ছাড়া বিশেষ কেউ ছিল না। বন্দর-ঘাট অনেকদিন—প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি হ'ল উঠে গিয়েছে। তবু অপরাহ্নে অট্টহাস মুখরিত হয়ে উঠত গ্রামবাসীদের সমাগমে। তিনি শুনেছেন, আজকাল সে জনসমাগমও নাই। আজকাল নাকি ইস্কুল-ডাঙা জনসমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে। রাধাকান্ত ইস্কুল-ডাঙা দেখে গ্রামলক্ষ্মীকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরে চ'লে গেছেন গুরুর আশ্রমে। সেখান থেকে সন্তোষ-বাবুকে পত্র লিখেছেন, না-লিখে আত্মসম্বরণ করতে পারেন নি সম্ভবত। লিখেছেন—"দেখিয়া মনের মধ্যে হর্ষবিষাদে যে কি এক অভূতপূর্ব ভাবোদয় হইয়াছিল, সে কথা আজ আর লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিব না। ভাব স্থায়ী নয়, সময়ান্তরে ক্ষীণ হইয়া যায়। তবে কাঁদিয়াছিলাম। আপনার জ্ঞাতার্থে আমার সেই দিনের খানিকটা ডায়রি নকল করিয়া দিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল একটি বটবৃক্ষতলে। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ইষ্টদেবতাকে বলিলাম, মার্জনা করিও মা সর্বান্তর্যামিনী। তোমাকে স্মরণ করিবার পুণ্যে এই হর্ষবিষাদ আমার না থাকিবারই কথা। তাই সর্বাগ্রে সেই হর্ষবিষাদের কথাই লিপিবদ্ধ করিব। বলিয়া ঝুলি হইতে দোয়াত কলম ডায়রি বাহির করিয়া লিখিলাম—

আমরা বহুদিন হইতে সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত এই নবগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম। কালের লীলায় বহুকাল পূর্বেই বহু সাধকের তপস্যার আলোকে প্রদীপ্ত এই মহাপীঠাশ্রিত নবগ্রাম ইদানীং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সমগ্র ভারতেই আজ এই অবস্থা। এই অবস্থায় যেরূপে পল্লীগ্রামের লোকে সাধারণত অজ্ঞান অন্ধকারে জীবননির্বাহ করে, তাহাই

করিতেছিলাম। কিন্তু কালের গতির বিচিত্র লীলায় ভারতের এবং বঙ্গদেশে নূতন আলোকোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের তপস্যার পুণ্যে অত্র গ্রামেরও সৌভাগ্য-রবি উদিত হইতেছে; তাহারই অরুণ-সারথির মত উদয় হইয়াছেন মহাভাগ্যবান গোপীচন্দ্র। আজ কর্মবলে তিনি পূর্ণপ্রকাশিত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রাজরাজেশ্বরী ভারতেশ্বরীর অত্র জেলার প্রতিনিধির কৃপাকটাক্ষে এবং উদ্যোগে ও গোপীচন্দ্রের বদান্যতায় এখানে এন্ট্রান্স ইস্কুল স্থাপিত হইয়াছে। দিকে দিকে আরও কত উদ্যোগ আয়োজন দেখিলাম। বোর্ডিং হাউস, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে—গৃহনির্মাণ হইতেছে। গ্রামের ভিতরে বালিকা-বিদ্যালয়ের আয়োজন দেখিলাম। থিয়েটারের ঘর, লাইব্রেরির ঘর—আরও কত ইমারত ওই ইস্কুল-ডাঙায় বাসুদেব-দীঘিকে বেষ্টন করিয়া নির্মিত হইতেছে। আমি মনশ্চক্ষে দেখিলাম সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ নবগ্রামের শোভা।

ইতিমধ্যে শিক্ষিত মাস্টার ও পণ্ডিত মণ্ডলীর আগমনে এবং শিক্ষিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত অমরচন্দ্রের শুভাগমনে পল্লীর অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া আলোকোদয়ে এক অভিনব সুখের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে। কারণ জীবন যখন অন্ধকারে থাকে, তখন আর তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার থাকে না, একজনকে অনুসরণ করিয়া অন্যজন চলে অন্ধের মত। কিন্তু যখন ওই জীব আলোকপ্রাপ্ত হইয়া সৎ ও অসৎকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহারা দুই পথের কোন্ পথ গ্রহণ করিবে সেই সমস্যায় পড়ে,—যাহারা সৎকে গ্রহণ করে, তাহারা যদি অসতের দমন করিয়া স্বীয় অধিকারে সৎকার্যের পরিচালন করিতে না পারে, তখন তাহাদের এক মর্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক। সর্বাপেক্ষা মর্মযাতনা অনুভব করিলাম আসিবার পথে স্বর্ণভূষণের এম. ই. স্কুলের দুরবস্থা দেখিয়া। হা ভগবান, সেটি ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে!”

* * *

সন্তোষবাবু হাসলেন।

রাধাকান্ত! তোমার সন্ন্যাস ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখের পাতা দুটি ভিজে উঠল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

স্বর্ণবাবুর ইস্কুল-ঘরে আগুন লেগেছিল। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। স্বর্ণবাবু উন্মত্তের মত আচরণ করেছিলেন ক্রোধে। আগুন নেবাতে দেন নি।

সারারাত্রি চীৎকার করেছিলেন, যাক পুড়ে, যাক ছাই হয়ে। খবরদার, কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পাবে না।

কেউ আগুন দিয়েছিল গভীর রাত্রে। গোপীচন্দ্র এ দুর্নামের বহু ঊর্ধ্বে ; কিন্তু কীর্তিচন্দ্রকে স্পর্শ করতে পারত। কীর্তিচন্দ্র কল্পনা অন্তত করেন, সেদিন স্বর্ণবাবুর সম্পর্কে মুখে আস্ফালন ক'রে বলেছিলেন—ওকে সাফ ক'রে দিলেই বা কি হয়! সে কথা থাক্। কিন্তু এ দুর্নাম তাঁকেও স্পর্শ করে নি। স্বয়ং স্বর্ণবাবু তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন, না না না। কখনও না। হতে পারে না।

তবে কে?

তা জানি না। তবে ও হতে পারে না।

একদৃষ্টে বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বর্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সন্তোষবাবু। তিনিই প্রথমে দেখেছিলেন আগুন। যেদিন কিশোরের সন্ন্যাস নেওয়ার সংবাদ আসে, সেই দিন থেকে তিনি এক বিচিত্র মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। ঘরের মধ্যে ব'সে থাকেন। ভাবেন, ভাবেন আর ভাবেন। ভোরবেলা উঠে একবার বাইরে বেরিয়ে প্রাতঃকৃত্য-স্নান শেষ ক'রে ঘরে এসে বসেন, ভাবেন। কখনও কখনও লেখেন। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরিয়ে স্বর্ণবাবুর কাছে যান। অল্প দু-চারটি কথা ব'লে চলে আসেন, তারপর দীর্ঘকাল স্তব্ধ রাত্রে বারান্দায় অথবা ছাদে পায়চারি করেন। নবগ্রামের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। মনে মনে কল্পনায় রচনা করেন কলিযুগের ভারতোপাখ্যানে নবগ্রামের উপাখ্যান।—

"কলিযুগে ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপ শাকদ্বীপ একদা পাঠান মোগল নামধেয় মুসলমান জাতির করতলগত হইয়াছিল। তাহার পর এক শ্বেতকায় জাতি এ দেশে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। ইহাদের নাম ইংরাজ। সপ্তসাগরবেষ্টিত পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণাংশে ক্ষুদ্র এক দ্বীপে ইহাদের বসতি। ইহাদের বর্তমান রাজার নাম সপ্তম এডওয়ার্ড। ইহার রাজত্বকালে কলিযুগমহিমায় সমস্ত দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমত সময়ে কোন্ কার্যকারণে, কোন্ পুণ্যফলে জানি না, সমগ্র দেশময় এক নূতন তপস্যা যেন জীবন লাভ করিল। পূর্বাপর সত্য ত্রেতা দ্বাপরের তপস্যার সঙ্গে এই তপস্যার ধারার অনেক পার্থক্য। অতীতকালের নানা ঘটনা সংঘটনের ফলে বহু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হইয়াছে। এই কালে এই ভারতবর্ষের বঙ্গদেশে রাঢ় অঞ্চলে নবগ্রাম একখানি সমৃদ্ধ গ্রাম; এই গ্রামে বিচিত্র ভাবে এক উপাখ্যান সংঘটিত হইল; সমগ্র জম্বুদ্বীপের ঘটনাবলী

হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, সংযুক্ত। এখানেও একদা মুসলমানেরা আসিয়া হিন্দুর রাজত্ব অধিকার করিয়াছিল। তাহার পর নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আত্মকলহের মধ্য দিয়া—"

লেখা এইখানেই বন্ধ। খেই হারিয়ে যায়। মনে মনে উত্থান-পতনের কাহিনী স্মরণ ক'রে যান।

শহর শ্যামলাপুরের ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয়েছিলেন। সে কলিযুগের ভারতোপাখ্যানের অংশ নয়। মহাভারতের অংশ অথবা অন্য কোন পুরাণের অংশ।

বাউরী-রাজকে ধ্বংস ক'রে এল এখানে তুর্কীরা। ধীরে ধীরে দিল্লী থেকে মুসলমানের যে অভিযান এগিয়ে এল, তার ঢেউ লাগল নবগ্রামে। ওদিকে রাজনগরে এ অঞ্চলের নবাবী আধিপত্য সুদৃঢ় হ'ল, যুদ্ধ করলে নবগ্রাম ভারতবর্ষব্যাপী ঘটনা-তরঙ্গের সঙ্গে। গন্ধবণিকেরা তুর্কীদের প্রিয়পাত্র হ'ল। বন্দর-ঘাট স্থাপিত হ'ল, গন্ধবণিকেরা হ'ল সর্বেসর্বা।

মাথা নত হ'ল গন্ধবণিকদের। তারপর মাথা তুললে সরকারেরা। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাগিনেরা।

যেটুকু দ্বিধা তাদের হ'ল, সে দ্বিধা সরকারদের শক্তি ঘুচিয়ে দিলে। সরকারবাবুরা—স্বর্ণভূষণ, রাধাকান্ত।

এদের পর এসেছেন গোপীচন্দ্র।

ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজ ব্যবসায়ীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে দেশান্তর থেকে অপরিমিত সম্পদ আহরণ ক'রে এসেছেন, প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ রাজপুরুষের সহযোগিতা পেয়েছেন। নত হয়েছে সরকারেরা—স্বর্ণভূষণ।

রাধাকান্ত পলাতক।

নবগ্রামে নূতন জীবনচাঞ্চল্য জেগে উঠেছে।

কলকাতা থেকে দিকে দিগন্তরে যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারই প্রবল উচ্ছ্বাস এসে উপনীত হ'ল।

চারিদিকে জাগল সাড়া।

আবার খেই হারিয়ে যায়, দিগ্‌ভ্রান্তের মত সন্তোষবাবু ঘরের চারিদিকে চান। সেখান থেকে অন্ধকার ছাদে উঠে নবগ্রামের ঊর্ধ্বলোকের দিকে তাকান।

স্বর্ণবাবুর বাড়ি স্তব্ধ। তবু সন্তোষবাবু জানেন, মদ্যপান করছেন স্বর্ণবাবু।

রাধাকান্তের বাড়ি স্তব্ধ। সেখান থেকে যেন অস্ফুট শব্দ শুনতে পান।

—শোন সত্যপ্রিয়ের কাহিনী শোন। চোখ বন্ধ ক'রে শুনে যান সন্তোষবাবু। কাশীর বউ গল্প বলছেন।

আরও একটু দূরে কোলাহল শুনতে পান—কলহ-কোলাহল, সরকার-বংশের বাড়িতে শরিকানী কলহ চলছে।

আরও দূরে গন্ধবণিকদের পল্লীতে গান-বাজনা চলছে। উচ্চ হাসি ভেসে আসছে।

আশ্চর্য, উৎসাহের সাড়া পড়েছে ওই পল্লীর কয়েকটি বাড়িতে।

আরও দূরে গোপগ্রামে রঙ্গলাল মণ্ডলের দাওয়ায় সোৎসাহ আলোচনা চলছে—রঙ্গলালের দুই ছেলে হাই-স্কুলে ভর্তি হবে। গল্প হচ্ছে নবগ্রামের ইস্কুল-ডাঙার ঐশ্বর্যের, গোপীচন্দ্রের ঠাকুরবাড়ির সমারোহের। গোপীচন্দ্রের সৌম্য মূর্তির, মিষ্ট মধুর ভাষণের প্রশংসার কথা হচ্ছে।

বার বার মাথা নাড়েন সন্তোষবাবু। দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানান। ইষ্টদেবতাকে নয়, প্রণাম জানান বিচিত্ররূপিণী মানব-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাকে।

হারায় না, কোন কিছু হারায় না এ সংসারে। অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলেছে প্রতিটি সংঘটন। প্রতিটি উপাখ্যানের মূলে রয়েছে মনঃক্ষোভের প্রেরণা।

মানব-প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার বাম চক্ষু রক্তবর্ণ। বাম হস্তে বক্র তীক্ষ্ণ নখরমালা। বাম দিকে অধরপ্রান্ত কঠিন শীতল নিষ্ঠুর হাস্যরেখায় ভীষণ। বিষজর্জর নীল মুখবর্ণ। পৃথিবীর প্রতিটি আঘাত, ক্ষুদ্রতম অপমান, সামান্যতম রূঢ় কথার ধ্যানে যে মগ্ন হয়ে আছে। কিছু তার কাছে হারায় না, কিছু সে ভোলে না।

আশ্চর্য!

এ অঞ্চলে দিকে দিকে সাড়া জেগেছে। কিন্তু মুসলমান-পল্লীতে এ সাড়া অতি ক্ষীণ। বুঝতে পারেন না সন্তোষবাবু।

ওই স্তিমিত স্তব্ধ মুসলমান-পল্লী নিথর হয়ে ঘুমুচ্ছে।

এ-দিকে ইস্কুল-ডাঙা আলোকমালায় ঝলমল করছে। ছেলেরা পড়ছে। সবশেষে ঘুরে দাঁড়ান সন্তোষবাবু উত্তর-পশ্চিম দিকে। এই দিকে—ওই দেখা যাচ্ছে গোপীচন্দ্রের বাড়ি।

একটা দরোয়ান ছাদের উপরে ঘন ঘন হাঁক দিয়ে পাহারা দিচ্ছে—অ-হ! অ-হ! হ-হ! ওই দেখা যাচ্ছে গোপীচন্দ্রের শোবার ঘর। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। উপরে টানা-পাখা চলছে। পালঙ্কের উপর পরিচ্ছন্ন শয্যার

উপর দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ গোপীচন্দ্র শুয়ে রয়েছেন। দীর্ঘদিন গোপীচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কোমরে ব্যথা থেকে বাত হয়েছে। কিশোরের যে দিন সন্ন্যাসী হওয়ার সংবাদ আসে, সেদিন কিশোরের মায়ের আকস্মিক কান্নার শব্দ শুনে চমকে উঠে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কোমরে ব্যথা ধরিয়েছিলেন। সেই ব্যথা সারে নি, পরিণত হয়েছে স্থায়ী বাতব্যাধিতে। চলতে ফিরতে পারেন না এমন নয়, তবে বেদনাটা অহরহ আছেই। মধ্যে মধ্যে বাড়ে, তখন চলাফেরার শক্তিও থাকে না। স্থানীয় সেই পাগল ডাক্তারটি তাঁর কাছে এসে প্রায়ই ব'সে থাকে। গল্প করে, কল্পনা করে। কান্যকুব্জ ব্রহ্মণ, বঙ্গমেল—এসব এখন কল্পনায় স্থান পায় না। এখন কথা হয় ডাক্তারখানার। ডাক্তার ওখানে চাকরি পাবে। ডাক্তার বলেছে, এ বয়সে এ-ধরনের বেদনা, আকস্মিক আঘাত থেকে বাত হয়। সারতে দেরি হবে।

গোপীচন্দ্র অধীর হয়ে কলকাতায় গিয়ে দেখিয়ে এসেছেন। তারাও বলেছে, সময় নেবে।

সে দিন ডাকিয়েছিলেন এখানকার প্রবীণ কবিরাজকে।

সেই স্থানীয় প্রবীণ কবিরাজ, যিনি কৃষ্ণ চাটুজ্জেকে কাশী যেতে সাহস দিয়েছিলেন।

কবিরাজ বলছেন, সারবে না।

গোপীচন্দ্র বলছেন, আমার যে অনেক কাজ কবিরাজ!

সংসারের সৃষ্টিকাল থেকে কাজের আর বিরাম কখন বলুন? চলছে, চ'লে আসছে, লয় কাল পর্যন্ত চলবে। কিন্তু মানুষকে থামতে হয়, যেতে হয়।

যেতে হয়? তবে—?

না। সে আমি বলছি না। যতক্ষণ না এর সঙ্গে আমাশয় দেখা দেয়, ততক্ষণ কোনও চিন্তার কারণ নাই। আমাশয় আপনার সঞ্চিত ব্যাধি। ওটা তখন উঠবেই। তবে উইল বিষয়-ব্যবস্থা এ সব ক'রে রাখতে ক্ষতি কি? ইচ্ছা হ'লে তীর্থস্থানে গিয়ে বাসও করতে পারেন।

মহাকর্মী গোপীচন্দ্র। অনেক কর্ম তাঁর কল্পনায়।

ইস্কুল, বোর্ডিং, ডাক্তারখানা, চতুষ্পাঠী, অনাথ আশ্রম, ধর্মশালা, বহু নূতন দেবপ্রতিষ্ঠা, বড় বড় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা—

আরও কল্পনা আছে।

নবগ্রামের পশ্চিমে প্রান্তর—এই প্রান্তরকে তিনি স্বতন্ত্র অভিধা দিয়ে

বিপুল সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যাবেন। সে অভিধা তাঁর নাম, তাঁর স্মৃতি, তাঁর গৌরবকে বহন করবে—গোপীচন্দ্রপুর। গ্রাম নয়, নগর। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

শত শত বৎসর পরে ভাবীকালের মানুষ আসবে গোপীচন্দ্রপুরে, বিমুগ্ধ হয়ে দেখবে। নমস্কার ক'রে যাবে তাঁকে।

চেয়ারে ব'সে তাঁর নীল স্বচ্ছ চক্ষু দুটি ভাবীকালে চ'লে যায়।

কবিরাজের কথায় শঙ্কিত হয়ে তিনি কলকাতা থেকে ডাক্তার আনালেন। ডাক্তার বললেন, এ বয়সে বাত একেবারে সারবে না, তবে অচিরেই ক'মে যাবে।

কবিরাজ অন্য কথাগুলি শুনে বলেছেন, বলতে পারি না। আমাদের শাস্ত্রে এমন কিছু বলে না।

দূর থেকে গোপীচন্দ্রকে দেখে সন্তোষবাবুর মনে হয়, একটা কালের স্রষ্টা, নবগ্রামের একটা কালের ঈশ্বর। দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ শুভ্রকেশ নীলচক্ষু গোপীচন্দ্র স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছেন।

গোপীচন্দ্রের পর কে?

সন্তোষবাবু পদচারণা করেন।—কে?

গোপীচন্দ্রের কীর্তি থেকে কে যাবে বিশ্বসৃষ্টির রাজসভায়, কোন্ কর বহন ক'রে, এই কলিযুগের ভারত-জীবন-প্রবাহে নবগ্রামের জীবন-তরঙ্গ বহন ক'রে নিয়ে?

ভাবেন সন্তোষবাবু!—যাবে বইকি কেউ। নইলে পূর্ণ হবে কেমন ক'রে এ উপাখ্যান? প্রতি জনপদ, প্রতি গ্রাম থেকে যাবে জীবন-তরঙ্গ।

ভাবনার খেই হারিয়ে যায় আবার। ছাদের আলসেতে ভর দিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন গোপীচন্দ্রের শয়নকক্ষের দিকে।

গোপীচন্দ্রকে অস্থির মনে হচ্ছে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করছেন। কেউ যেন পাশে এসে বসল। কে? ডাক্তার এসেছে।

ভুল দেখেন নি সন্তোষবাবু। পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ স্বর্ণবাবু এসে ঘরে ঢুকে বললেন, যাবে মুখুজ্জে?

* * *

কোথায়?

তোমার মহাভারতের মহানায়ক চললেন কলকাতায়। আজ কদিন থেকে অসুখ খুব বেড়েছে। কাল রাত্রে আমাশয় দেখা দিয়েছে। শ্যামপুরের

কবিরাজের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন, তিনি আসেন নি। অসুখ ব'লে এড়িয়েছেন। চল, দেখা ক'রে আসি। কলকাতায় যাচ্ছেন, চিকিৎসা করাবেন, পাকা বন্দোবস্ত ক'রে উইল করবেন।

সন্তোষবাবু উঠলেন।—চল, যাব।

আজ দিনটি নবগ্রামে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, দু দিন আগে থেকেই একটা বাদলা নেমেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়ছে। চৈত্রের শেষ। বসন্তের বাতাস মোড় ফিরিয়ে উত্তর দিক থেকে বইছে, নতুন ক'রে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। তবু এর মধ্যে গোপীচন্দ্রের বাড়ির পাশে লোকজনের ভিড়ের আর অন্ত নাই। উৎসুক হয়ে মেয়েরা এসে জমেছে। গোপীচন্দ্র কলকাতায় যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। ট্রেন রাত্রে, কিন্তু যাত্রার শুভক্ষণ সকালেই সর্বোত্তম ব'লে এখনই যাত্রা ক'রে তিনি ভিতর-বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সমস্ত দিনটা বিশ্রাম করবেন তাঁর নিজের কীর্তিভূমি ওই স্কুল-ডাঙায়। সেখান থেকে রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রা করবেন ট্রেন ধরতে। এ যাত্রার মধ্যে চারিদিকে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়ে উঠেছে। লোকে দলে দলে তাঁর যাত্রা দেখতে আসছে, যেন তিনি আর ফিরবেন না। তাই সন্তোষবাবুও আজ এসে দাঁড়ালেন এদের পাশে। গোপীচন্দ্র মহাভাগ্যবান, ভগবানের অনুগৃহীত, বহু পুণ্যের অধিকারী, মহিমময় ব্যক্তি। নবগ্রামের একটি কালের তিনি স্রষ্টা। তিনি খণ্ডকালের মহেশ্বর। তাঁকে দেখবেন বইকি!

আকাশ মেঘম্লান।

সন্তোষবাবুর মনে হ'ল, নবগ্রামের ভাগ্যাকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আকাশে। চারিদিকে গুঞ্জন উঠেছে, সমবেত লোকেরা মৃদু গুঞ্জনে সমবেদনা প্রকাশ করছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আর একদিনের কথা। গোপীচন্দ্রের কীর্তিস্তম্ভের সূচনা হয়েছিল সেই দিনটিতেই, কুলীনপাড়ার কৃষ্ণ চাটুজ্জে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা করেছিলেন সেদিন। বর্ষার শেষ ছিল সময়টা। শরতের প্রারম্ভ। শরতের প্রসন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল। মধ্যে মধ্যে লঘু মেঘ দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ছায়ার বিষণ্ণতায় বিষণ্ণ ক'রে তুলতে পারে নি। মানুষও এসেছিল দলে দলে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে হিন্দু এসেছিল, মুসলমান এসেছিল। প্রত্যেকেরই মুখে ওই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল। মৃত্যুর মধ্যে যে অভয় অনুভব করেছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জে, পার্থিব সমস্ত কিছুর নশ্বরতার অতীত অবিনশ্বর মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের যে স্পর্শ পেয়েছিলেন

সেকালের সে বৃদ্ধ, তারই প্রতিবিম্ব যেন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল সকল পটভূমিতে, সকল পাত্রের সর্ব অবয়বে—সেদিনের উদয়কাল থেকে অস্তকাল পর্যন্ত সকল ক্ষণটি পরিব্যাপ্ত ক'রে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের জ্যোতির প্রতিচ্ছটা যেমন তীরবর্তী তরুশীর্ষকে উজ্জ্বলতর উষ্ণতর ক'রে তোলে, তেমনই ভাবে।

গোপীচন্দ্রের যাত্রার রূপ স্বতন্ত্র।

হাসলেন সন্তোষবাবু। কাল যে স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণ চাটুজ্জের প্রয়াণের দিনেই একটি কালে ছেদ পড়েছিল। সেই দিনের সূর্যাস্ত তিনি দেখেন নি। তাঁর দুর্ভাগ্য।

গোপীচন্দ্র নবগ্রামে নূতন কল্পের প্রবর্তন করেছেন। তিনি নূতন কল্পের মানুষ। দেশ-দেশান্তরে অব্যাহত কর্মের মধ্যে তিনি শুধু সম্পদ সংগ্রহ ক'বে আনেন নি, এনেছেন—সে দেশে এসেছে যে নূতন কাল, সেকালেব আলোক, সেকালের ধারাকেও বহন ক'রে এনে ছড়িয়ে দিয়েছেন নবগ্রামে চারি পাশে।

রাস্তার দুই ধারে—এখান থেকে ইস্কুল-ডাঙা পর্যন্ত কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে বই বগলে গ্রাম্য কিশোরেরাও এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। যে ঋণ বাইরের জগতের কাছে গ্রহণ ক'রে নবগ্রামকে সমৃদ্ধ করলেন, এদের ঋণী করলেন, এরা সেই ঋণ শোধ করবে। এ তো শুধু গোপীচন্দ্রের ঋণ নয়, এ যে নবগ্রামের ঋণ।

শিউরে উঠলেন সন্তোষবাবু। ঋণ শোধ করবে? কি ভাবে ঋণ শোধ করবে? গোপীচন্দ্রের গৌরবকে অতিক্রম ক'বে, পরাজিত ক'রে, নবগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতার মুখ তার দিকে ফিরিয়ে?

মূকং করোতি বাচালং— বংশলোচন এসেছেন। শ্লোক অর্ধসমাপ্ত রেখে স্বর্ণবাবুকে বললেন, তুমি আজ একটা মিটমাট ক'রে নাও স্বর্ণ। লক্ষ্মী ছেলে, বাবা ছেলে, সোনা ছেলে আমার!

স্বর্ণ মুখ ফেরালেন।

অকস্মাৎ সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধতার আকস্মিকতায় চিন্তামগ্ন মন চকিত হয়ে উঠল। এ স্তব্ধতা গোপীচন্দ্রের যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত। তাঁকে নিশ্চয়ই দেখা গেছে। সম্ভবত বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানি পালকি এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াল। পালকির মধ্যে গোপীচন্দ্রের গৌরবর্ণ দীর্ঘ হাতখানি দেখতে পেলেন সন্তোষবাবু।

পালকি নামানো হ'ল। গোপীচন্দ্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন পালকি

থেকে। কীর্তিচন্দ্র ও ছোট ছেলে পবিত্রের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সকলকে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালেন। দেবমন্দির-গুলিতে প্রণাম করলেন। পাড়ার মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলেন এক দিকে, তাঁদের মধ্যে থেকে স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী দুর্দান্ত অমূল্যের মা এগিয়ে এসে একটি আশীর্বাদী ফুল তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, শিগগির শিগগির ভাল হয়ে ফিরে আসুন।

গোপীচন্দ্র ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আশীর্বাদ করুন আপনারা।

আশীর্বাদ করছি অহরহ। শতবার। অসুখ শুনে থেকে দেব-দেবীকে ডাকছি, বলছি ভাল ক'রে দাও বাবা, নবগ্রামের আশা-ভরসা, নবগ্রামের কল্পবৃক্ষ আমাদের গোপীচন্দ্র—তাঁকে সুস্থ ক'রে দাও। ইস্কুল করলে, ডাক্তারখানা করলে, বোর্ডিং করলে, তুমি বেঁচে থাকলে আরও অনেক—অনেক হবে, অনেক পাবে নবগ্রাম। নবগ্রাম কেন, সমস্ত অঞ্চলের লোক।

গোপীচন্দ্র ম্লান হেসে বললেন, ইচ্ছে অনেকই আছে দিদি। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ফিরি তো হবে।

ফিরবে বইকি। আবালবৃদ্ধবণিতা প্রাণ ভ'রে ডাকছে ভগবানকে। তিনি কি শুনবেন না?

গোপীচন্দ্র বললেন, তাঁর ইচ্ছা। তবে যদি না ফিরি, তবু আটকে থাকবে না। ছেলেদের ব'লে গেলাম। যাবার আগে, গ্রামের সকলকে ডেকে, সকলের সামনে তাদের ব'লে যাব।—আমার বাবার নামে টোল হবে, বালিকা-বিদ্যালয় হবে।

রজনী-ঠাকরুন এবার এগিয়ে এসে বললেন, ওই ব্যবস্থাটি করবেন না দাদা। লেখাপড়ার সঙ্গে শহরের ফ্যাশান এসে ঢুকবে, মেয়েরা দু-ই মিলিয়ে চতুর্ভুজ হবে। চতুর্ভুজ হ'লে যে কি হয়, সে তো স্বচক্ষে দেখলেন।

রজনী-ঠাকরুন আঙুল দিয়ে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিলেন রাধাকান্তের বাড়ি,—কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি কাশীর বউয়ের কথা বলছেন।

গোপীচন্দ্র বাড়িটার দিকে তাকিয়েই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, রাধাকান্ত আমার মামা। তাঁর স্ত্রী আমার মামীমা, মাতৃতুল্যা। তিনি কই?

মেয়েদের মধ্যে থেকে, বোধ হয় রজনী দেবীর পিছন থেকেই বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন কাশীর বউ। মুখ তাঁর অনাবৃত।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গোপীচন্দ্র। সমস্ত জনতা অবাক হয়ে

গেছে। বিস্ময়ের বিমূঢ়তা কাটিয়ে ফেলতে গোপীচন্দ্রের বিলম্ব হ'ল না। তিনি প্রসন্ন মুখে মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, আজ আমি আপনাকে প্রণাম করব।

পিছিয়ে গেলেন কাশীর বউ। বললেন, আমার অপরাধ হবে। আপনার প্রণাম নেবার যোগ্যতা কারও নেই এ অঞ্চলে। বরং আমি আপনাকে প্রণাম করব।

তিনি হাত বাড়ালেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, না, আমিও এমনিই আশীর্বাদ করছি, সমস্ত অন্তর ঢেলে আমি আশীর্বাদ করছি।

কাশীর বউ ডাকলেন, গৌরীকান্ত!

সন্তোষবাবু তাকালেন চারিদিকে। ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে ছোট ছেলেটি।

গৌরীকান্ত!

কই, গৌরীকান্ত?

পুরোহিত বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, না না। কই? গৌরীকান্ত কই?

কাশীর বউ বললেন, সে নিশ্চয় নেই এখানে। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুভ সময় চ'লে যাচ্ছে।

না না। যাবে কোথায়?

সে গেছে—। সে যায় তার বাবার তৈরি করা বাগানে। সেখানে মধ্যে মধ্যে ছুটে গিয়ে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে গেছে বোধ হয়। আপনি আব দেরি করবেন না।

গোপীচন্দ্র গিয়ে পালকিতে উঠলেন।

পালকি উঠল। চোখ বন্ধ করলেন তিনি। কেবলই মনে হতে লাগল, একটি ছোট ছেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্জন প্রান্তরে, এক গাছ থেকে আর এক গাছের কাছে যাচ্ছে। কেন? কি খোঁজে? কি সুখ পায়? বাপকে খোঁজে? একটু অধীর হয়ে উঠলেন গোপীচন্দ্র।

সন্তোষবাবুও সঙ্গে সঙ্গে চললেন মোহগ্রস্তের মত।

সন্তোষবাবু সারাটা দিন দাঁড়িয়ে রইলেন ইস্কুল-ডাঙায়।

দু চোখ ভ'রে দেখলেন, এত বড় একটি মানুষকে মানুষ কত ভালবাসে! মানব-প্রকৃতির আর একটা দিক তিনি আজ দেখলেন। দক্ষিণ চোখ করুণা-ছলছল, প্রীতি-টলমল দৃষ্টি, প্রসারিত হাতে বুকে টেনে নেওয়ার ব্যগ্রতা, আর চোখে মধুর হাস্য, মুখবর্ণ ক্ষমাময়ী ধরিত্রীর শ্যামকোমল বক্ষবর্ণের মত

সুশ্যাম ; এ পৃথিবীর সামান্যতম সেবা, ক্ষুদ্রতম উপকার ধ্যান ক'রে সে কি বিভোর ! অথচ কি কঠিন দ্বন্দ্ব ! এই যে প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব, এর কোথায় থাকে এ ভালবাসা ?

মানব-প্রকৃতির অন্তরবাসিনী বিচিত্ররূপিণী দেবতা।

হারায় না কিছু তার। ভোলে না কিছু সে। ওই কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রীতি এবং আক্রোশ দুই ধারায় চলেছে জীবন-কুরুক্ষেত্র। মৃত কুরুদের তর্পণ করে পাণ্ডবেরা, চোখে নামে বেদনার্ত অশ্রু, স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কত স্মৃতি ! কত উচ্চ-হাস্যমুখরিত অপরাহ্ণ, কত প্রভাত, কত উর্বশী-উদ্ধারের স্মৃতি !

হঠাৎ একটা আলোর ছটা তাঁর চোখে এসে লাগল। বাইসিক্লের আলো, গ্যাসের আলো। কখন সন্ধ্যা হয়েছে, খেয়াল ছিল না তাঁর। ওদিকে গাজনের ঢাক বাজছে। চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ। সংক্রান্তির আর দেরি নাই। এই বাজনার মধ্যে গোপীচন্দ্র চলছেন খণ্ডকালের মহেশ্বরের মত। ইস্কুলের বোর্ডিঙে ছেলেরা পড়ছে। শব্দ আসছে তার। গোপীচন্দ্রকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে সন্তোষবাবু বাড়ি ফিরলেন।

নির্জন মাঠের পথ। এ পথ সেই পথ, যে পথের পাশে পাশে কোঙা-কাঁটা বসাতে আদেশ দিয়েছিলেন স্বর্ণবাবু। নাদের ছেলেদের কথা শুনে কাঁটা বসায় নি, তুলে ফেলে দিয়েছিল ব'লে স্বর্ণবাবু নাদেরের গলা টিপে ধরেছিলেন। পথখানি আর সে পথ নাই। মন্থর পরিচ্ছন্ন পথ। ছেলেদের পায়ে পায়ে সুন্দর পথে পরিণত হয়েছে। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। কে, কে কথা কইছে ? এই মাঠের পথে, স্ত্রীকণ্ঠ শুনে চমকে দাঁড়ালেন সন্তোষবাবু। শুনতে পেলেন, কে যেন নারীকণ্ঠে কাকে বলছে, যাও, চ'লে যাও, চ'লে যাও। আমি এইখানেই রয়েছি। ভয় নেই। ভয় নেই।

আমি পারব। আমি পারব।—বিস্ময়ের অবধি রইল না সন্তোষবাবুর। শিশুকণ্ঠে উত্তর দিচ্ছে, আমি পারব। আমি পারব।

অন্ধকারের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

চ'লে আসছে একটি ছেলে। কে ? গৌরীকান্ত ?

ওদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, ভয় নেই।

সন্তোষবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, গৌরী !

আপনি ? পিসেমশায় ?

কোথায় যাবে তুমি ?

গোপীচন্দ্রবাবুকে আমার প্রণাম করা হয় নি। প্রণাম করতে যাচ্ছি।

সঙ্গে যাই?

না। মা দাঁড়িয়ে আছেন ওই গ্রামের ধারে।

শব্দ ভেসে আসছে—চ'লে যাও। ভয় নাই। চ'লে যাও।

কাশীর বউয়ের কণ্ঠস্বর এবার চিনতে পারলেন সন্তোষবাবু।

গৌরীকান্ত চ'লে গেল। সন্তোষবাবু দাঁড়িয়েই রইলেন।

ওদিকে গাজনের ঢাক বাজছে।

এদিকে কলরব উঠছে। বোধ হয় গোপীচন্দ্রের পালকি উঠবে।

সন্তোষবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। মনে হচ্ছে, যেন নবগ্রামের রঙ্গমঞ্চে জীবননাট্যে একটি অঙ্কশেষে পটক্ষেপন হচ্ছে। অন্ধকার নেমে আসছে।

চ'লে যাও। ভয় নেই। চ'লে যাও।—কাশীর বউ হেঁকেই চলেছেন।

সমাপ্ত